মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা

(প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব)

শোভারাণী ভট্টাচার্য্য

Mahila-Sampadita Bangla Samaik Sahitya-Patrika
by
Smt. Shovarani Bhattacharyya

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০০

মুদ্রণ ও
কম্পিউটার
টাইপ সেটিং : স্বাতী মিত্র, কল্যাণী, নদীয়া।

উৎসর্গ

আমার অকালপ্রয়াত স্বামী ঁরণজিৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এবং

সুহৃদতুল্য আয়ুষ্মন্ত পুত্রত্রয়কে

কথামুখ

আজ থেকে বছর ছয়-সাত আগে শ্রীমতী শোভারাণী ভট্টাচার্য (শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়) আমার কাছে এসেছিলেন বাংলায় গবেষণা করবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তিনি ইতিহাস ও বাংলায় এম.এ.। বর্ণময় শিক্ষিকা-জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন কিছুকাল আগেই। বয়সেও আমার থেকে প্রায় আট-দশ বছরের বড়ো। সুতরাং খুবই অস্বস্তির মধ্যে বিনীতবাক্যে তাঁর প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে নাকচ করে দিই। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হন না। আবেদন নিবেদন চলতেই থাকে। ঐ বয়সেও বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করে অবশেষে সর্তসাপেক্ষে তাঁর প্রার্থিত গবেষণাকর্ম পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণে রাজি হয়ে যাই: সর্ত ছিলো একটাই—আমি যখন যেভাবে যা যা করতে বলবো, তিনি সেগুলি বাধ্য ছাত্রীর মতো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। অর্থাৎ গবেষণায় নেমে বয়সের দোহাই দিয়ে কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না—এই ছিলো আমার অভিপ্রায়। যদিও অভিজ্ঞতা থেকে মনে মনে জানতাম, ঐ বয়সে সাময়িক উৎসাহে গবেষণার কাজে লিপ্ত হয়ে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও শেষমেষ তিনি রণে ভঙ্গ দেবেনই। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়ে তিনি প্রায় দুঃসাধ্যসাধন করেছেন। যে আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস তাঁকে সুপথে চালিত করেছিলো, তার শুভ ফল তিনি পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. (কলা) উপাধি লাভ করে।

একালের অধিকাংশ তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রী গবেষণাক্ষেত্রে শ্রমসাধ্য ও গুরু বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তুলনামূলকভাবে হাল্কা ও সহজ বিষয়ে ঘরে বসে কাজ হাসিল করতে পারলেই তারা খুশি। তখন তাদের আর পায় কে? এই প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রিত বাংলা গবেষণার মান যে কী পর্যায়ে নামিয়ে দিচ্ছে তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। এই অবস্থায় 'মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব)' বিষয়ক গবেষণায় শোভারাণী প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন বলতে হবে।

উনিশ শতকে নবজাগরণের ঝড়ো হাওয়া আমাদের প্রথাবদ্ধ-রক্ষণশীল দুর্গে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলো। সেই হাওয়ার দাপটে কেবল বাঙালি পুরুষচিত্তই আলোড়িত-আন্দোলিত হয় নি, অন্তঃপুরচারিণী রমণীদের চিত্তেও দোলা লেগেছিলো। চিত্তজাগরণে তথাকথিত শিক্ষিত মহিলাদের অনেকেই বাড়ীর চৌহদ্দির বাইরে খোলা হাওয়ার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পা রেখেছিলো। দিকে দিকে চিত্তপ্রবাহের অনিবার্য পরিণামে স্বাধীকারসচেতনা নারী আপন ভাগ্যজয়ের স্বপ্নে হয়েছিলো বিভোর। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-

সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছিলো একেবারে সামনের সারিতে। বাঙালি নারীর স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনার অঙ্গনে মেয়েদের প্রবেশাধিকার অবারিত করার পশ্চাতে অনুপ্রেরণা দাতার ভূমিকায় কারা ছিলেন তা সবসময় নিশ্চিত করে বলা না গেলেও পুরুষের সাহচর্য্য ও প্রেরণা অবশ্যই ছিলো। এই সূত্রে খিদিরপুর নিবাসিনী শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গমহিলা' (এপ্রিল-১৮৭০) মহিলা-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। শিক্ষা-সাহিত্য-রাজনীতি-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি মানবীয় চিন্তন-মননের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলো পত্রিকাটি।

'বঙ্গমহিলা'তে যার উন্মেষ 'অনাথিনী'তে (জুলাই ১৮৭৫, সম্পাদিকা-থাকমণি দেবী) তার ক্রমবিকাশ। 'অনাথিনী' মহিলা-সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব অর্জন করেছে। 'বঙ্গমহিলা' ও 'অনাথিনী'র অনুসরণে উন্মেষপর্বে মহিলাদের সম্পাদনায় সে সকল মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ভারতী' (জুলাই ১৮৭৭, স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত), 'হিন্দুললনা' (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮), 'পচারিকা' (৮ই মে, ১৮৭৮), 'বালক' (এপ্রিল ১৮৮৫), 'বিরহিণী' (অক্টোবর, ১৮৮৮), 'পুণ্য' (অক্টোবর, ১৮৯৭), 'অন্তঃপুর' (জানুয়ারী ১৮৯৮), 'মুকুল' (হেমলাত দেবী সম্পাদিত), 'ভারতমহিলা' (সেপ্টেম্বর ১৯০৫) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, ক্রমবিকাশ পর্বের সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মহিলারা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

এমনিভাবে অসংখ্য পত্রপত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে বঙ্গললনারা যে নজিরবিহীন সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিচিত্র নমুনা সেদিনের ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনেছেন গবেষিকা শোভারাণী ভট্টাচার্য। ছয়টি সুচিন্তিত ও সুলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত গবেষণায় তিনি মহিলাদের দৃষ্টিকোন থেকে দেখা এককালের বাংলাদেশের মৃতপ্রায় ইতিহাসকে যেন জীবন্ত করে তুলেছেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি সম্পাদনার ক্ষেত্রে নারীমনের যে দৃঢ়তা, দুর্বলতা, কোমলতা, প্রীতি-মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, গুহায়িত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের যে সন্ধান পাওয়া যায়—সেই আঁতের খবর বহু শ্রম, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের রচনায়। তাঁর লেখার সবচেয়ে আকর্ষণ তাঁর সহজ সাবলীল প্রকাশসৌষ্ঠব। পুরুষ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির গুণাগুণনির্ভর তৌল বিশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্থে পাঠক-পাঠিকার উপরি পাওনা।

ড. শোভারাণী তাঁর বহুসাধনার ধন গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিকে অবশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জেনে আমি আনন্দিত। তাঁর গ্রন্থটি সুধী বুদ্ধিজীবী সমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

নিবেদন

অতি শৈশবে পিতৃহীন হয়েছিলাম। ফলে কাণ্ডারী বিহীন হয়ে শিক্ষাজগতে কোনদিন অগ্রসর হতে পারব এমন সম্ভাবনা ছিল না। শৈশবে যে সামাজিক পরিমণ্ডলে বর্ধিত হচ্ছিলাম, সেখানে সমাজের প্রতিকূলতায় নারীশিক্ষার কোন পরিবেশ গড়ে ওঠা ছিল একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। দেশ বিভাগের ফলে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে আসি। মনের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। তখন ভয়, হতাশা যতই দানা বাঁধছিল, ততই ভিতর থেকে একটা অদম্য মানসিক বল তাকে অতিক্রমণের অভিঃপ্রেরণা জুগিয়ে চলছিল ।

আমার বড়দা শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য। আমরা পিতৃহীন হবার পরে তিনি সংসারের হাল ধরেছিলেন । তাঁর উৎসাহ ও চেষ্টায় এবং নিজের ভিতরের প্রেরণায় সব হতাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নূতন উদ্যমে যতই এগিয়ে চলেছি, কোন বাধা তাকে আর আটকাতে পারেনি। পরবর্তীকালে আমার স্বামীও পড়াশুনার বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন, যা আজও আমার পাথেয় ।

আজ বার্ধক্যে কর্ম হতে অবসর গ্রহণের পর আবারও একটা সুযোগ এসে গেল। মনে মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যেমন করেই হোক জীবন সায়াহ্নেও যদি কোনও ভাবে আমার শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ আসে, আমি তার সদ্ব্যবহার করবই। আমার এক বান্ধবী চিত্রা গাঙ্গুলীর সৌজন্যে সে সুযোগ এসে গেল। এখানে বয়স বাধা হয়ে দাঁড়াল না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'; শিক্ষার কোন শেষ নেই, শেষ হয়ও না। সমুদ্রে বিশাল বারিরাশির মধ্যে একবিন্দু জল যেমন কোন প্রভাব ফেলে না, তেমনি আমার শিক্ষাও ঐ একবিন্দু বারিরাশির মত নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। পৃথিবীর জ্ঞান সমুদ্রে একবিন্দু জ্ঞানের স্বাদও যে লাভ করতে পারে, সে ধন্য। ক্ষুদ্র আমি তাঁর সেই কৃপা থেকে বঞ্চিত। এই আমার দুঃখ ও অভিমান।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অতিথি অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক মহাশয়ের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও সহায়তায় তাঁর অধীনে গবেষণা করার সুযোগ পেলাম। তাঁর মত শিক্ষানুরাগী, সুসাহিত্যিক ও অমায়িক ব্যবহারের লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তাঁর চেষ্টায় আজ আমি এখানে এসে পৌছুতে পেরেছি। তাঁর

স্ত্রী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. কেকা ঘটকও আমাকে নানানভাবে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম না করলে আমি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করব, তিনি হলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান ড. যূথিকা বসু মহাশয়া। তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে 'বিশ্বভারতী'তে থাকার, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ও রবীন্দ্রভবন লাইব্রেরীতে কাজ করার সুযোগলাভে সহায়তা করেছেন। যেখানেই লাইব্রেরীতে কাজের জন্য গেছি, সকলেই আমাকে কমবেশী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে এরূপ একটি দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছি জেনে ওঁরা অনুৎসাহের পরিবর্তেউৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে আমার মানসিক বল অনেক বৃদ্ধি করেছেন ।সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় বলেই উল্লিখিত হল না। তাবে আমি তাঁদের সকলের কাছেই ঋণী ।

প্রাচীন পত্র-পত্রিকার প্রতি আমার অনুরাগ জেনে আমার গবেষণা-নির্দেশক শ্রদ্ধেয় ডঃ কল্যাণীশঙ্কর ঘটক মহাশয় আমার গবেষণার বিষয় নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। আমার গবেষণার বিষয় হল 'মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা (প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব)'। বিষয়টিকে স্ফুটোজ্জ্বল রূপ দেবার জন্য তাকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনার চেষ্টা করেছি ।

পরিণত বয়স এবং সাধ্যের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং সনিষ্ঠ অধ্যবসায় নিয়ে বর্তমান গবেষণানিবন্ধ সম্পাদন করেছি ।সুধী মানুষজন যে মার্মিক সহায়তা দান করেছেন, তার সৌরভটুকু আমার শেষ জীবনের সম্বল; প্রতিকূলতার সহস্র ঢেউ তার কাছে পরাজয় মেনেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করার পর অবশেষে গবেষণাপত্রটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। সুধী সমাজ গ্রহণ করলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার পর্বভিত্তিক ধারাবাহিক ইতিহাস

১. উন্মেষপর্ব : (১৮৭০-১৮৭৮)

প্রাক্কথন :

প্রাচীনকাল থেকেই নারী সম্বন্ধে একটি ধারণা পোষণ করা হয় যে নারী অবলা। প্রকৃতপক্ষে নারী যে অবলা নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সঠিক শিক্ষার অভাবে নারী তার প্রতিভার পরিচয় সম্যকরূপে দিতে পারে নি। মহিলারা লেখাপড়া শিখে অথবা অন্য কোন গুণাবলী অর্জন করে পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক ভূমিকা পালন করবেন, সেটা সে যুগে প্রত্যাশিত ছিল না। কালের গতির সঙ্গে সমাজও ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজ আজ উপলব্ধি করেছে।

ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে গার্গী-মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী মহিলা থাকলেও সংখ্যায় তা ছিল একেবারেই নগণ্য। বৈদিকযুগে আর্যদের মধ্যে নারীদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। ঋগ্বেদের যুগে নারী সমাজে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করত। একরকম বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজগত অধিকারে কোন পার্থক্য রাখা হত না। নারী পতির সহিত একসঙ্গে মিলিতভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। বৈদিকযুগে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী নামে দুই পত্নীর উল্লেখ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। এমনকি তখন নারী একাধিক স্বামীকে পতিত্বে বরণ করতেন। সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদ্বয়কে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে পান্ডবগণ যে একই পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন তার নজির বৈদিকযুগে ছিল। ঋগ্বেদে সহমরণের কথা শোনা যায় না। তবে ঋগ্বেদের যুগে সম্ভবতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর নারীরা বৈধব্য জীবন যাপন করত কিংবা কখনও দেবরের সঙ্গে

তার বিয়ে হত। অর্থাৎ নারীর বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। সামাজিক মর্যাদা হিসাবে নারী স্বামীর দ্বারা চালিত হলেও পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার বিশেষ স্থান ছিল। ঋগ্‌বেদের প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারীর যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং বহু বেদমন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন নারী। ঋগ্‌বেদের অসংখ্য সূক্তির রচয়িতা হিসাবে নারীর নাম পাওয়া যায়। যেমন—লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, সূর্যা, বাক্ ও ইন্দ্রাণী প্রভৃতি। অথর্ববেদেই প্রথম সহমরণের কথা শোনা যায়। বৈদিক সাহিত্যের যুগেই আবার নারীকে দেখা হয়েছে ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য হিসাবে। রামায়ণেও দেখা যায় যে রামচন্দ্র সীতাকে পরহস্তগতানারী বলে গ্রহণ করতে পারবেন না এই কারণ দেখিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে সেযুগে নারীর মূল্য বা স্বাধীনতা যে একেবারে ছিল না তা মনে হয় না। কেননা লক্ষ্মণ বনগমন করলেও উর্ম্মিলা কিন্তু রাজপ্রাসাদেই রয়ে গেলেন। দশরথের মৃত্যুর পরে রাণীরা বিধবা অবস্থায় বেঁচেই রইলেন, কেউ সতী হননি। মহাভারতেও দেখা যায়, রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হলে তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে মাদ্রী সহমৃতা হন, কুন্তি বেঁচেই রইলেন।

প্রাচীন বৈদিকযুগে আর্যদের মধ্যে সহমরণ প্রথা ছিল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে "বরং এই প্রথা প্রাচীনকালে য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় আর্যেতর জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এদেশে আর্যদের মধ্যে এই প্রথা বিদেশী অনার্যদের নিকট হইতে আমদানি করা।"[১] আর্যদের মধ্যে পিতাই পরিবারের কর্তা । পতি-পত্নীর সম্বন্ধের মধ্যেও পতির স্থান প্রধান। দ্রাবিড় সভ্যতায় নারীদের প্রাধান্যের যতটা পরিচয় মেলে, আর্যসভ্যতায় ততটা দেখা যায় না। তখনকার দিনে সকলেই পুত্র কামনা করতেন। "পুত্রৈষণা বিত্তৈষণাই গৃহীর ধর্ম। কন্যাও স্নেহের ছিল তবে পুত্রের মত নয়।"[২]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের অধিকার বা ক্ষমতা কমে আসতে শুরু করে। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যেও মেয়েদের স্থান সমাজে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে দেখা যায়। নারীরা যাতে পুরুষের অধীনে থাকে সেজন্য মনু কতকগুলি নির্দেশ জারি করেছিলেন। পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারগণ উক্ত নির্দেশগুলির উপর নির্ভর করে নারীর স্বাধীনতা হ্রাস করেন। এইসব শাস্ত্রকারদের বিভিন্ন নির্দেশের জন্যই সমাজে নানা কু-প্রথার প্রচলন হয়। যেমন—'সতীদাহ', 'বাল্যবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ' প্রথা। আবার অপরদিকে বিধবা বিবাহ অবৈধ বলে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করে। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করে তাদের অজ্ঞানতার

অন্ধকারে রেখে দেবার জন্য স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজপতিরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ঘোষণা করেন - ১. শাস্ত্রে স্ত্রী-শিক্ষার কোন উল্লেখ নেই। ২. মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ব্যভিচারিণী হয় এবং স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে শেখে। ৩. মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জন করতে হয় না বলে তাদের বিদ্যাশিক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। ৪. মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়।

ব্রিটিশযুগের আগে পুরুষদেরও লেখাপড়ার হার ছিল খুবই কম। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আর বৈদ্যদের মধ্যে লেখাপড়ার চল ছিল। মুসলমানদের মধ্যে মোল্লা-মুনসি আর রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশই ধর্মীয় ভাষা ছাড়া অন্য কিছু পড়তেন।

ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সর্ববিধ ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন এসেছিল মানুষের জীবনযাত্রায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভাবনার পথ ধরে আমাদের দেশে যে 'নবজাগরণ' দেখা গিয়েছিল তা ইউরোপীয় 'রেনেসাঁস' থেকে স্বতন্ত্র। *"The Renaissance in Bengal lacked the tremendous sweep and vital energy of the many sided upsurge in the midst of which was shaped its European prototype".*[৩]

ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে সীমিত এই নবজাগরণকে বরং সমাজজীবনের আধুনিকীকরণ বলা চলে। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লেখেন - উনিশ শতকের বঙ্গভূমের বিশেষ অবস্থাটা খুব সরল ছিল না, বরং খুব জটিলই ছিল, ...তার উপর ইংরেজের ক্রমকুঞ্চনমান ক্রমপোষণমান রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বজ্রমুষ্টি সেই অবস্থাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিল দিনের পর দিন। রামমোহন থেকে শুরু করে প্রায় ১৮৯০-১৯০০ পর্যন্ত আধুনিকীকরণের কর্মকর্তারা বুঝেছিলেন সমাজজীবনের আধুনিকীকরণ ছাড়াও বহু শতাব্দীর আবর্জনা, অন্ধ আচারবিচারের গ্লানি, অজ্ঞতার অন্ধকার আর সর্বব্যাপী তামসিকতার হাত থেকে সর্বাগ্রে মুক্তি প্রয়োজন। আর এই মুক্তি না হলে ইংরেজের বজ্রমুষ্টি থেকেও নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই।[৪] অধ্যাপক সুশোভন সরকারও তাঁর প্রবন্ধে অনুরূপ কথা বলেছেন, *"The first impression of liberal westernism was the passion for social reform the attack on traditional practices and institutions which now loomed blind, irrational and unjust".*[৫]

উনিশ শতককে বলা হয়েছে 'পরিবর্তনের যুগ' এবং সে পরিবর্তন এসেছিল সারা শতক জুড়ে। আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল সমকালীন মধ্যবিত্তশ্রেণী এই পরিবর্তনের সারথি হয়েছিলেন। সেকালে বাঙ্গালী নারীর ছিল না কোন ব্যক্তিসত্তা বা স্বাধীনতা। মানবিক প্রায় সমস্ত অধিকার থেকে নারী ছিল বঞ্চিত। জন্ম থেকেই তাদের উপরে নেমে এসেছিল অভিশাপের বোঝা। তাই নিজের বয়স বা অন্য কিছুকে বুঝে ওঠার আগেই ৮/৯ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যেত। আবার কারো ক্ষেত্রে বা তাদের বহু পত্নীক স্বামীর ঘর করতে হত নীরবে সব কিছুকে সহ্য করে। পুরুষশাসিত সমাজপতিরা নারীদের কোন অধিকার মানতে ছিলেন অরাজি। স্বামীর সম্পত্তি থেকে কিভাবে নারীদের বঞ্চিত করা যায়, সেই চিন্তা তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। নারীর আপন অধিকার অর্জন বা প্রতিষ্ঠিত করার মানসিক প্রবণতা তখন সমাজে কারোরই ছিল না। এইসব অসহায় নারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও এরূপ আরো কিছু সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণ। তাঁরা নারীমুক্তির কথা ভাবলেন।

উনিশ শতকের সূচনায় মেয়েদের সহমৃতা হওয়া ছিল সাধারণ ব্যাপার। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণেরা এই কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কলকাতার আশেপাশে তখন মেয়েরা অসহায়ভাবে পুড়ে মরছিলেন। তখনকার মানুষজনের একাংশ এ-প্রথাকে নতমস্তকে মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা এ প্রথার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন তুললেন, প্রতিবাদ করলেন। এভাবে স্ত্রী হত্যার বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেন। শুরু হল এ প্রথার পক্ষে বিপক্ষে তুমুল বাদানুবাদ।

১৮১৭ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় মতের সংকলন ও ব্যাখ্যা করেন। তার মর্মার্থ, চিতারোহণ অপরিহার্য নয়, ইচ্ছাধীন। সহমরণ ও শুদ্ধজীবন যাপন দুই-ই শাস্ত্রসিদ্ধ, তবে শেষেরটিই শ্রেয়।

১৮১৮ সালে প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ে 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুস্তিকায় রামমোহন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনেক যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' ঐ একই বছরে প্রকাশিত হয়। 'স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হয়', এই অভিযোগের উত্তরে রামমোহন দ্বিতীয় পুস্তকে এই যুক্তিগুলি সব খন্ডন করেন।

রামমোহনের সময়ে সতীদাহ প্রথার আন্দোলনই সবচেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সমাজজীবনের যে আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছিল তার প্রথম সাফল্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের সরকারী নির্দেশ (Regulation XVIII of 1829) বলে সতীদাহ প্রথার বিলোপ। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি বলা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন।............. হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ....। অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন।"[৬] সমাজে তখন অনেকেই রামমোহনকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ একটি প্রবন্ধে লেখেন যে স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনকে তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন।[৭] সেকালে অনেকেই স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় সতী হতে চাইতেন। প্ররোচনা ও বলপ্রয়োগের ঘটনা থাকলেও স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সহমৃতা হবার নিদর্শনও পাওয়া যেত। শাস্ত্রানুযায়ী অসতীদের সহমৃতা হবার অধিকার ছিল না। সহমৃতা হতে চাইবার এও ছিল এক কারণ।[৮] 'উনিশশতকী পুনরুজ্জীবন'-এর অন্যতম শুভ ফল হিসাবে প্রথমে বাঙ্গালী পুরুষদের জীবনে শিক্ষার সুযোগ আসে। ঐ শতকে বালকদের শিক্ষালাভের জন্য বহু বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু বালিকাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮১৮ সালের প্রথমদিকে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির যাজক রবার্ট মে হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে প্রথমে ১৪ জন এদেশীয় ছাত্রী নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অ্যাডামের মতে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য বঙ্গদেশে এবং মনে হয় ভারতে প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল ১৮১৮ তে মে সাহেবের দ্বারা সংগঠিত এক বিদ্যালয়।[৯] সাহেবের অকাল মৃত্যু হলে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮১৮ সালে কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। ১৮১৮ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদেশী মিশনারিদের উদ্যোগের পূর্বে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে এবং বৈষ্ণব সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে স্ত্রী-শিক্ষার সুযোগ থাকলেও প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) তাঁর আধ্যাত্মিকা পুস্তকের ইংরাজী ভূমিকায় লিখেছিলেন - *"While a pupil of the pathshala at home I found my grand mother, mother and Aunts reading Bengali books. They would write in the Bengali and keep accounts".*[১০]

বৈষ্ণব মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ছিল তা ফাদার জেমস্ লঙ্ সাহেবের মন্তব্যে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন : *"Many of the vaishnava women can read and write. We know the case of a vaishnava widow in Calcutta, who not only reads and writes Bengali well but is also acquainted with sanskrit and supports herself by copying sanskrit works".*[১১]

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয়—এই আপত্তির উত্তরে সে যুগে 'সুলভ পত্রিকায়' লেখা হয়েছিল—"এ প্রশ্নে আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিনা। কারণ বিদ্যার কি মারাত্মক শক্তি আছে? বিদ্যা কি পরভোজী ব্যাঘ্র? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয় বিদ্যা তাহাকেই সংহার করিতে পারে।"[১২] স্ত্রী-লোকেরা পশুসদৃশ, তারা শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম—এমন অযৌক্তিক কথাও ভাবা হয়েছে। *"It was thought that educated girl was doomed to early widowhood and a pandit assured Miss cook, one of the early pioneers, that she shd, never succeed, their women were all beasts, quite stupid, never cd. or wd. learn nor wd. the Brahmins ever allow their females to be taught etc. etc."*[১৩]

১৮৪৯ সালের ৭ই মে শিক্ষা সংসদের তদানীন্তন সভাপতি জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষাদানের এটি প্রথম নামী শিক্ষায়তন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করতে থাকে।

এইভাবে নারীদের জীবনে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ আসে। ক্রমে দেশীয় উদ্যোগে আরো বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বেথুন সাহেব স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে

১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে যে কথা বলেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তির দিগদর্শন, *"For her own sake and in her own write I claim for women her proper place in the scale of created beings. God has given her an intellect, a heart and feelings like your own, these were not given in vain".*[১৪]

নারীমুক্তির অন্যতম প্রবক্তা তারাশঙ্কর তর্করত্ন সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"অবশেষে এই বক্তব্য পিতামাতা স্বীয় পুত্রসন্তানদিগের বিদ্যানুশীলনে যেরূপ যত্নশীল হয়েন, তদ্রূপ কন্যাসন্তানগণের প্রতি সদয় হইয়া বিদ্যারস প্রদান করিলে তাহারা ভাবি সুখের আশা হইতে বঞ্চিত হননা। বিদ্যার প্রধান ফল অর্থলাভে নহে কিন্তু সুখ ও সন্তোষ।"[১৫]

প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর একটি গ্রন্থে নারী শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে আরও সাহসী বক্তব্য পেশ করেছেন, "স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে অশ্রেষ্ঠ নহে, অতএব পুরুষের যেরূপ শিক্ষা হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকের শিক্ষা হওয়া উচিত।"[১৬]

সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথা আইনের সাহায্যে ও জনমতের প্রভাবে নিবারিত হয়েছিল। কিন্তু নারীজীবনের অভিশাপ হিসাবে তখনও প্রচলিত ছিল বাল্যবিবাহ ও অবরোধ এবং কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের মূল প্রবক্তা বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। অনেক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহের পক্ষে আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তখন বহুবিবাহ রোধ সম্ভব হয়নি।

পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত সমসাময়িক নব্য হিন্দু যুবকবৃন্দের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা এবং স্ত্রী সম্পর্কে নূতন যে সচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল ঐ সময়ে লিখিত বহুরচনা ও পত্র পত্রিকায় তার প্রকাশ ঘটে। ১৮৩৮ সালে 'সমাচার দর্পণে' একটি লেখায় নব্যশিক্ষিতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাহাদের সম্প্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন। অন্য একজন লেখক আরো স্পষ্ট ভাষায় কমবেশী একই মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন—শিক্ষিত সম্প্রদায় একটি বিষয়ে খুব

অসুখী— এরা ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে সুখ ও মানসিক শান্তি পান না। যারা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা করছিলেন, তাদের লক্ষ্য করে 'জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা' লিখেছিলো— ছেলেদের শিক্ষা দিও না, তাহলে মেয়েদেরও শিক্ষা দেবার দরকার হবে না।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের একটা অংশে সচেতনতা জেগে উঠলেও মহিলাদের শিক্ষা এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সেকালের সমাজের বিরোধিতা ছিল সুতীব্র। বেথুন স্কুল সরকারী আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছাত্রী সংখ্যা ছিল নগণ্য। হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মত যারা স্কুলে কন্যা দিয়েছিলেন, তাঁরা সমাজের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পুলিশ ডাকতেও বাধ্য হয়েছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের মত অনুগত ব্রিটিশ প্রজাও বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে তার প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং তা পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। স্কুলের শিক্ষিকা জোগাড় করাও ছিল দুঃসাধ্য। সীমিত সংখক নাগরিকের মধ্যে সচেতনতা দেখা দিলেও স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করতে এবং মহিলাদের পক্ষে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে লাভবান হতে অনেক সময় লেগেছিল। এমনকি যাঁরা ইংরেজ আমলের এবং ইংরাজী শিক্ষার সুফলভোগী হয়েছিলেন, তাঁরাও স্ত্রীশিক্ষার নামে বিচলিত বোধ করতেন।

সমাজের প্রতিকূল মনোভাবই বোধ হয় স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের সবচেয়ে প্রবল অন্তরায় ছিল। তখন সমাজে অবরোধ অথবা পর্দাপ্রথা যে কি ভীষণ ছিল রাসসুন্দরী, কৈলাসবাসিনী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং বেগম রোকেয়া তার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন । মেয়েরা চিরকাল অন্তঃপুরে বন্দী থাকতেন, তাদের কোথাও যাবার অনুমতি ছিল না, দিনের বেলা কোন পুরুষের, এমনকি স্বামীর সঙ্গেও দেখা করার রীতি ছিল না। স্ত্রী শিক্ষা বিকাশের এটাও কিছু কম অন্তরায় ছিল না। কেবল তখন পুরুষদের সঙ্গেই নয়, পর্দা পালন করতে হত শাশুড়ী এবং এ জাতীয় অন্য মহিলাদের সঙ্গেও। হিন্দু সমাজে মেয়েদের ৭/৮ বছর বয়স হলেই বিয়ে হয়ে যেত এবং বিয়ের পরেই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হত। মুসলমান মেয়েদের বন্দীত্ব আরম্ভ হতো তারও আগে থেকে। যদিবা কোন পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ থাকত, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হত না। অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হবার ফলে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখা সম্ভব ছিল না। তাই নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতার গোড়ার কথাই হল সর্বাগ্রে মেয়েদের অবরোধ মোচন। প্রথমদিকে অবরোধ মোচনকেই নারী স্বাধীনতা বলে

মনে করা হত।

উনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি ইত্যাদির ধারণা আদৌ ছিল না। কখন যে এই ধারণার সূত্রপাত হয় তাও গবেষণার বিষয়। সেকালে স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে মেয়েরাই বা কি বুঝতেন তাও জানা যায় না। মহিলাদের নিজেদের লেখা বেশী না থাকায়, সমাজের উপর তলার বিচ্ছিন্ন কিছু মহিলার চিন্তা ভাবনার কথা অস্পষ্টভাবে জানতে পারলেও, এ বিষয়ে ব্যাপক ইতিহাস উদ্ঘাটন করা এখন প্রায় অসম্ভব।

তবে আগেই বলেছি, অষ্টাদশ শতকের তিনের দশকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ইয়ংবেঙ্গলের অনেকে সমাজে মহিলাদের অত্যন্ত নিচু অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁরা 'জ্ঞানান্বেষণে'র পাতায় যখন মহিলাদের সমানাধিকারের কথা লেখেন, সেইসময় এই ধারণার দ্বারা অল্পসংখক লোকই প্রভাবিত হয়েছিলেন। বৃহত্তর সমাজ এই যুবকদের রচনায় আকৃষ্ট হয়নি। অক্ষয়কুমার দত্তের সমকালীন একটি রচনা (১৮৪২) থেকে জানা যায়, তিনি অন্ততঃ তরুণদের বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি লেখেন, "ইদানিং অনেকেই ইচ্ছা করেন যে স্ত্রীলো কেরা পুরুষদের ন্যায় স্বাধীনা হউন"............... 'স্বাধীনা হউন' কথাটার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'অর্থাৎ সর্বত্র ভোজন, সর্বত্র গমন, সকলের সহিত কথোপকথন করুন"। তরুণেরা এটা চাইলেও, তিনি নিজে এ ধরণের স্বাধীনতার বিরোধী। তবে তিঁনি মহিলাদের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখতে চান না। মহিলাদের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপন করতে চান।

কয়েকবৎসর পরে ১৮৪৬ সালে তিনি যখন 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় নারীদের অবস্থাকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ এবং দাসীদের সঙ্গে তুলনা করেন, তখনও স্ত্রীস্বাধীনতা শব্দটি তিনি চিন্তা করেননি। নারীদের প্রতি সেযুগের তুলনায় তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও এবং তাদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সচেতন হলেও, স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না।

তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সমকালে আরো কেউ কেউ সীমিত অর্থে মহিলাদের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। 'দুর্জনদমনমহানবমী পত্রিকা'র রক্ষণশীল সম্পাদক মহিলাদের স্বাধীনা হবার কথা বিদ্রূপ করে লিখেছেন (১৮৪৭। 'সম্বাদভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের 'স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান' শীর্ষক এক সংবাদে স্বাধীনতা শব্দের ব্যবহার করেন ১৮৪৯

সালে। এ সংবাদ তিনি প্রকাশ করেন - বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে এবং মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েই। তবে স্ত্রী স্বাধীনতা শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি। তবে কয়েকবৎসর পরে ১৮৫৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন এবং সমকালীন মহিলাদের তুলনা প্রসঙ্গে 'স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ও বিদ্যাশিক্ষার আধিক্য' সম্বন্ধে লেখেন। বিদ্যাসাগরের মত নারী দরদী সমাজ সংস্কারক ১৮৫০ এর দশকে নারীদের বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশ করলেও স্ত্রী স্বাধীনতার কথা কোথাও লেখেন নি।

১৮৬৩ সালের আগষ্টমাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্যই ছিল বামাগণের উন্নতি। এই পত্রিকাতেই প্রথম নারী স্বাধীনতার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় নারীরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, অশিক্ষিত এবং পুরোপুরি পুরুষের মুখাপেক্ষী। সমাজের অগ্রগতি এবং নারীজীবনের পরিপূর্ণতার জন্য নারীদের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা আবশ্যক। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৬৬ সালে 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত একটি রচনায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ দশকের শেষে 'স্ত্রীস্বাধীনতা নামক পুস্তিকা'য় মেয়েদের স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানান।

স্ত্রীস্বাধীনতা শব্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় ১৮৭২ সাল থেকে। এই বছরের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দুই উপদলকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকায় যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয় তাতে স্বাধীনতা শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়। প্রগতিশীল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'বামাবোধিনী' পত্রিকাই নয়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ', 'মধ্যস্থ' ইত্যাদি পত্রিকায়ও এই সময় 'স্বাধীনতা' এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগীর, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তি মেয়েদের উপাসনার সময়ে পর্দার বাইরে বসার দাবিকে সমর্থন করেন। সে কারণে তাদের দলের জনপ্রিয় নাম হয় 'স্ত্রীস্বাধীনতাদল'। 'হালিশহর পত্রিকা' ব্যঙ্গ করে কেশব সেনের দলকে 'বক্তৃতামূলক' এবং দুর্গামোহন দাসের দলকে 'স্ত্রী সর্বস্ব' দল বলে ব্যঙ্গ করেন। 'মধ্যস্থ'এদের নাম দেয় যথাক্রমে 'উন্নতিশীল' ও 'বেড়ে উন্নতিশীল'।

স্ত্রীস্বাধীনতা পদটি তখনও অত্যন্ত সীমিত অর্থেই প্রচলিত ছিল। অবরোধমোচন করে প্রকাশ্য স্থানে গমন, পুরুষের সাথে কথোপকথন, শিক্ষাদান, স্বাধীনভাবে ধর্মপালন ইত্যাদিকেই প্রথম স্ত্রী স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হতো। ১৮৬৬ সালে মেরি কার্পেন্টারের সংবর্ধনা সভায় নব্যশিক্ষিত ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা তাঁদের

স্ত্রীদের সাথে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করতে উৎসাহিত করেন। মহিলাদের সম্বোধন করে তাদের একজন বলেন—ভগিনীগণ! আপনাদের স্বামীরা যদি আপনাদের মঙ্গলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনারা সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাদের নীচতাকে অতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার হার তাহা কণ্ঠদেশে পুনর্বার পরিধান করুন।

অন্য একজন বলেন—আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে তোমরা দূর কর। তোমরা জড় বস্তু নও, পশু নও যে স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে। .... আমাদিগের ন্যায় তোমাদিগেরও চিন্তা ও কার্যসকল বিষয়ে তুল্য স্বাধীনতা আছে। .... আমরা তোমাদিগের মত চলিতে পারি না এবং তোমরাও শুদ্ধ আমাদিগের আদেশে চলিতে পার না।

এই উভয় উক্তি থেকে পুরুষদের আন্তরিকতা এবং মহিলাদের প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় সহানুভূতি প্রকাশ পেলেও স্ত্রী স্বাধীনতা বলতে তাঁরা কি বোঝাচ্ছিলেন তা অস্পষ্ট। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নারী স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেন, তা এরূপ—যাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিতেছেন, তাহাদিগের জানা কর্তব্য যে, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হওয়া অর্থাৎ ধর্ম্মপথে চলাই স্বাধীনতা । স্বীয় ইচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিলে স্বেচ্ছাচারী হওয়া যায় .... কেহ যেন স্বাধীনতা লইতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ না করেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহিলাদের স্বাধীনতা দেবার প্রশ্নে খুব উৎসাহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। কেশব সেন মহিলাদের স্বাধীনতা দেবার প্রশ্নে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ মতই প্রকাশ করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার মেয়েদের জন্য 'মাসিকপত্রিকা' প্রকাশ করেন। ১৮৬৩তে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪তে কেশবচন্দ্র সেনের 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' গঠিত হয়। এগুলি সবই নারীশিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সস্ত্রীক অবরোধ প্রথা ভঙ্গ করেন। ১৮৭৮ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ আসে। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারীশিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই নারী কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি ধর্মীয় আলোচনা সকল ক্ষেত্রেই অবরোধ ভেঙে প্রকাশ্যে অবতীর্ণ

হতে থাকেন। তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নারী এগিয়ে চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে।

ক. বাংলা সাহিত্য রচনা ও আলোচনায় মহিলাদের প্রবেশ ঃ

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উনিশশতকের প্রথমার্ধে কোন মহিলা সাহিত্যিকের খোঁজ পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টের শ্যামকিশোর ঘোষের সাধনসঙ্গিনী 'শ্রীমতী' কতকগুলি আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেছিলেন। রঘুনাথ লীলামৃতে এইরকম কয়েকটি পদ উদ্ধৃত আছে। এইসময় বাংলায় কি সাহিত্যে, কি সমাজে চরম অবক্ষয় চলছিল। মিথ্যাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি তদানীন্তন সামাজিক দুর্নীতির ছাপ সাহিত্যে পড়েছিল। কবির লড়াই, আখড়াই পাঁচালি, তরজা, টপ্পাগান প্রভৃতিতে শ্লীলতার ছাপ ছিল না। সাহিত্যে তখন দেবদেবীর গৌরব গাথা বা দেবতুল্য কোন চরিত্র নিয়ে তাদের গুণকীর্তন করা হত। উনিশশতকের নবজাগরণের প্রভাবে যখন সমাজ জীবনে আধুনিকীকরণ শুরু হল, তখন দেব-দেবীর গৌরবগাথার পরিবর্তে সাহিত্যে স্থান পেল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের প্রাবল্যে নীতি পরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা বই বা বাংলা সংবাদপত্র পড়তে ভয় পেতেন। ঈশ্বরগুপ্তের সময় পর্যন্ত কোন ভদ্রমহিলার প্রকাশ্যে সাহিত্যে নামবার উপায় ছিল না। তাই তারা নাম গোপনকরে বিভিন্ন ছদ্মনামে কিছুলেখা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। ১৮৫২-৫৩ সালে 'বরাহনগর বাসিনী বিরহিণী', 'বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী', 'অমুকীদেবী' ও 'স্ত্রী' রচিত কবিতা এইসব ছদ্মনামে 'প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি সত্যি সত্যিই মহিলা রচিত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। মহিলা রচনা সহজে গৃহীত ও আদৃত হবে এই আশায় তখন বহু পুরুষ লেখকও মহিলা নামের অন্তরালে সাহিত্যের আসরে নামতেন। এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ভুবনমোহিনী দেবী'র ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখে 'প্রতিভাশালিনী লেখিকা' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তখন মহিলারা নাম প্রকাশে ভয় পেতেন যদি তাদের রচনা গৃহীত না হয় বা উপহসিত হয় এই আশঙ্কায়।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশে সর্বত্র স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে। বাংলার শক্তিমতী লেখিকাদের আবির্ভাব আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। পাশ্চাত্য ভাবধারার যে প্রবল বন্যাস্রোত ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল, তার প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ভারত তার অতীতকে নূতন করে ফিরে পেয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠদান তাকে আমরা তখন গ্রহণ করতে শিখেছি নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। মুসলমান রাজত্বের শেষযুগে যে সঙ্কীর্ণতা ও পঙ্কিলতা সমাজে এসেছিল, তাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে মহিলারা অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও, সাহিত্যক্ষেত্রে যে কজন পুরুষ সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হয়েছিল তাদের সমান পদবাচ্য না হলেও, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার হিসাবে বহু পুরুষ লেখকের চেয়ে অধিকতর প্রতিভার পরিচয় যে দিয়েছিলেন সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে নীতিজ্ঞান এবং সুরুচি ফিরে আসে। নারী লেখিকাদের অনেকে তখনো এই পরিবর্তনকে মেনে নেননি। অজ্ঞাতনাম্নী এক নারী কবি তখনও এইভাবে শ্যামা-বিষয়ক গান লিখছেন :

"কাপড় নেই বললে হ'ত, না হয় আমি দিতেম কিনে।
ছি ছি, কি লাজের কথা। বসন-বিহীনা নবীনে।"[১৭]

ফরিদপুর নিবাসিনী অবলা সেন তার প্রাণের দেবতাকে অন্তরের চিরপরিচিত ভাষায় বেদনা জানাচ্ছেন :

"দীননাথ শুন নিবেদন,
সংসার পূজিয়া মোরা, নিশিদিন, আত্মহারা
খোয়াইনু জীবন জনম।।"[১৮]

হুগলীর একজন সরকারী উচ্চতম কর্মচারীর স্ত্রী লিখছেন : "ওগো লঙ্কা ললিতে, একবেলা যায় তোমার গুণ বলিতে। যখন লাগে ঝাল, করি ঝালা-লাল, ঝরে লাল ঝরঝরিতে। চারিদিকে করি দৃষ্টি, কোথায় আছে মিষ্টি, দেখতে পেলে খাই হাপর-হাপরিতে।"[১৯]

শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায় আমরা জানতে পারি যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্তঃপুরে গৌরী দেবী নামে একজন বৈষ্ণবী এসে প্রতিদিন অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক দান করতেন। তার ভাষার একটু নমুনা : "যামিনী চতুর্যামে লগ্না

হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না। কেননা কৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হয়ে আছেন। আহা! সারা নিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হ'য়ে পড়েছেন। মরি মরি! আহা! প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক, ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছে। বিহঙ্গ-বিহঙ্গীর কলরব নাই, নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্বাকাশ থেকে এখন অস্ত যেতে পারছেন না। সূর্যদেব অরুণ রথে সমাসীন হ'য়ে উদয় হ'তে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে আসে"।[২০]

বাঙ্গালী মহিলা কবির লেখা প্রথম বের হয় 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকায়। এই পত্রিকাখানি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে প্রথমে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ পায়। চার বৎসর বন্ধ থাকার পর 'প্রভাকর' প্রথমে বারত্রয়িকরূপে (প্রকাশ সপ্তাহে তিনবার) ও পরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন থেকে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ঈশ্বরগুপ্ত এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি নূতন লেখক লেখিকাদের রচনা প্রকাশ করে তাদের উৎসাহিত করতেন। তাই 'প্রভাকর' পত্রিকাকে বাংলা সাহিত্যের 'সূতিকাগার' বলা হয়। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত দৈনিক সংবাদ প্রভাকরে' 'দৈবশক্তি' শিরোনামায় এক বিস্ময় বালিকার কবিতা মহিলা-রচিত প্রথম কাব্য মুদ্রণের সাত বৎসর আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

অবিশ্বাস্য এই সংবাদ প্রকাশের পর বালিকাকে তার কবিত্বশক্তির পরীক্ষা একাধিকবার দিতে হয়েছে। 'সংবাদ প্রভাকর' কর্তৃপক্ষও এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ বিষয়ে পত্রিকাতে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়ঃ "আমরা গত দিবস প্রাতে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে ঐ বালিকার নিকট গমন পূর্ব্বক এই প্রশ্ন দিলাম, যথা - 'লেখাপড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে/ কোন অংশে ছোট তারা পুরুষের চেয়ে' - তাহাতে ঐ বিদ্যানুরাগিণী আমারদিগের সন্মুখে বসিয়া একঘন্টা কালের মধ্যে নিম্ন প্রকাশিত কবিতা রচিয়া ঐ প্রশ্ন পূরণ করিল, যথা -

লেখাপড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয় ।
        না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হোয়ে রয় ।।
বিদ্যা না শিখিলে বামা পশুর সমান ।
        অবলা বলিয়া লোক নাহি রাখে মান ।।
মেয়ে বিনে পুরুষ তো না হয় কখন ।
        তবে কেন মেয়েদের না করে যতন ।।

মেয়ে বোলে পুরুষেতে করয়ে হেলন ।
ভিতরের গুণ তার না করে গ্রহণ ।।
লেখাপড়া নাহি শেখে এদেশের মেয়ে ।
কোন অংশে ছোটো তারা পুরুষের চেয়ে ।।[২১]

এই বিস্ময় বালিকার গুণপনার পরিচয় পত্রিকাতে থাকলেও তার নাম প্রকাশিত হয়নি। 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' এর প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে 'প্রভাকর সম্পাদক' তার পত্রিকায় লিখেছিলেন—'কামিনীরা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং স্থিরতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারে, অতএব তাহারা বিদ্যাশালিনী হইলে সাংসারিক লোকযাত্রা নির্ব্বাহসূত্রে অতিশয় মঙ্গল হইবেক .... (১২৫৬, ২৬শে বৈশাখ)। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর মহিলাগণকে পর্দার অন্তরাল ভেদ করে সাহিত্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গমহিলারচিত সর্বপ্রথম পুস্তক 'চিত্তবিলাসিনী'। এটি একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্য, লেখিকা - কৃষ্ণকামিনী দাসী।[২২] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) পুস্তকে ভাষাচার্য সুকুমার সেনও বলেছেন—'মহিলার লেখা প্রথম বই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬) । এই পুস্তকের ভূমিকায় লেখিকা তাঁর দুঃসাহসী প্রচেষ্টা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—''অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যথেষ্ট সাহস জন্মিতেছে যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাততঃ স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধ হয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে তাহা হইলেই এদেশের গৌরবের আর পরিসীমা থাকিবেক না......।''[২৩]

লেখিকা কৃষ্ণকামিনী আশা প্রকাশ করেছেন ও বিশ্বাস রেখেছেন যে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ফলে এদেশের নারীসমাজ অনুপ্রেরণা পাবে, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে জোয়ার আসবে এবং তার ফলশ্রুতিতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাবে। তবে লেখিকার আশা যে সার্থক হয়েছে তা বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে । সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে পরবর্ত্রী দশ বছরে সাহিত্যক্ষেত্রে কৃষ্ণকামিনী ছাড়াও আরও সাতজন লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে। এরা হলেন —

১. বামাসুন্দরী দেবী : বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ আর একজন মহিলার নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন বামাসুন্দরী দেবী। পাবনা জেলায় বাড়ী। তাঁর প্রবন্ধ পুস্তিকার নাম 'কি কিকু-সংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?' এটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২. হরকুমারী দেবী : তাঁর লিখিত কাব্যের নাম 'বিদ্যাদারিদ্র্য দলনী' (কাব্য)। হরকুমারী দেবীর বাড়ী কালিঘাটে। এটিও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৩. কৈলাসবাসিনী দেবী : তাঁর স্বামীর নাম দুর্গাচরণ গুপ্ত। তাঁর লিখিত গ্রন্থের নাম 'হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা'। প্রকাশকাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাঁহার সমুন্নতি' (১৮৬৫)।

৪. কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, মার্থা সৌদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' প্রকাশ পায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৫. কোন সদ্‌বংশীয়া কুলবধূ রাখালমণি গুপ্তের 'কবিতামালা' ১৮৬৫ তে প্রকাশিত হয়।

৬. দ্বিজতনয়া কামিনী সুন্দরী দেবীর 'উর্ব্বশী নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইনি শিবপুর বামনগাছি অঞ্চলের অধিবাসী।

৭. বরিশালের বসন্তকুমারী দাসীর 'কবিতমঞ্জরী' প্রকাশিতহয় ১৮৬৬খ্রীষ্টাব্দে।

বাঙ্গালী নারীর লেখা প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হলেও ছাপা হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গবালা কাব্য' - এর লেখিকার নাম নেই। ঐ বছর (১২৭৫ বঙ্গাঁব্দ) ১৮৬৮ তে প্রকাশিত হয় রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' নামক জীবন স্মৃতির বইখানি। ভাষার সারল্যে এবং মাধুর্যগুণে ঐ সময়কার নারী-রচিত শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হয়েছে। কৈলাসবাসিনী দেবীর কবিতার বই 'বিশ্বশোভা', কামিনীসুন্দরী দেবীর 'বালাবোধিকা' নামে প্রবন্ধ পুস্তক এবং দয়াময়ীদেবীর 'পতিব্রতা ধর্ম' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এক অজ্ঞাত নাম্নী লেখিকার 'কুসুমমালিকা' ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, অন্নদাসুন্দরী দেবীর কবিতার বই 'অবলাবিলাপ' ১৮৭২, লক্ষ্মীমণি দেবীর গার্হস্থ্য বিষয়ক নাটক 'চিরসন্ন্যাসিনী ১৮৭২, শ্রীমতি নিতম্বিনী দেবীর 'অনূঢ়া যুবতী' নাটক ১৮৭২, হরকুমার ঠাকুরের সহধর্মিণী রচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস 'তারাবতী' ১৮৭৩, এবং ইন্দুমতী দাসী প্রণীত 'দুঃখমালা' নামক কবিতার বই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই অহেরুন্নিছাবিবি, রমাসুন্দরী ঘোষ, ক্ষীরোদা দাসী,

শৈলজাকুমারী দেব্যা, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কামিনী দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী, ভুবনমোহিনী দেবী, কুন্দমালা দেবী, নীরদা দেবী, সৌদামিনী খাস্তগীর প্রভৃতি লেখিকার নাম পাওয়া যায়। বসন্তকুমারী দাসীর 'রোগাতুরা' কাব্যগ্রন্থও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'বিনোদিনী' মাসিক পত্রিকা ১৮৭৪ সালে বা'র হয়ে দুবছর বাদে বন্ধ হয়ে যায়। এটি মহিলা রচিত বলে মনে করা হলেও আসলে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী' নামের আড়ালে এই পত্রিকাখানি পরিচালনা করতেন। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত সুরঙ্গিনী দেবীর 'তারাচরিত' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রশংসা লাভ করে। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' ১৮৭৬-এ প্রকাশিত হবার পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলার নারী রচিত সাহিত্যে তাঁর একাধিপত্য চলতে থাকে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিরাজমোহিনী দাসীর 'কবিতাহার' এবং জনৈকা ভদ্রমহিলার লেখা (সম্ভবতঃ লক্ষীমণি দেবীরই) 'সন্তাপিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। সপ্তাপিনী' নাটকে বঙ্গ অন্তঃপুরের চিত্র খুব জীবন্ত।

ব্যঙ্গ ও নারীসুলভ বাগ্‌বিন্যাসে বইটি সুখপাঠ্য। বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এবং বহুবিবাহের বিপক্ষে তৎকালোচিত যুক্তি তর্কও বইটিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়! পর বৎসর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কোরকে কীট' ও 'মনোরমা', এবং হেমাঙ্গিনী দেবীর রোমান্টিক উপন্যাস 'প্রণয়প্রতিমা' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহিনী দেবীর 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতার 'শূরবালা' এবং 'সুরবালা' উল্লেখযোগ্য বই।

যথোচিত শিক্ষার অভাব, তার উপর সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যেও বঙ্গমহিলাগণের সারস্বত সাধনা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। সঙ্গত কারণেই সমালোচক বলেছেন—"সেকালের বাঙ্গালা সমাজের নেতৃবৃন্দ মনে করতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখলে চরিত্রহীনা ও বিধবা হইবে। সেই অন্ধবিশ্বাসের যুগে যে সকল মহিলা কবি বিবিধ গ্লানি সহিয়াও কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের বরেণ্যা—একথা বলিতে পারি।"[২৪]

কৃষ্ণকামিনী দাসী প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে বিদ্যোৎসাহী বিদ্বান স্বামীর সহযোগিতায় যে সামান্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার দ্বারা একটি কাব্যগ্রন্থ রচনায় সক্ষম হয়েছিলেন। এতে তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বামীর অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন। লেখিকা গ্রন্থের ভূমিকায় তা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন— "পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার

করিতেছি, যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।"[২৫] লেখিকা তাঁর কাব্যে 'আত্মপরিচয়' দিয়াছেন পয়ার ছন্দে, পিতৃকুলের পরিচয় তিনি তাঁর কাব্যমধ্যে কোথাও দেন নি। বিবাহিত নারী হিসাবে কৃষ্ণকামিনী দাসী তাঁর শ্বশুর কুলের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন :

জাহ্নবী-দক্ষিণ অংশে হুগলী জিলায়।
সুখরিয়া নামে গ্রাম আছয়ে তথায়।।
সেই স্থানে বৃহৎ এক গোষ্ঠীর বসত।
কায়স্থ উপাধি মিত্র মুস্তৌফীতে খ্যাত।।[২৬]

গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্যের কথা তিনি আর একবার উল্লেখ করেছেন—

"কনিষ্ঠের বংশধর শ্রীশশিভূষণ ।
অধিনীর প্রাণেরবল্লভ সেই জন।।
তাঁর আনুকুল্যে আমি করেছি মনন।
'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থ করিতে রচন।।[২৭]

'চিত্তবিলাসিনী' নাতিদীর্ঘ কাব্য হলেও বিষয়বস্তুর গৌরবে ও রচনার আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে অসাধারণ। অন্তঃপুর বাসিনী একজন গৃহবধূ হয়ে তখনকার প্রচলিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বন্দী থেকে কিভাবে এমন অসাধারণ দক্ষতা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে, ভাবলে অবাক লাগে। চোখ থাকা সত্ত্বেও অবরোধ প্রথার জন্য তাঁর পরিচিত জগৎ ছিল তাঁর কাছে সীমাবদ্ধ। বঙ্গসাহিত্যের আসরে প্রথম লেখিকা একজন প্রথম সারির লেখিকা ছিলেন। গদ্য রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ও উৎকর্ষ ছিল, তবু তিনি কেন পদ্যের শরণ নিয়েছিলেন, তার কৈফিয়ত লেখিকা তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন এবং তাঁর গ্রন্থ পাঠ করার জন্য পাঠকসমাজের কাছে যুক্তিপূর্ণ আবেদন রেখেছেন। "বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে তাহার মধ্যে ছন্দোবদ্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় তাহা গদ্য অপেক্ষা পরিশ্রমের লাঘব ও অনায়াসে সুরস হয় এই বিবেচনা করিয়া আমি চিত্তবিলাসিনী নামে একখানি অভিনব গ্রন্থ অধিকাংশই নানাবিধ ছন্দে বিরচিত করিয়া মধ্যে মধ্যে এক এক পংক্তি করিয়া গদ্যও সন্নিবেশিত করিয়াছি ইহাতে যদিও স্বমত বিরুদ্ধ নূতন ভাব দেখিতে

পান তাহা একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন অবশ্যই তাহা যুক্ত্যনুগত হইতে পারিবে, আর মনে করুন, নূতন একখানি পুস্তক হস্তগত হইলে কত আমোদ জন্মে তাহার কোন অংশ বিরুদ্ধ হইলে দেশ ভাষার উন্নতি হইতেছে এই আনন্দে তাহা নিতান্ত আপনাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় হয় না, বিশেষতঃ সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আদ্যোপান্ত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই অবলার প্রতি অনুকূল হইয়া 'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থ নিরীক্ষণ করিয়া সেই প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিলে সমুদয় আয়াস সফল জ্ঞান করিব।"[২৮]

লেখিকা তাঁর গ্রন্থে কৌলীন্য প্রথা, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন। উনিশশতকের মধ্যভাগে পুরুষ শাসিত সমাজে বাস করে লেখিকা নির্ভয়ে প্রকাশ করেছেন পুরুষের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। বিবাহিতা কুলীন কন্যার দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। 'অধিবেদন' পদের অর্থ - 'স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুরুষের পুনরায় বিবাহ'। বল্লালী কৌলীন্য প্রথার দৌলতে কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক বিবাহ এবং তার বিষময়ফল সমাজে নারীর অশেষ লাঞ্ছনা, দুঃসহ জীবনযাপন। বিধবাবিবাহ আইন পাশ হলেও পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ করার কোনো সরকারী উদ্যোগ ছিল না। শেষ পর্যন্ত পুরুষের সদিচ্ছা ও শিক্ষাপ্রসারের ফলে সামাজিক কু-প্রথা 'অধিবেদন' থেকে নারীজাতির মুক্তি তরান্বিত হল। প্রথমদিকের কৌলীন্য গৌরব ম্লান হতে লাগল। কুলীনের অনেক দোষ দেখা দিল। কুলীন কুলসর্বেশ্বরগণ শুভবিবাহকে ব্যবসায় পরিণত করে নারীর জীবনকে বহুবিধ সমস্যায় জটিল ও ভারাক্রান্ত করে সমাজে তাদের সুস্থভাবে বাঁচা অসম্ভব করে তুলল।

কুলীনদের 'অধিবেদন' ও তার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে শান্তিপুরের একটি পুরাতন বিবরণী রেভারেন্ড লঙ্ সাহেব লিখিত *"The Banks of Bhagirathi'* প্রবন্ধে পাওয়া যায় : *'A kulin chandra Bandyopadhya was killed here 30 years ago. He was married to 100 wives and was murdered by the brother of one of them on account of his profligate conduct towards his sister. Eight of his wives performed sati on his funeral pyre.*[২৯]

কবি কৃষ্ণকামিনীও 'অধিবেদন' প্রসঙ্গে তার বক্তব্য পেশ করে শেষে বিপন্না নারীদের উদ্ধার করার জন্য যোগ্য সমাজ বিপ্লবীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

"হায় কবে সুধীগণ সদয় হইবে।

অধিবেদনের পাঠ উঠাইয়া দিবে।
কুলীন কুমারিগণে করিতে উদ্ধার ।
কি জানি ভারতে কেবা হবে অবতার।।"[৩০]

অবশিষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ব্রহ্মবন্দনা' প্রকৃতপক্ষে ভক্তমনের স্তোত্র। যথা :

"তব মর্ম্মজগদীশ কে পারে বুঝিতে।
স্থিতি লয় সৃষ্টি পার ইঙ্গিতে করিতে।। (ব্রহ্মবন্দনা, পৃঃ ৩)
অধিনীর মনে সদা এই আকিঞ্চন।
চরমে ও-পদে যেন দৃঢ় থাকে মন।।"[৩১]

'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থ সে যুগে পাঠক চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল। তদানীন্তন শিক্ষাধিকারিক ১৮৬৬-৬৭ বর্ষে বইটির কোন কপি সংগ্রহ করতে পারেননি । কাজেই বলা যায় মুদ্রিত সব কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই সংবাদ পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে বইটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম যুগের মহিলা কবিদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাযুক্ত মন্তব্য করেছিলেনঃ "মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুইএকজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করিত।"[৩২]

কৃষ্ণকামিনী দাসীর পরে বাংলার আর একজন মহিলার সাহিত্যকর্মের ইতিহাস অজানা থেকে গেছে! তিঁনি হলেন ঠাকুরাণী দাসী। "উনবিংশ শতাব্দীতে কবি ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রে মহিলা কবিদের লিখিত গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইত। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রভাকর' পত্রে ঠারুরাণী দাসী নামক একজন মহিলা কবির পরিচয় পাই , তিনি নিজ নামে গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। এই ঠাকুরাণী দাসীর পরিচয় জানিতে পারি নাই।"[৩৩]

অন্যসূত্র থেকে পরে জানা গেছে - "মেট্রোপলিটন কলেজের শিক্ষক শ্রীনন্দলাল দাস মহাশয়ের পরিচিতি নিয়ে ঠাকুরাণী দাসী ও তাঁর ভগ্নী থাকমণি দাসীর আবির্ভাব। দুই ভগ্নীই বালবিধবা।...... গুপ্ত কবির তিরোধানে ঠাকুরানী দাসী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে 'জ্ঞানগুরু কল্পতরু'কে প্রণতি জানিয়ে বলেছেন —

'কে আর করিয়া সত্য, সাক্ষি রূপে রাখি সত্য,
সাধারণে করাবে বিশ্বাস।

কে আর বিশ্বাস করি, স্থান দিবে পত্রোপরি
অভাগীর রচনাবলী।"[৩৪]

বিদেশী মিশনারিদের উদ্যোগের পূর্বেও আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। উচ্চবর্ণের সম্পন্ন হিন্দু ঘরে এবং বৈষ্ণব সমাজে নারী শিক্ষার দৃষ্টান্ত অনেক লক্ষিত হয়। চৈতন্যযুগে জাহ্নবীদেবী, সীতাদেবী, সুভদ্রাদেবী, হেমলতা দেবী, মাধবী দাসী প্রভৃতি বহুমহিলা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গঙ্গামণি দেবী, আনন্দময়ী দেবী, রূপমঞ্জরী, হটী বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী পন্ডিত, শ্যামমোহিনী দেবী প্রমুখ বিদ্যাবতী মহিলার কথা জানা যায়, তাতে প্রমাণ করে যে স্ত্রীশিক্ষা ঐ সময় এদেশে সীমিতভাবে হলেও প্রচলিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরো বহু মহিলার সাহিত্য কীর্তির পরিচয় মেলে। তবে ছাপার অক্ষরে গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম কৃতিত্ব কৃষ্ণকামিনী দাসীর। এই সময় সাহসে ভর করে বহুমহিলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় আত্মপ্রকাশ করেন। তবে এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁদের সাহিত্য কীর্তি অবহেলায়, অনাদরে ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য ইঁদুর ও উইপোকার খাদ্যে পরিণত হয়ে কালের অতলতলে তলিয়ে গেছে। যার হদিস এখন ইচ্ছা থাকলেও করা সম্ভব নয়।

বামাসুন্দরী দেবীর প্রবন্ধটি প্রথমে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাপাঠ সকলের পক্ষে সুলভ নয় বিবেচনা করে প্রবন্ধটি একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ভূমিকায় লোকনাথ মৈত্রেয় লিখেছেন, তিনি বামাসুন্দরীকে প্রশ্ন করেছিলেন—" কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?" এ প্রশ্নের উত্তরে বামাসুন্দরী কয়েকদিন পরে একটি প্রবন্ধ প্রশ্ন-কর্তার হাতে তুলে দেন। লোকনাথ মৈত্রেয় ভূমিকায় লেখেন : "আমি তাহার রচনা নৈপুণ্য দর্শন করিয়া যে প্রকার আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভাবিত নহে। ঐ আনন্দই আমাকে উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রচার করিবার নিমিত্ত মুহুর্ম্মুহুঃ প্রেরণ করিতে লাগিল। আমি ১৫ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে (১৫ই ফাল্গুন, ১২৬৭ বঙ্গাব্দ) উহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ পত্রিকা পাঠ সকলের সুলভ নহে। বোধ হয়, অনেকে ঐ প্রবন্ধটির মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই, অতএব এই রচনাটি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের নয়নগোচর হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রবন্ধটি একখান ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক হইবে না বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিবিষ্টমনা হইলে আমাদের

দেশের রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তাহা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনীতভাবে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্ব স্ব পরিবারস্থ কামিনীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যত্নশীল হউন।[৩৫] বামাসুন্দরী নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি স্ত্রী-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজ তা ভাল চোখে দেখেননি। তাঁর স্বামীকে ও পরিজনদের এজন্য অনেক সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। অন্যসূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে "নারী শিক্ষা ও সমাজসেবা নিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। ....বামাসুন্দরী সে যুগের নারীদের পথপ্রদর্শিকা, নারীরা বুঝতে পেরেছেন মুক্তি আরোপ করা যায় না, অর্জন করতে হয়"।[৩৬] যে সময়ে বামাসুন্দরীর প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল, তখন সমাজে রামমোহন রায় প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের একটা বড় অংশের বিরোধ চলছিল। কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা বর্জিত একটি সংস্কৃত রূপ বলেই মনে করতেন। হিন্দুধর্মের কট্টরবাদীরা ব্রাহ্মদের 'বেহ্মজ্ঞানী' বলে উপহাস করতেন। কুসংস্কার দূর করে দেশের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে লেখিকা পূর্বোক্ত বিরোধিতার অবসান ও রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রসার কামনা করেছেন।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লেখিকা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—"যে স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে তাঁহার জন্মভূমি পাবনা জিলা। তথায় স্ত্রীবিদ্যালয় নাই। স্ত্রীবিদ্যালয় দূরে থাকুক, পুরুষেরও তাদৃশ লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই। আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তিনি রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই। স্বজনের সাহায্যে যে কিছু শিখিয়াছেন এই মাত্র"।[৩৭]

এদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বার্ধক্যবিবাহের অবসান দাবী করেছেন। 'জাত' নিয়ে নানা কুসংস্কার, ইংরেজদের 'ম্লেচ্ছ' ভেবে ঘৃণা করা এবং তাদের স্পর্শ করলে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গোদক স্পর্শ করা—এধরনের আচরণ নিজেদেরই ছোট করে। লেখিকা ইংরেজদের কর্মসমূহের অসাধারণ প্রশংসা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন : "হে সর্ব্বরঞ্জন বিপদভঞ্জন নিরঞ্জন। আমাদের দেশের উপর একবার করুণা কটাক্ষপাত কর তবেই সকল অমঙ্গলের মূল উৎপাটন হইবে।"[৩৮]

বঙ্গমহিলা লিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম প্রবন্ধ পুস্তিকা নিয়ে আলোচনায় একথা বলা যায় যে উভয় লেখিকাই কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ (অধিবেদন), বাল্যবিবাহ ও বার্ধক্যবিবাহ ইত্যাদি কুসংস্কার যে সমাজের বহু ক্ষতি করছে একথা উল্লেখ করেছেন । সমাজ ও নারীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিধবা বিবাহ প্রবর্তন করা এবং বহুবিবাহ রোধ করা উচিত বলে মনে করতেন। বামাসুন্দরী দেবী ব্রাহ্মধর্মের উদারতা, পবিত্রতা ও কুসংস্কার বিরোধিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে এই দুর্ভাগা দেশকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রসার চেয়েছেন। সেকালের লেখিকাদের সীমিত সাহিত্য চর্চা ব্যর্থ হয়নি । নারী তাঁদের চিন্তার ফসল অক্ষরে গেঁথে বাগ্‌দেবীর পূজায় ব্রতী হয়েছেন এবং সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে অথবা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ।

মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী এক লেখিকা তাঁর জ্ঞান ও ধর্ম্মে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার শীর্ষক প্রবন্ধে বামাকুলকে জ্ঞানশক্তিতে সবলা হবার পথনির্দেশ করছেন ঃ —

"উঠগো ভগিনি সব! কব নিশ্চয়,"[৩৯]

হরকুমারী দেবীর ৮৩ পৃষ্ঠার কাব্য 'বিদ্যা দারিদ্র্যদলনী' (প্রকাশকাল ১২ই আশ্বিন ১৭৮৩ শক) বিদ্যারই জয়গান । যেমন —

'প্রথম সময় হয় শৈশব সময় ।
বিদ্যাপক্ষে শ্রম কর গিয়া বিদ্যালয় ।।
মহাধন বিদ্যারত্ন লব্ধ হবে তাতে ।
সুযশ সুখ্যাতি লব্ধ হবে এ জগতে ।।
বিদ্যাধন যে জন রেখেছে দেহাগারে ।
দুষ্কর তস্কর তার কি করিতে পারে ।।'[৪০]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে আগষ্ট তাঁর জন্ম হয়। তাঁর আবির্ভাবে বাঙ্গালার নারী-সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার এক জমিদার পরিবারের উচ্চশিক্ষিত দৃঢ়চেতা যুবক জানকীনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । আট বছর বয়েস থেকেই ভাল লিখতে শুরু করেন। তিনি যে ভবিষ্যতে বড় লেখিকা হবেন তার প্রকাশ শৈশবেই দেখা গিয়েছিল। একবার মহর্ষি তাঁর লেখা দেখে খুশী হয়ে খাতার

পাতায় লিখেছিলেন, 'স্বর্ণ তোমার লেখনীতে পুষ্প বৃষ্টি হউক'। তিনি যথার্থ যুগ সাহিত্যিকা ছিলেন। তিনিই প্রথম মহিলা সাহিত্যিক, যিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে নারীর শক্তিকে সকল দিক দিয়েই জাগিয়ে তুললেন। নারীর রচনাকে পুরুষের কৃপাদৃষ্টি থেকে উদ্ধার করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর পূর্বে কোন মহিলা গদ্যে ও পদ্যে সমানভাবে কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। অতীত ও বর্তমানের নারীর মধ্যে তিঁনিই প্রথম যুগসূত্র।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এটি পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার কাহিনী নিয়ে লেখা, তারপর একে একে 'বসন্ত উৎসব' (নাটক), 'মালতী' (উপন্যাস), 'গাথা' 'দেবকৌতুক' (নাটক), 'কোরকে কীট', 'ফুলের মালা', ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা', 'হুগলীর ইমামবাড়ী,' 'বিদ্রোহ', 'মিবার রাজ', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবানী', 'ফুলের মালা', 'পাকচক্র', 'কাহাকে', 'নবকাহিনী', 'বাল্যবিনোদ' প্রভৃতি উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার বই এবং শিশুপাঠ্য পুস্তক তিনি রচনা করেন। নারীর দানের মধ্যে তার দান যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার নারী জগতের তিনি যে উপকার করেছেন, তার তুলনা হয় না। এরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা শুধু ভারতে কেন, অন্যত্রও সুলভ নয়। তিনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে "ভারতী"পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদিকারূপে বিষয় নির্বাচনে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং মৌলিক রচনায় তিঁনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নূতন লেখক-লেখিকাদের যেমন নাম করা পত্রপত্রিকায় লেখনী প্রকাশের সুযোগ করে দিতেন, তেমনি তাদের প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে লেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করতেন। তাঁর পরেই বাংলা দেশে মহিলাদের সাহিত্যচর্চ্চা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়।

সমাজের দুর্জয় বাধা অতিক্রম করে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে একটু একটু করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে থাকেন। যদিও সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য। সে কালের সমাজে যে দুস্তর পাহাড় প্রমাণ বাধা ছিল রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও বেগম রোকেয়ার লেখা থেকে তৎকালীন সমাজের কিছু অংশ তুলে ধরছি। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে আত্মজীবনী লেখার ঐতিহ্য তেমন ছিলনা। দু-একজন কবি নিজেদের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁদের রচনায় দিলেও পাকাপাকিভাবে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখা শুরু হয় কেশব সেন পরিচালিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যেই। এইসব আত্মজীবনী প্রকাশিত হতে থাকে গত উনবিংশ শতাব্দীর

শেষদিক থেকে ।

বাংলাভাষায় পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখেন একজন প্রায় অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা, নাম রাসসুন্দরী দেবী। ইউরোপেও প্রথম আত্মজীবনী লেখেন এক ইংরেজ মহিলা—মার্জারী কেম্প। তিনিও রাসসুন্দরীর মত আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া তেমন শেখেন নি। তাঁর শিষ্যেরা তা লিখেছিলেন। পঞ্চদশ শতকে লিখিত এই আত্মজীবনীর তুলনায় রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী ছিল পূর্ণতর । মাজরি কেম্পের আত্মজীবনীতে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আর উচ্ছ্বাস ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা ছিলনা। কিন্তু রাসসুন্দরীর লেখায় ঐ সময়ে সমাজে মহিলাদের অবস্থান কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় । রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে (ইং ১৮৬৮)। বইটিতে রয়েছে বারোটি সন্তানের জননীর দিনলিপি। ১৮০৯ সালে রাসসুন্দরী জন্মেছিলেন পাবনা জেলার পোতাজিয়া নামক এক অজ পাড়াগাঁয়ে। তাঁর পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। তিনি যখন মারা যান তখন রাসসুন্দরীর বয়স চার বৎসর। রামদিয়ার ভূস্বামী সীতানাথ সরকারের সঙ্গে বারো বৎসর বয়সে রাসসুন্দরীর বিয়ে হয় ।

সেকালে মেয়েদের ৮/৯ বছর বয়স হলেই বিয়ে হত । মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার কোন সুযোগ ছিল না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়, সংসারের অকল্যাণ হয়। মেয়েরা তো আর আয় করবে না, সুতরাং তাদের পড়াশুনা অর্থহীন—এই ছিল তখনকার সমাজের ভাবনা ।শৈশবে রাসসুন্দরীও মহিলা বলে লেখাপড়ার কোন সুযোগ পাননি। সেকালে সমাজে মহিলাদের স্থান ছিল খুবই নিম্নে। লেখাপড়া শেখার গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রাসসুন্দরীর লোকভয় ছিল প্রবল । রাসসুন্দরীর সবচেয়ে বড় বাধা ছিলো তিনি মহিলা । রাসসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনীতে বহু জায়গাতেই ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, মহিলাদের পরাধীনতা আর লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে কোন অধিকার না থাকার কথা। রাসসুন্দরীর কথায় "তখনকার মেয়ে ছেলেগুলা নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণণা করিতে হইবেক । বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারী বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া বৃদ্ধাঠাকুরাণীরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন ।...........।"[৪১]

রাসসুন্দরীর কথায় — "বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল।"[৪২] তখনকার দিনে বালিকাবধূকেশ্বশুরবাড়ীতে নানা নির্যাতন সহ্য করতে হত ।তবে সৌভাগ্যক্রমে রাসসুন্দরীকেতাও সহ্য করতে হয়নি।শাশুড়ী তাকে সত্যি সত্যি মায়ের মত অশেষ

স্নেহ করতেন। শ্বশুর, জা, ননদ ও স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকেও তাকে কোন নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি।

বিয়ের পর তাঁর ভাষায় তিনি 'পরাধীন' হন। সুতরাং লেখাপড়া করার তাঁর আর কোন সুযোগ থাকল না। রাসসুন্দরীদের বাড়ীতে এক মিশনারি মহিলার একটি পাঠশালা ছিল। সেখানে ছেলেরা পড়তে যেত । মেয়ে বলে লেখাপড়া শেখায় তার কোন অধিকার ছিল না। ১৮১৭ সালে আট বছর বয়সে একদিন খেলার সঙ্গিনীর হাতে লাঞ্ছিতা হবার পর তার অভিভাবকরা তাকে মেমসাহেবের স্কুলের সামনে বসিয়ে রেখে আসেন, মহিলা বলে মেমসাহেবের স্কুলে পড়াশুনা শেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু শুনে শুনে তিনি অনেককিছু আয়ত্ব করেছিলেন। দুবছর বাদে অন্যান্য ঘরবাড়ীর সঙ্গে স্কুল বাড়ীও আগুনে পুড়ে যাবার পর সে সুযোগও আর থাকল না। "পরাধীনতা" ছাড়া স্বামীর বাড়ীতে সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত ঘরের কাজ নিয়ে তাঁকেব্যস্ত থাকতে হত। সেই ব্যস্ততার মধ্যে লেখাপড়ার কথা মনেও পড়ত না। বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। মহিলা বলে সে সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন । সেই লেখাপড়ার প্রতি পুরানো আকর্ষণই আবার মনে জেগে উঠল। তিঁনি রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি চৈতন্যভাগবত পাঠ করছেন। "স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার পর শরীর মন এককালে আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইল। আমি জাগিয়াও চোখ বুজিয়া বারবার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম, আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম। চৈতন্যভাগবত পুস্তক আমি কখনও দেখি নাই এবং আমি ইহা চিনিও না, তথাপি স্বপ্নাবেশে সেই পুস্তক আমি পাঠ করিলাম।"[৪৩]

রাসসুন্দরী চৈতন্যভাগবত পড়ার স্বপ্ন দেখার আগেই তাঁর শাশুড়ী মারা গিয়েছিলেন। ফলে সংসারের গৃহিণী হিসাবে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা তিঁনি পেয়েছিলেন। একদিন দৈবক্রমে রাসসুন্দরীর ভাষায় 'দয়ামাধবের অপরূপ দয়ার প্রভাবে' তিনি চৈতন্য ভাগবতই পেয়ে গেলেন। রাসসুন্দরী লেখাপড়া শেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বোবা কান্নায় গুমরে উঠতেন রাসসুন্দরী, "হে পরমেশ্বর তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও।"[৪৪] শেষপর্যন্ত তাঁকে হতাশ হতে হয়নি । তাঁর নিজের চেষ্টা ফলবতী হয়েছিলো ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিশে। গ্রাম বাংলার এককোণে বসে রাসসুন্দরী যখন পুঁথি পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, তখন শহর কলকাতায়

মেয়েদের জন্য স্কুল খোলার তোড়জোড় চলছে। উদ্যোক্তা মিশনারি সাহেবরা। মেয়েদের মধ্যেও তখন এসেছে সচেতনতা। এই ভাবেই দ্বিতীয় দফাতে তাঁর পড়ার সূচনা। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। অর্থাৎ সেটা ছিল ১৮৩৬ সাল।

রাসসুন্দরী স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন। সঙ্গীত এবং যাত্রা রচনাকারী নীলরতন রায় ছিলেন তাঁর ভাই। তিনিও সেকালে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। স্বামীর বাড়ীতে যাবার কয়েকবৎসর পরে হঠাৎ রাসসুন্দরীর খেয়াল হয়েছিল মাটির পুতুল, কড়ি এবং পাটের শিকা ইত্যাদি তৈরী করার, তখন সংসারের কাজকর্ম তেমন তাঁকে করতে হত না। কিন্তু একবার তাঁর তৈরী একটি মাটির সাপ এতই জীবন্ত হয়েছিল যে বাড়ীর সকলে সত্যিকারের সাপ ভেবে এতই উত্তেজিত হয়েছিল যে, তিনি পরে আর কোন দিন পুতুল তৈরী করেন নি। সেই একবারই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। পরে আবার জনসমক্ষে এসে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর আত্মজীবনীর মাধ্যমে। তাঁর স্বামী জীবিত থাকলে তিনি হয়ত আত্মজীবনী লিখতেন না বা লিখলেও কোন কালে প্রকাশ করতেন না। একবার আত্মজীবনী প্রকাশের পর তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাঁর সংকোচ কমে গিয়েছিল। তাছাড়া শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে পুত্র-পরিজন পরিবেষ্টিত সংসারের কর্ত্তৃত্ব লাভের ফলে একটা আত্মপ্রত্যয়ও জন্মেছিল। দ্বিতীয়বার আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন সম্ভবতঃ পঁচাশি বছর বয়সে। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন ৮৮ বছর বয়সে এবং তখনই ১৮৯৮ সালে তাঁর অন্যতম পৌত্র সরসীলাল আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর তিন বৎসর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রাসসুন্দরী উনবিংশ শতকের সমাজের যে চিত্র তাঁর রচনায় রেখে গেছেন, তা থেকে সেই সময়কার গোটা চিত্র পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী সংকুচিতা এক মহিলা। তাঁর রচনায় বৃহত্তর সমাজের চিত্র পাওয়া যায় না। তবে একজন অতি সাধারণ মহিলা হয়ে, চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থেকে কেমন করে ভাবতেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনীতে। তাঁর রচনায় নিজের পরিবারের বাইরে কোন কিছুর দিকে তাঁর নজর ছিল না।

রাসসুন্দরী রচনায় নিজের মা, ভাইবোন, স্বামী এবং সন্তানদের কথা তিনি সামান্যই বলেছেন। মনে হয় সংসারের কর্তব্যপরায়ণ সদস্য হলেও তাঁর মধ্যে আশ্চর্য রকমের নিরাসক্তি ছিল। সেকালের সমাজে মহিলাদের স্থান, সংসারে তাদের

ভূমিকা, বিয়ে এবং স্বামী সম্পর্কে মনোভাব এবং পারিবারিক ইতিহাস যথেষ্ট পরিমাণে জানা যায় রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীতে। তিনি সৌভাগ্যের অধিকারিণী ছিলেন। সেজন্য পিতা বা স্বামীর পরিবারে মহিলাদের উপর পুরুষের নির্যাতনের শিকার হতে কাউকে দেখেননি । স্বামীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, তিনি বেশ লোক ছিলেন। স্বামীকে তিনি দেখতেন ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। স্বামী হলেন 'কর্তা'। "তাঁহাকে দেখিলে যেন কর্তা কর্তা বোধ হইত।" স্থূলদেহের এবং উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী কর্তা "অতিউত্তম" "বিশেষ বড়লোক এবং দয়ালু" ছিলেন।[৪৫] তবে তাঁর স্বামী মামলাবাজ ছিলেন । বিশ পঁচিশটা মামলা তাঁর লেগেই থাকত। অন্য জমিদার, কুঠিয়াল এবং প্রতাপশালী লোকের সঙ্গে তাঁর 'কাজিয়া' ছিল। মামলাতে তিনি পরাজিত হতেন না। জয়ী হতেন সবার বিরুদ্ধে।

সেকালে সংসারে কর্তৃত্ব পুরুষের উপরেই থাকত। সেটা দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে কখন পাঠান হবে, সে সিদ্ধান্ত তাঁর মায়ের নয়, নির্ভর করত তাঁর খুড়োর উপরে। স্বামীর বাড়ীতে সব সিদ্ধান্তের মালিক যে তাঁর স্বামীই ছিলেন সেটা বোঝা যায়। কারণ রাসসুন্দরীর মা যখন মারা যান তখন তিনি তাকে দেখতে যেতে পারেন নি । কারণ যাবার জন্য স্বামীর অনুমতি মেলে নি। অন্যত্র কিছু না বললেও, গোটা বই থেকে বোঝা যায়, তাঁর স্বামী বেশ স্নেহপ্রবণ ভালমানুষ ছিলেন এবং স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা হবে সন্তান পালন, ঘরের কাজ আর রাত্রে স্বামীকে সঙ্গদান। রাত্রে কথাটা এইজন্য যে, দিনের বেলা দেশাচার অনুযায়ী স্বামীর সঙ্গে রাসসুন্দরীর কখনও দেখাও হতো না। চৈতন্যভাগবত পুঁথিটি যত্নের সঙ্গে রেখে দেবার নির্দেশ তিনি সরাসরি স্ত্রীকে দেননি, পরোক্ষভাবে সন্তানের মাধ্যমেই দিয়েছেন। স্বামীকে তিনি প্রেমিক হিসাবে বিবেচনা করেন নি। স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার কোন ঘটনা দূরে থাকুক, তার কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত কোথাও নেই। জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাসসুন্দরী তাঁর রচনায় উল্লেখ করেননি।

স্বাধীনতা যে কি বস্তু গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে সে ধারণার কোন সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এসে বাঙ্গালী মহিলারা স্বাধীনতা বলতে একটা কিছু বুঝতেন—লেখাপড়ার অধিকার, সীমিত অবরোধ, বিয়ের ব্যাপারে খানিকটা নিজেদের মতামত দেবার অধিকার, সংসার পরিচালনায় বর্ধিত অধিকার ইত্যাদি হয়তো এসবের মধ্যে ছিল।

সেকালের মেয়েদের বিয়ে হত যেন পুতুল খেলার মত। যার বিয়ে এবং যার সঙ্গে বিয়ে উভয়ের কোন পছন্দ অপছন্দ ও মতামতের বালাই ছিল না। আর বিয়ে হত এত কম বয়সে যে ঐ বয়সে মতামত দেবার কোন অর্থও হত না। পরবর্তীকালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার দায়ভাগ পোহাতে হত মহিলাদেরই। যেসব মহিলা তখন নারীমুক্তির কথা ভাবতেন, তারা মহিলাদের এই অসহায়তার কথা মেনে নিতে পারেননি। তারা অনুভব করলেন যে, বিবাহের একটা সংস্কার হওয়া দরকার। শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর আত্মীয়দের সহিত অনেকসময় বালিকাবধূর সম্পর্ক ভাল হতো না। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, জা-দের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায়ই হত তিক্ত। এইসব সমস্যা নিয়ে তখন অনেকেই লিখছিলেন। আমরা যাদের নিয়ে এই বইতে আলোচনা করছি, তাদের মধ্যে ঐ সময় রাসসুন্দরী দেবী আর কৈলাসবাসিনী দেবী এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। অন্যরাও কমবেশী এ সমস্যার উল্লেখ করেছেন।

কার্ল মার্কস্-এর কল্যাণে তখন সমাজে একটা পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। উনিশশতকের বাঙ্গালী সমাজে মহিলাদের মধ্যেও সে পরিবর্তন এসেছিল, তার সঙ্গে ঐ সময়কার সমাজ পরিবর্তনের একটা যোগ ছিল। কৈলাসবাসিনী দেবী যে যুগে জন্মেছেন এবং যে পরিবেশে বড় হয়েছেন এবং বিয়ে হয়েছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত অনেক না হলেও কিছু কিছু ঐ সময়ে ছিল। কেশব সেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীও তাদের স্ত্রীদের ভালো শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং দুর্গাচরণের চেয়ে কম প্রগতিশীল ছিলেন না, কিন্তু কৈলাসবাসিনী দেবী সেযুগে অনেকজন তৈরী হননি। আর রাসসুন্দরীর ব্যাপার ছিলো আরো অবিশ্বাস্য। যে পরিবারে জন্ম এবং বধূ হয়ে এসেছিলেন, তার পক্ষে আত্মজীবনী লেখা ছিল অসাধারণ ব্যাপার। তার চেয়ে আরো উদার হাওয়ায় যারা মানুষ হয়েছিলেন, তারা কিন্তু আত্মজীবনী লেখার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। দীনেশচন্দ্র সেন রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' বইটি সম্পর্কে লিখেছেন, "এইটি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নকশা।"[৪৬]

উনিশশতকে কিংবা তার আগে বা কিছু পরে গোটা ভারতবর্ষের মেয়েদের লেখাপড়া না শেখানোই ছিল জনপ্রিয় রীতি। এই রীতি সত্ত্বেও যে মহিলাদের দু-একজন শিক্ষিত হয়েছিলেন তাদের ব্যতিক্রম বলা যায়। মহিলাদের এই সার্বজনিক নিরক্ষরতার মধ্যে দু-একজন মহিলা এক এক সময়ে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে

গেছেন। ব্রিটিশযুগে মহিলারা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন পুরুষদের অনেক পরে। ছাপার হরফে যাঁর প্রবন্ধ পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয় তার নাম কৈলাসবাসিনী দেবী। কৈলাসবাসিনীর বছর দু-এক আগে পাবনার বামাসুন্দরী দেবীর একটি আড়াই হাজার শব্দের প্রবন্ধ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধটিকে বই বলে স্বীকার করলে কৈলাসবাসিনী প্রথম গ্রন্থকার বা গ্রন্থকর্ত্রীর মর্যাদা পাবেন না। কিন্তু সরকারীভাবে একটা গোটা বই প্রকাশের কৃতিত্ব কৈলাসবাসিনীরই প্রাপ্য। কৈলাসবাসিনীর জন্ম ১৮৩৭ সালে। ১৮৪৯ সালে বারো বছর বয়সে তাঁর যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়া করা বারণ, লেখাপড়া করলে বৈধব্য দেখা দেবে অথবা সংসারে অকল্যাণ হবে মনে করা হত, সেই সময়ে কিভাবে একজন মহিলা লেখাপড়া শিখে মুদ্রিত আকারে বই প্রকাশ করেন, সেটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ব্যাপার। কৈলাসবাসিনীর স্বামীর নাম দুর্গাচরণ গুপ্ত। তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করেন। দুর্গাচরণের কলকাতায় একটি ছাপাখানা ছিল। সেখান থেকে বহু বই প্রকাশিত হত। তখন যেসব তরুণেরা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং হিন্দুকলেজে লেখাপড়া শিখতেন, তাদের প্রায় সকলেই স্ত্রীশিক্ষা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে এক নূতন আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। দুর্গাচরণ গুপ্ত বাহিরের কর্ম শেষে, গোপনে রাতে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়েরা যাতে টের না পায় এমনিভাবে কিশোরী বধূ কৈলাসবাসিনীকে শিক্ষা দিতে থাকেন। স্বামীর উৎসাহ ও যত্নে ১৮৪৯ সালে যে বালিকা একটি অক্ষর পর্যন্ত চিনতেন না তিনি এর ১৩/১৪ বছর পরে একটি বই প্রকাশ করেন। এতে কৈলাসবাসিনীর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মন ছিল গ্রহণশীল এবং আগ্রহও ছিল অদম্য। তাঁর লেখাপড়া যে স্বামীর উৎসাহ এবং সহানুভূতির ফলেই সম্ভব হয়েছিল, কৈলাসবাসিনী সেটা কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার সঙ্গে মনে করতেন। তাঁর শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য ছাড়াও, তাঁর গদ্যের স্বচ্ছন্দগতি বিদ্যাসাগরের রচনাশৈলীকে মনে করিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের তথাকথিত এই গদ্যশৈলী অবশ্য 'হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা' প্রকাশের খুব বেশী আগে তৈরী হয়নি।

কৈলাসবাসিনীর প্রথম গ্রন্থের নাম 'হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা' । প্রকাশক দুর্গাচরণ গুপ্ত। ৭২ পৃষ্ঠার এই বইতে লেখিকা সে সময়ে হিন্দু সমাজে যে সব কুসংস্কার ছিল এবং সে সবের দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন মেয়েরা তাই নিয়ে আলোচনা করেন। রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে

শুরু করে তখনকার ছোট বড় সব সমাজ সংস্কারকেরা সমাজে মহিলাদের হীনাবস্থার কথা বলেছিলেন। তাই নিয়েই লেখিকা আলোচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের কৌলীন্যপ্রথা এবং তার সঙ্গে যুক্ত বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষার অভাব এবং পারিবারিক আরো বহু ছোটখাটো অনেক সমস্যাই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। এই প্রথম একজন মহিলা হিন্দুসমাজের কু-সংস্কার সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন ।

'হিন্দুমহিলার হীনাবস্থায়' প্রথমেই কৈলাসবাসিনী কৌলিন্য প্রথা নিয়ে আলোচনা করেন। কুলীন কন্যাদের বিবাহ না হওয়া এবং অসম বিবাহের সমস্যা, ভঙ্গ কুলীনদের বহুবিবাহ, বংশজদের জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং কন্যাবিক্রয়, শ্রোত্রিয়দের কন্যাপণ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাল্যবিবাহ সহ বিভিন্ন সমালোচনা তার লেখায় স্থান পায় । লেখিকা অন্যান্য সমস্যার তুলনায় কৌলীন্য প্রথা সম্পর্কিত সমস্যা নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যে বছর তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ পায় সেই একই বছর ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহিত তরুণ উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতে ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন মহিলা সদস্য মহিলাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছোট খাটো মন্তব্য করতে থাকেন । কিন্তু ব্যাপ্তি অথবা গভীরতা কোন দিক দিয়েই কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না।

কৌলীন্য প্রথার পরে বাল্যবিবাহ এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমস্যা নিয়েও তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাঁর মতে বাল্যবিবাহই নারী তথা বৃহত্তর সমাজের হীনাবস্থার প্রধান কারণ। কৌলীন্য প্রথা সমাজের ছোট একটি সমস্যা হলেও বাল্যবিবাহের ফলে গোটা সমাজই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বাল্যবিবাহের কু-ফল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে দুটি বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি হল, কমবয়সে বিয়ে হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বোঝাপড়ার অভাব। আর দ্বিতীয়টি হল, অন্য মেয়ের প্রতি স্বামীর আসক্তি। সে যুগের কলকাতার বাবুরা সঙ্গ নিতেন বাগান বাড়ীতে রাখা রক্ষিতার কাছ থেকে, আর সন্তান জন্মদেবার জন্য যেতেন স্ত্রীদের কাছে। সেই যুগে কৈলাসবাসিনীর মত একজন সমাজ সচেতন মহিলার দৃষ্টিতে এটা এড়ায় নি। যদিও সৌভাগ্যক্রমে তিনি সহানুভূতিশীল এবং অনুরাগী স্বামী পেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁর প্রতি অতিদরদী ছিলেন বলেই হয়ত অন্যদের পারিবারিক সম্পর্কে ফাঁকি তাঁর বেশী করে চোখে পড়েছিল ।

কৈলাসবাসিনী তাঁর গ্রন্থে পতি এবং পত্নী উভয়ের পছন্দ অনুসারে বিয়ে হওয়া উচিত বলে মতামত দিয়েছিলেন। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে না হলে যেসব কুফল দেখা দিতে পারে তার মধ্যে একটি হল পুরুষের মধ্যে বেশ্যাসক্তি, আর সংসারে নানা রকমের অশান্তি। তিনি আরো যুক্তি দেখান যে, প্রথম যৌবনে উপনীত স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হলে, সে সন্তান স্বল্পায়ু এবং রুগ্ন হয় । তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে পারে। বাল্যে বিবাহ করলে বড় সংসারের ভার যেহেতু অল্প বয়স্ক স্বামীর উপর অর্পিত হয়, সে কারণে এধরণের সংসার স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যগ্রস্থ হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন যে মৃত্যুর হার শিশুদের মধ্যেই বেশী বলে বাল্যবিবাহের ফলে বাল্যবৈধব্য বৃদ্ধি পায়। সেকালে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে বধূদের সম্পর্ক প্রায়ই খারাপ হতো এবং এটাও বাল্যবিবাহের অন্যতম কুফল। উপসংহারে তিনি বলেন, বাল্যবৈধব্য এবং বাল্যবিবাহের সমস্যা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ না করলে দূর করা সম্ভব হবে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতটা সুখের হবে তা নির্ভর করে স্ত্রীর মানসিক বিকাশের উপর। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের বিশেষভাবে অসুখী করেছিল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগের দুস্তর ব্যবধান। ১৮৬০ সালে বিবিধার্থ সংগ্রহে "কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট এবং মনের অসুখ" নামে একটি প্রবন্ধে এই অসুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা'য়ও পরের দশকে লেখা হয়েছিল ছেলেদের শিক্ষা দিও না, তাহলে মেয়েদের শিক্ষা দেবারও দরকার হবে না।

কৈলাসবাসিনীর 'বিশ্বশোভা গ্রন্থে'র সমালোচনা উপলক্ষে 'অবোধ বন্ধু পত্রিকা' পুরুষ ও মহিলাদের মননশীলতার তারতম্য না করার জন্য যুক্তি দেখিয়েছেন - "আজিকালি ইউরোপ ও আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির সমকক্ষতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক। আমরা মনে করি যে, অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম, অনিত্য, আগন্তুক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক।"

সংসারে নারীর ভূমিকা কি—এ সম্বন্ধে নব্য মহিলারা তাদের মতামত কিছু লিখে রেখে যাননি। তবে তাঁরা আগের তুলনায় নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অনেক সচেতন হয়েছেন, তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের রচনা থেকে বোঝা

যায়। লক্ষ্মীমণি সবার আগে সরাসরি স্ত্রী স্বাধীনতার স্বপক্ষে একটি রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত এই লেখাটির নাম 'পরাধীনতা কি কষ্ট', এতে তিনি লেখেন - পরাধীন স্ত্রীর দুঃখ ও যাতনা অপরিসীম। তাকে জীবন যাপন করতে হয় পশুর মত । স্বামী তথা পুরুষদের তোষামোদ করে বেঁচে থাকা যথার্থই কষ্টকর। মেয়েদের হীনদশার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, দেশাচারই এর জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী । লক্ষ্মীমণির এই লেখা থেকে বোঝা যায় যে—অবরুদ্ধ ও স্বামীর মুখাপেক্ষি স্ত্রীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

কৈলাসবাসিনী বারো বছর বয়সে বাপের বাড়ী ছেড়ে স্বামীর বাড়ীতে এসেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কতটা মর্মান্তিক হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু বারো বছর বয়সে রাসসুন্দরী দেবীর যে করুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি তার বর্ণনা করেছেন। রাসসুন্দরী বিয়েকে বারে বারে অধীনতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। "বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্নদেশে গিয়া বাস ও যাবজ্জীবন তাহাদের অধীনতা স্বীকার, আপনার মাতাপিতা কেহ নহেন—এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়![৪৭] ঈশ্বরাধীন কর্ম হিসাবেই এটাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন ।

প্রথমবার তিনি শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে তিনমাস ছিলেন। সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"ঐ তিনমাস মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় দিবারাত্র কান্নাতেই কাল যাপন করিয়াছিলাম।"[৪৮] তারপর মায়ের কাছে যেদিন তিনি ফিরে এসেছিলেন, সে দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "সেইদিন যে কি আনন্দের দিন, সে আনন্দ বর্ণনাতীত।"[৪৯]

খ. মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ভারতী' পত্রিকার পূর্বপর্যন্ত)।

পাশ্চাত্যশিক্ষা, পাশ্চাত্যসংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তারমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ছিল অন্যতম । ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকেই নারী শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে । 'ভারতবর্ষীয়

স্ত্রী-গণের বিদ্যাশিক্ষা' (The zenana opened or A Brahmin advocating female emancipation) নামক গ্রন্থে লেখক তারাশঙ্কর তর্করত্নের একটি মন্তব্য : "হায় কতকালের পর এদেশ পন্ডিতময় হইবে, স্ত্রীলোকেরা গ্রন্থকর্তা হইবে, পুরুষদিগের চিন্তা হ্রাস পাইবে ও আমাদিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।"[৫০]এসময় বহু অভিভাবকের আগ্রহ ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষা সীমিতভাবে হলেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতা ও মফঃস্বলে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বঙ্গের তখনকার শিক্ষাধিকারিকের বিবরণী থেকে জানা যায়১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫টি এবং তাতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,১৮৩ জন। সুতরাং তর্করত্ন মহাশয় নারীশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের সূত্রপাত দেখে আশান্বিত হয়েই অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কালে তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছিল, সে কথা বলা যায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববছর কৃষ্ণকামিনী দাসী কর্তৃক লিখিত 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একটি নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। মেয়েরা দীর্ঘদিনের অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে থাকেন। তারপর আমরা পাবনার বামাসুন্দরী দেবীর 'কি কি কু-সংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?' (১৮৬১), কালীঘাটের হরকুমারী দেবীর 'বিদ্যা দারিদ্র্যদলনী' কাব্য (১৮৬১), কৈলাসবাসিনীর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩), 'হিন্দু অবলা-কুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫), রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখি। একে একে মহিলারা নিজেদের পুষ্পডালায় বিভিন্ন রং বেরং এর পুষ্প নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। শুধু তাই নয়, এতকাল পুরুষেরা মহিলাদের অভাব-অভিযোগ, শিক্ষা ও নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এখন অজ্ঞানতার আবরণ সরিয়ে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের অভাব-অভিযোগের পসরা নিয়ে জনতার দরবারে সমুপস্থিত হন।

শুধু কেবলমাত্র গ্রন্থ রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র সম্পাদনেও মহিলারা অগ্রবর্ত্তিনী হন। মহিলাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের জন্য, তাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রী-পাঠ্য বিষয় সম্বলিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে।১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার মেয়েদের

জন্য 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ-গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকা (১৮৬৯) সহ আরো অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মহিলারা এইসব পত্র-পত্রিকার হাত ধরেই সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন। এখন তাঁরা আগের তুলনায় আরো অধিক সচেতন হয়ে উঠেন এবং নিজেরাই পত্রিকা সম্পাদনার সিদ্ধান্ত নেন।

'বঙ্গমহিলা' ঃ মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক-পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা'। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) খিদিরপুর নিবাসিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মহিলাগণ অবসরকালে যাতে গল্প গুজব করে সময় নষ্ট না করে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, জীবনচরিত ও উপন্যাস প্রকাশ এবং শিক্ষিত মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের রচনা প্রকাশের সিদ্ধান্ত উক্ত পত্রিকা গ্রহণ করে। 'বঙ্গমহিলা'র প্রথমখন্ডে প্রকাশিত রচনাগুলি—'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা', 'মনুষ্যজীবন', 'স্ত্রী-শিক্ষা', 'মহারাষ্ট্রীয় জাতি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত স্বাধীনতা' নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করছি ঃ "প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, একথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বোঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা বলে মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতকগুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই । ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোক মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতো পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন

পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহসে কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীর বেশে দেশ বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহারা কি স্ত্রী? না বীর? নারীজাতির এই সকল কার্য্য কি ভদ্রোচিত? না সভ্যোচিত? অথবা তা স্বাধীনতার ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান রমণীগণই তাহার প্রমাণ স্থান। তাঁহারা ইউরোপীয় কামিনীদের ন্যায় স্বাধীনতালাভে লোলুপ হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্যন্তও সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা ও সলজ্জভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহারা উক্তরূপ স্বাধীনতা লাভার্থে স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন। ..... "ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নেই । তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বজনের বাটীতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না ? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?....

"বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার আকার প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গাঙ্গনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিবর্ত্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথায়ও নেই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেকস্থলে ভারতীয় নারীজাতিকে স্ত্রী রত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।) তখনই দেখিব যে বঙ্গস্ত্রী রত্নবিশেষ হইয়াছেন।"[৫২]

এক বৎসর বাদে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তবে মহিলা-সম্পাদিত

প্রথম সংবাদপত্রের গৌরব ও স্বীকৃতি এই পত্রিকার অবশ্য প্রাপ্য।

'অনাথিনী' : প্রকৃতপক্ষে মহিলাসম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা থাকমণি দেবী। ইনি সম্ভবতঃ 'সহোদর' সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অল্প বয়সের বালিকা কন্যা । পত্রিকাখানি আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদযন্ত্রে মুদ্রিত। স্ত্রী-শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট পত্রিকাখানি আদরণীয় হয়েছিল। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা সাব্-রেজিষ্টার অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থল ছিল ধুলিয়ান। যেখান থেকেই 'অনাথিনী' পত্রিকাখানি জুলাই ১৮৭৫ প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিনোদিনী' : 'অনাথিনী' প্রকাশের তিনমাস পূর্বে 'ভুবনমোহিনী দেবী' এই নামের আড়ালে কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বিনোদিনী' নামে একখানি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। অনেকে এ-পত্রিকাখানিকে মহিলা পরিচালিত পত্রিকা বলে ভুল করতেন। সে কারণে এই পত্রিকাখানিকে প্রথম মহিলা-পরিচালিত মাসিক বলা যাবে না।

'হিন্দুললনা' : মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ (ইংরাজীর ১৮৭৮ এর ফেব্রুয়ারী) মাসে বারাকপুরের নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় । এই উপলক্ষে পত্রিকার সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখেছিলেন—"বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় 'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দু মহিলা কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহারে সম্যকরূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করিনা । বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯/১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর......।"[৫২]

'পরিচারিকা' : নামে পত্রিকাখানি ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজীর ৮ই মে, ১৮৭৮) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। এখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। কেশবচন্দ্রের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রথমে এর সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে আর্যনারী সমাজের উপর এই পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত

হয়। এই সমাজের তরফ থেকে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী ১২৯৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে পত্রিকাখানির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মোহিনী দেবী যেমন বিদুষী তেমনি সুলেখিকা ছিলেন। মোহিনী দেবীর অকালমৃত্যু হলে (৬ই মে; ১৮৯৪) ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী কিছুদিন 'পরিচারিকা' পরিচালনা করেছিলেন। বিভিন্ন কারণে 'পরিচারিকা'র সম্পাদিকার পদ থেকে অবসরগ্রহণ করলে তাঁর ৪র্থ সহোদরা শ্রীমতী মণিকা দেবী শেষ এক কি দুই বৎসর এর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এভাবে ২৮ বৎসর চলবার পর 'পরিচারিকা'র প্রচার রহিত হয়।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সচিত্র আকারে নবপর্য্যায় 'পরিচারিকা' প্রকাশ করেন। এর প্রথম সংখ্যায় 'পূর্বকথা'র উল্লেখ আছে ঃ "নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'পরিচারিকা'র প্রথম প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।......কিছুকাল পরে ইহা আর্য্যনারী সমাজের মুখ্য পত্রিকারূপে বাহির হয়। তখন ইহার সম্পাদনের ভার ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন । কর্ম্মের বোঝা নামাইয়া সংসারের নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাঁহার অতি সাধের 'পরিচারিকা'ও তখন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কিছুকাল ভাসিয়া বেড়াইয়া কালসাগরে ডুবিয়া গেল।....প্রথমবারের পালা শেষ হইবার পরে আর্য্যনারী সমাজের চেষ্টায় পরিচারিকার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্য্যনারী সমাজের তরফ হইতে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি দক্ষতায় সহিত পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর নানাকারণে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তদীয়া চতুর্থ সহোদরা শ্রীমতী মণিকা দেবী গ্রহণ করেন। অষ্টবিংশতিবর্ষ জীবনধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।" [৫৩]

'পরিচারিকা'র (নবপর্য্যায়) কুচবিহারের রাণী ভিক্টর নারায়ণের স্ত্রী নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে এর প্রথম

সংখ্যা প্রকাশ পায়। পত্রিকার কণ্ঠে 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' এই পংক্তিটি শোভা পেত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখেছেন—"পরিচারিকা'র নবপর্য্যায় বাহির হইল।....সে অনেকদিনের কথা—বোধ হয় ৪০ বৎসরের কথা, যখন বাংলাদেশে 'পরিচারিকা'র প্রথম আবির্ভাব হয়। তখনকার সমাজ ও এখনকার সমাজে অনেক প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য জিনিষটা বোধ হয় সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্যের উপর খাড়া হইয়া থাকিতে চায়, সুতরাং তখনকার দিনে মুখ্যভাবে যাহা স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনকার দিনে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঠিক যদি সেই উদ্দেশ্যেই আবার আসিয়া থাকে, তবে তাহার ললাটে বোধ হয় লজ্জার ছাপ পড়িবে না।"[৫৪] রাণী নিরুপমার সম্পাদনায় নবপর্য্যায়ের 'পরিচারিকা' আট বৎসর চলেছিল। (১৩২৩-১৩৩১)

বাংলা সাহিত্যালোচনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা উল্লেখনীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টা ও উৎসাহে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে শ্রাবণ ১২৮৪ (ইং জুলাই ১৮৭৭) 'ভারতী' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় সাত বৎসর চলবার পর (১২৯০ পর্যন্ত), ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর 'ভারতী'র পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়, পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"'ভারতী'র উদ্দেশ্য যে কি, তা এর নামেই সপ্রকাশ। 'ভারতী'র এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যা স্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থলে বক্তব্য এই যে জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিব।"[৫৫] 'ভারতী'র সম্পাদকীয়মন্ডলীর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী ছিলেন। এঁদের রচনা

সম্ভারে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর 'ভারতী'র প্রচার একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম হলে এই দুঃসময়ের সময় স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদক ও সম্পাদিকাগণের নাম ও কার্যকাল এরূপ ঃ

১২৮৪ থেকে ১২৯০	- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৯১ — ১৩০১	- স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২ — ১৩০৪	- হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী
১৩০৫	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬ —১৩১৪	- সরলা দেবী
১৩১৫ — ১৩২১	- স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২ — ১৩৩০	- মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৩৩১—১৩৩৩ আশ্বিন	- সরলা দেবী।

চলতি হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে নূতন নূতন ভাবধারার প্রকাশক্ষেত্ররূপে 'ভারতী' গড়ে উঠেছিল। বঙ্গসাহিত্যকে 'ভারতী' মাতার স্নেহেই লালন পালন করে বর্দ্ধিত করেছিলেন। এইজন্য বাংলাসাহিত্য তথা বাঙ্গালীজাতি চিরকাল 'ভারতী'র কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

গ. সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর ভূমিকা ঃ

বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ছিল সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান। একই পরিবারে এতগুলি কীর্তিমান মানুষের আবির্ভাব যা সচরাচর চোখে পড়ে না। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে ঠাকুর পরিবার এক অনন্যপ্রতিভার দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ ভূমিকার পাশে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের উজ্জ্বলতা কতখানি তা চোখে না পড়লেও প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। অন্য পরিবারে হলে তাঁদের প্রত্যেকের কৃতিত্বই চোখে পড়ত। একটি পরিবারে এতগুলি উজ্জ্বল রত্নের আর্বিভাব ভারতের আর কোথাও সম্ভবতঃ খুঁজে পাওয়া যাবে না। গোটা একটি শতক ধরে ঠাকুর পরিবার বাংলার সমাজজীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গজননীর যোগ্য সন্তানরূপে নিজেদের স্থায়ী আসন

প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দ্বারকানাথ থেকে যদি ধরা যায়—উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে তিনি ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে লক্ষ্মীর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কি ইংরেজ, কি ভারতীয় তাঁর গুণাবলীর জন্য সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। একই শতকের মধ্যভাগে তাঁর সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দেশব্যাপী ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর সাধনা ও ঋষিসুলভ আচরণ দ্বারা জাতির শ্রদ্ধা যেমন অর্জন করেছিলেন, তেমনি ধর্ম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের একটা জাতীয়রূপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এই সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বদ্ধিত হয়ে মহর্ষির পুত্র-কন্যাগণ সকলেই হয়ে উঠেছিলেন এক একটি রত্নবিশেষ। কি সাহিত্যচর্চ্চা, কি সঙ্গীত, কি নাটক, কি তত্ত্ববিদ্যা, কি অঙ্কন, কি জাতীয় চেতনা সর্বস্তরেই তাঁদের এক একজনের প্রতিভা এক একদিকে বিকাশলাভ করেছিল।

তবে ঠাকুরবাড়ীতে যে মেয়েদের জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছিল তার মূলে ছিলেন মহর্ষির মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তাঁর দুঃসাহসিক আচরণের মধ্য দিয়ে এসব সম্ভব হয়েছিল। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রধান আকর্ষণ ছিল দর্শন ও কাব্য। মহর্ষির মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ গভীর বিদ্যানুরাগী হলেও তাঁর স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি ছিল বিশেষ উৎসাহ।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে খুব অল্প সংখক মহিলা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যারা প্রকৃত পক্ষে আধুনিকা হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন তাদের পথিকৃৎ। যশোহরের একটি অজ পাড়াগাঁয়ে ১২৫৭ সালের ১২ই শ্রাবণ (ইংরাজীর ১৮৫০) জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। পিতার নাম অভয়াচরণ। মাত্র আট বৎসর বয়সে মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ আবাল্য নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মহর্ষির সন্তানদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন নূতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী ভিন্ন প্রজন্মের মানুষ। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাধারা যেমন ছিল স্বতন্ত্র ও উদার, তেমনি তাঁদের কার্যকলাপে মানবিক মূল্যবোধও প্রাধান্য পেয়েছিল। এর ফলে ঠাকুরবাড়ীর নূতন বউদের, বিশেষ করে এই দুজনের স্ত্রীদের জীবনযাত্রায়, আচার আচরণে তাদের স্বামীদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। ঠাকুরবাড়ীর অন্দর মহলকে এই নূতন প্রভাব এত দ্রুত প্রভাবিত করেছিল যে দুদশকের মধ্যেই সে বাড়ীর মহিলারা বঙ্গদেশের মহিলাদের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তবে

এসব পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং অংশত কাদম্বরী দেবী।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে অনেক মহিলাই শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রথম আধুনিকার স্বীকৃতি ও গৌরব জ্ঞানদানন্দিনীরই প্রাপ্য।

তদানীন্তন সমাজে নারীদের যে শোচনীয় পরাধীন অবস্থা ছিল বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন । ১৮৬২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে পড়তে যাবার আগেই মনে হয় জ্ঞানদানন্দিনী চিঠিপত্র লিখতে শিখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে দেখেছিলেন সেখানকার নারী প্রগতির স্বরূপ। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিলো, নিজের স্ত্রীকেও গড়ে তুলবেন মনের মত করে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অন্দর মহলে তখন অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ বাড়ীর সকল মেয়েদের শিক্ষাদেবার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন। বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে প্রথমদিকে সৌদামিনী দেবীকে অল্পদিনের জন্য হলেও সে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হলেও তখনও ঠাকুর বাড়ীতে আবরু ও পর্দার কড়াকড়ি বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। অনাত্মীয় পুরুষেরা তখনও ঠাকুরবাড়ীর অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারতেন না। মেয়েরাও যখন তখন উঠতে পারতেন না তিনতলার খোলাছাদে। সৌদামিনী ও স্বর্ণকুমারীর রচনা থেকে জানা যায় যে বৈষ্ণবী ও ইংরাজ মহিলারা ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিয়মিত আসতেন । তবে জ্ঞানদার কথা থেকে জনা যায় যে তিনি দেবর হেমেন্দ্রনাথের কাছেও লেখাপড়া শিখেছিলেন। জ্ঞানদা তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন— হেমেন্দ্রনাথের ধর্মকে তিনি এবং তাঁর সহপাঠিনীরা থেকে থেকে কিভাবে চমকে উঠতেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর কাছেও তাঁর জা এবং ননদদের সঙ্গে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। তবে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে জ্ঞানদাকে তাঁর দেবর হেমেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে অনেক অধ্যয়ন করে যথার্থভাবে শিক্ষিত এবং বিদগ্ধ হয়ে ওঠার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর উদারনৈতিক ও আধুনিক স্বামীর কাছ থেকে।

সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টা ও যত্নে অতি অল্প দিনের মধ্যেই জ্ঞানদা অবরোধ ভেঙে মুক্তি পেলেন। জ্ঞানদানন্দিনী ইংরাজ মহিলাদের কাছ থেকে এবং তাঁর স্বামীর

কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা না হলেও, সে যুগের তুলনায় খুব ভাল শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি নিজে ইংরাজী ও বাংলা বহু বই পড়তেন। তাছাড়া স্বামীর উৎসাহে তিনি স্বাধীনভাবে ভাবতে এবং স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে শেখেন।

ঠাকুরবাড়ীতে অবরোধ প্রথা তখনও পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। স্বর্ণকুমারীর ভাষায় তখনও মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এবাড়ী থেকে ও বাড়ী যেতে হলে ঘেরাটোপ মোড়া পাল্‌কির সঙ্গে প্রহরী ছুটতো, তখনও নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাবার অনুমতি পেলে বেহারারা পাল্‌কি-সুদ্ধ তাঁকে জলে ডুবিয়ে আনতেন। অনেকবাড়ীর মেয়েরা এটুকু স্বাধীনতাও পেতেন না। মোহিতকুমারীর শ্বশুর বাড়ীতে মেয়েরা কেউ গঙ্গাস্নানও করতে যেতে পারতেন না। এমনই ছিল নিয়মের কড়াকড়ি।

সেইযুগে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে কর্মস্থল বোম্বাই যাবার অনুমতি জোগাড় করা সহজ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে নারীমুক্তি বা নারীর অবরোধ মোচনের জন্য প্রবল ইচ্ছা ছিল। কেবল যে বিলাতযাবার ফলে পাশ্চাত্যের মহিলাদের দেখে তাঁর মনে নারীশিক্ষা বা নারীর অবরোধ মোচনের ইচ্ছা হয়েছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে সেটা মনে করতেন না। তখনকার সমাজে মহিলাগণ যে শোচনীয় পরাধীন অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতেন তাঁর সংবেদনশীল মনকে তা গভীরভাবে পীড়িত করত। সেকালে মেয়েরা অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী আসত, তাদের না ছিল কোন শিক্ষা, না ছিল স্বাধীনতা। অন্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্যা বন্দিনীর মত সারাজীবন কাটাতে হত। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে বিধবা অবস্থায় পুত্রের অধীনে আশ্রিত হয়ে বাস করতে হত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তো কোন প্রশ্নই ছিল না। বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ নারীজাতির এই খর্বজীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছিলেন। বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"আমি ছোটবেলা থেকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমেদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি? আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিলো তা আমার আদপে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।.... এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কু-প্রথা বলে মনে হত।"[৫৬] মুসলমানগণ ভারতে আসার আগে থেকেই এদেশে অবরোধ প্রথা ছিল, তার প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাবে স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মুসলমান কথাটা জুড়ে দিয়েছেন

বলে মনে হয়।

বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে জ্ঞানদার আলাপ করিয়ে দেবার জন্য তিনি অতি সংগোপনে সবার অজ্ঞাতে নিজের বাড়ীতে এনে মনোমোহন ও জ্ঞানদাকে একই মশারির তলায় ঢুকিয়ে দেন—এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে তিনি নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি নিয়ে অতি অল্প বয়স থেকেই চিন্তাভাবনা করতেন। সুতরাং বিলাত যাবার ফলেই যে তাঁর মধ্যে মহিলাদের অবরোধমোচন ও নারী স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল তা ঠিক নয়। তিনি বিলাত যাবার আগেই মহিলাদের অবরোধমোচন ও উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী করে তোলার মত শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী হতে আরম্ভ করেছিলেন।

নারীজাতির স্বাধীনতা স্থাপনকেই তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত বলে মনে করতেন। বিয়ের পর অনেক সময় পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর হয়ে মার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হননি। একবার জ্ঞানদার পিতামাতা কলকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করে কিছুদিন বাস করছিলেন। ঐ সময় কন্যা জ্ঞানদাকে নেবার জন্য পাল্কি পাঠালে সত্যেন্দ্রনাথের মাতা ঠাকুরবাড়ীর অভিজাত্য ক্ষুন্ন হবার ভয়ে পুত্রবধূকে মাতাপিতার কাছে পাঠাননি। মায়ের এই অনুজ্ঞার সংবাদ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছালে তিনি বুঝলেন - মায়ের এই আদেশের ফলে তাঁর পত্নী ও কুটুম্বদের মনঃকষ্ট হতে পারে। তি নি পিতার কাছে এই সংবাদ জানালে উদার হৃদয় পিতা এর গুরুত্ব অনুভব করে আপন পত্নী সারদাকে যা বলেছিলেন তা জ্ঞানদানন্দিনীর জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়—"এসে মাকে বললেন সত্যেন্দ্রের বউ এর মা তাঁকে নিতে পাল্কী পাঠিয়েছেন—তুমি নাকি ভাড়াবাড়ী বলে তাকে যেতে দাওনি? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি পাঠিয়ে দাও"।[৫৭] যে ইচ্ছা বাল্যেই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়েছিল প্রবাসবাসের ফলে তা আরো বর্দ্ধিত হয়ে বল সঞ্চয় করেছিল। বিলেতে পুরুষ এবং মহিলাদের নানা সামাজিক কার্যকলাপে একত্রে অংশগ্রহণের এবং পারিবারিক জীবনে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের যে দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছিলেন, তার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলেতে তিনি বিবাহিত এবং অবিবাহিত বহুমহিলাকে দেখতে পান যাঁরা তাদের অনেকটা সময় এবং শক্তি সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতেন। এর সঙ্গে তিনি বাঙ্গলী মহিলাদের অবরুদ্ধ জীবনের তুলনা করে কষ্ট পেতেন।

ইংলন্ডে থাকার সময়ে তিনি জ্ঞানদাকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লেখেন, তা

থেকে বোঝা যায়, তিনি বন্দী বাঙালী মহিলাদের জন্য কত ব্যথা অনুভব করতেন। একটা চিঠিতে তিনি জ্ঞানদাকে লেখেন ঃ 'ইংলন্ডে এখন এতদিন থাকিয়া ইহা একপ্রকার বাড়ীর মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রীতিনীতির দোষগুণ পূর্বাপেক্ষা কত বলপূর্বক মনে আঘাত করে। এখানকার সমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরকমের সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে দেশাচার, ভর্ত্তার আদেশ এবং পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রী সৌভাগ্য এখন অনেকদূর। স্ত্রীলোক জীবন-উদ্যানের পুষ্প, তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ-বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে মঙ্গলের কি সম্ভাবনা।"[৫৮] তাঁর এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, বিলাতের আদর্শ তাঁর চিন্তাধারাকে কতো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে ইংলন্ডে নিয়ে যাবার অনুমতি পান নি। হতাশ সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লেখেন "বাবা মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বন্দি রাখি। আমি ত ভাই বুঝিতে পারিনা বাবা মহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারারুদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তা হইলে তোমার শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। স্ত্রীলোক উন্নত ও স্বাধীন হইলে সমাজ যে কত উৎকৃষ্টভাব ধারণ করে, ইংলন্ডে আসিয়া তাহার কতক বুঝা যায়। তুমি যদি ২৫ বছর অন্তঃপুরে যেমন আছ তেমনি এইরূপে বাস কর আর যদি দুই বছর ইংলন্ডে আসিয়া যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলন্ডের দুইবৎসর অন্তঃপুরের ২৫ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি ও মনের উন্নতিকর ও বিকাশকর দেখিতে পাইবে।"[৫৯]

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের এক অংশে সচেতনতা জেগে উঠলেও, মহিলাদের শিক্ষা ও আধুনিকতা সম্পর্কে সে কালের সমাজের বিরোধিতা ছিল তীব্র। দিনকাল বদলাচ্ছিল, বাধাবিপত্তির মাঝখানেও মেয়েরা ধীরে ধীরে খুঁজে পাচ্ছিলেন আত্ম-আবিষ্কারের পথ চার দেওয়ালের বদ্ধ ঘরে বসে পরের হুকুম

তামিলই যে জীবন নয় একথা বুঝতে পারছিলেন মেয়েরা। বুকের মধ্যে একটু একটু করে দুরাকাঙ্ক্ষার পাতা মেলছিল । এবার তৎপর হলেন জ্ঞানদানন্দিনী। সত্যেন্দ্রনাথের মত অমন উদার ও স্ত্রীস্বাধীনতায় বিশ্বাসী স্বামী পেয়েছিলেন বলেই জ্ঞানদা অতি অল্প কালের মধ্যেই অবরোধ প্রথা ভঙ্গ করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও জীবনযাত্রায় নতুনত্ব আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। জ্ঞানদার শিক্ষা ও প্রগতির মূলে সত্যেন্দ্রনাথের ঔদার্য্য ষোলআনা কার্যকরী হয়েছিল।

১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের প্রথম দেশী আই.সি.এস. অফিসার হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ কর্মস্থল বোম্বাই যাবেন, সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীও যাবেন। জাহাজে করে যেতে হবে। তখনও কলকাতা বোম্বাই রেলপথ তৈরী হয়নি। কিন্তু বাড়ী থেকে জাহাজঘাট পর্যন্ত কি করে যাবেন। সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, বাড়ী থেকেই গাড়ীতে ওঠা যাক। কিন্তু মহর্ষি রাজী হলেন না। বাড়ীশুদ্ধ সকলে ছি ছি করতে লাগল। মহর্ষি বললেন, মেয়েদের পালকি করে যাবার নিয়ম আছে, তাই রক্ষা হোক। নিরুপায় হয়ে জ্ঞানদানন্দিনীকে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি করে জাহাজে তুলে দেওয়া হল।

তখন গৃহবন্দী মেয়েদের পোষাক ছিল শুধু একখানা শাড়ী। শীতকালে তার উপর একখানা চাদর বা শাল হলেই চলে যেত। কিন্তু শুধু শাড়ী পরে কি বাইরে বেরোনো চলে। কোন পেটিকোট অথবা ব্লাউজ পরার রীতি তখনও চালু হয়নি। তাছাড়া মেয়েদের জুতা পরার রীতিও তখন ছিল না। শাড়ীখানা জামদানি, নীলাম্বরী বা বেনারসী যত দামীই হোক না কেন? তার উপর ঘোমটা টানতে গিয়ে অনেক সময় পিঠের অর্দ্ধেক হয়ত অনাবৃত হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসী দর্জির সাহায্য নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়ে এক কিম্ভূত কিমাকার পোষাক তৈরী করালেন। ফরাসিদের মতে এটাই নাকি 'ওরিয়েন্টাল ড্রেস'। সেটা পরা এত কষ্টকর যে আরেক জনের সাহায্য ছাড়া পরাও যেত না। সত্যেন্দ্রকে সাহায্য করতে হত।

সত্যেন্দ্রনাথের এই অভিযান জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যে কি বিপুল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর একটি উক্তি থেকে - "আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন সেমিজ জামা জুতা পরিয়া গাড়ী চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়া ছিল তাহা এখনকার

দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।"[৬০]

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত থেকে সিভিলিয়ন পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় সঙ্কল্প করেন যেমন করেই হোক আমাদের দেশের মেয়েদের অবরুদ্ধ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি আনতেই হবে। তাঁর বাল্য স্মৃতিতে মনের ভাব এইভাবে ব্যক্ত করেছেন - "আমাদের স্ত্রীরা পর্দ্দার অন্ধকারে কি খর্ব্বীকৃত বদ্ধজীবন যাপন করেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ - তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়া কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্ব-পশ্চিমের পরস্পর বিপরীত ভাব আমাদের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হল—পর্দ্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল।"[৬১] পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী তাঁকে একাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। জ্ঞানদার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সাহস ও শক্তি লুক্কায়িত ছিল; উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং পরিবেশ পেয়েছিলেন বলেই তিনি দীর্ঘদিনের রুদ্ধ অর্গল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সেকালে অনেকেই গাউন পরতেন। জ্ঞানদানন্দিনী বম্বে গিয়ে একটা পার্সি পরিবারে দেখলেন যে ওরা সর্বদাই রেশমি কাপড় পরে আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধে ও একটা সাদা পিরান মত জামার তলায় পরে। জ্ঞানদানন্দিনী নিজের ড্রেস ছেড়ে তাদের মত কাপড় পরতে শিখলেন, তবে ওরা ডান কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ী পরতেন কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী সেটা বদলে আমাদের মত বাঁকাধে পরতেন। সায়া পরতেন। দু'বছর বাদে তিনি যখন বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরলেন তখন সবাই এই শাড়ী পরার ধাঁচের নাম দিলেন 'বোম্বাই দস্তুর'। জ্ঞানদার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি ছিল প্রবল। সেই শক্তির জোরেই তিনি সত্যেন্দ্রের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। দু'বছর বোম্বাই বাস করে জ্ঞানদা যখন অপরূপ বেশবাসে সজ্জিত হয়ে কলকাতায় ফিরলেন তখন থেকেই পুরানো সংস্কারের পাষাণ বেদিটা একটু একটু করে সরতে শুরু করল। জ্ঞানদা কেবল যে অবরুদ্ধ বন্দীজীবন থেকে মুক্তি এনেছিলেন তা নয়, তাঁর বিচরণের ক্ষেত্রকেও অনেক প্রসারিত করেছিলেন। ভেতরে ভেতরে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিলে অনেক আগে থেকেই। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাকে আরো তরান্বিত করলেন।

বোম্বাই-এ কর্মরত থাকাকালীন একবার সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি কাটাতে কলকাতায় এলে বিলাতীপ্রথা অনুসারে লাটপ্রাসাদে তাদের স্বস্ত্রীক নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের পিতৃব্য স্থানীয় পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রসন্নকুমার ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথা থেকে পরবর্তী ঘটনা শোনা যাক —"আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা - তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"[৬২]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রবাসে থাকাকালে ইচ্ছা হয়েছিল যে জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে তাঁর কাছে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা সম্মতি দেননি বলে তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন নি। চাকরী জীবনে যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বৃহত্তর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে বাস করছিলেন, তখন জ্ঞানদানন্দিনীকে পুত্রকন্যা সমেত এক ইংরাজ দম্পতির সঙ্গে বিলাত পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে ছিল ৫, ৪ ও ২ বছরের তিনটি শিশু সন্তান। সেখানে তখন মহর্ষির জ্ঞাতিভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাস করতেন। কথা ছিল সত্যেন্দ্রনাথ পরে ছুটি নিয়ে তাদের সঙ্গে যতদিন সম্ভব কাটিয়ে আসবেন। বিলাতে বসবাস কালে সত্যেন্দ্রনাথ সেখানকার স্ত্রী স্বাধীনতা দেখে মুগ্ধ হন। আহারে-বিহারে সামাজিক অধিকারে সেখানকার নারী ছিলেন পুরুষের সমস্থানীয়। সেখানকার মানুষ তখন শৌর্যে বীর্যে আধিপত্যে পৃথিবীতে অগ্রণীয় স্থান অধিকার করেছে। তাঁর মনে হয়েছিল সেখানকার উন্নতির মূলে আছে স্ত্রীস্বাধীনতা। একটি পা খোঁড়া হলে মানুষের যেমন দুর্দশা হয়, তেমনি সমাজদেহের দুটি অঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমাদের দেশের সমাজবিধি সেকালে নারীকে পঙ্গু করে রেখে সমাজের দুর্দশাকে বরণ করে এনেছিল। সত্যেন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল—জ্ঞানদানন্দিনী বিলাতে মেয়েদের স্বাধীন পরিবেশে বাস করতে পারলে তার মধ্যেও নিশ্চয় স্বাবলম্বিনী হবার উপযুক্ত মনের বল সঞ্চয় হবে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি অসুস্থ হয়ে বিলাতে থাকাকালীন মারা গেলে এই আকস্মিক বিপদের মধ্যেও জ্ঞানদা প্রবাসে যে স্বাবলম্বিতার পরিচয় দেন তার দৃষ্টান্তও খুব বেশী পাওয়া যায় না। কিছু ছুটি অর্জন করে সত্যেন্দ্র প্রবাসী স্ত্রীর কাছে যখন যান, তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্রবাসবাসের পর জ্ঞানদা যখন স্বামীর সঙ্গে দেশে ফেরেন তখন তাঁর মধ্যে স্বামীর স্ত্রী স্বাধীনতার স্বপক্ষে অভিযানে যোগ্য সহকর্মিণীর ও সহধর্মিণীর ভূমিকা অর্জন করেছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের জীবনে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছিল সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর দুঃসাহসিক আচরণের মধ্য দিয়েই ঐসকল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই মেয়েদের প্রথম অন্তর্বাস ব্যবহারের প্রথা প্রবর্তন করেন। এমনকি বর্তমানে যে হবল করে শাড়ী পরার রীতি প্রবর্তিত আছে তার মূলেও ছিলেন তিনি।

পারিবারিক জীবনকে মাধুর্য মন্ডিত করে বিশেষ করে শিশুদের জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্য জ্ঞানদানন্দিনীর বিশেষ নজর ছিল। তার একটি হল—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব করা। এরীতি এদেশে তিনিই প্রথম চালু করেন। শিশু যাতে সাহিত্যরসের আস্বাদ পায় সে উদ্দেশ্যে এপ্রিল ১৮৮৫ (বাংলা বৈশাখ ১২৯২) সালে শিশুদের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ বাংলাভাষায় সেটাই প্রথম শিশু পত্রিকা। দেশীয় ভাষার উন্নতি ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

'বালক'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এরূপ বলা হয়—"বালকদের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তোমরাই আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। তোমরা বিদেশীয়দের জ্ঞান সকল সুন্দররূপে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় রক্ত মাংসে পরিণত কর। নানা ভাষা হইতে নানা রত্নরাজী আহরণ করিয়া দুঃখিনী মাতৃভাষার অভাব সকল শীঘ্র দূর কর। তাহা হইলে বিদেশীয় ভাষায় বিদ্যা উপার্জনের কষ্ট আর সহিতে হইবে না। যতদিন পরিবার পোষণে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্যন্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না। তাহা হইলে দারিদ্র্যতার দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন নববধূকে ঘরে আনিবার জন্য মা তোমাকে অনুরোধ করিবেন তখন মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিও, মা আমরা এই কয়জনেই অন্নবস্ত্রের ক্লেশে সারা হইতেছি এখন আবার ঘরে লোক আনিয়া কেন আমাদের দুঃখ কষ্ট বাড়াইয়া তুলিবে, আর কি করিয়াই বা একটি সুকুমারী বালিকাকে ক্লেশের ভাগী করিব মা, যতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী যথেষ্ট অর্থ উর্পার্জ্জনে সক্ষম না হই ততদিন তুমি আমাকে এই অনুরোধটি করিওনা।

তোমরা দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কোন্ মহৎ কার্য্য না সুসিদ্ধ হইতে পারে। তোমাদের স্বাস্থ্যের উপরই দেশের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে - তোমাদের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে -তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলই

দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। তোমাদের এই সকল কথা বলিবার, তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই 'বালক' পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাদের মঙ্গলই ইহার একমাত্র মঙ্গল।"[৬৩]

কৈলাসবাসিনীর স্বামীর মত জ্ঞানদার স্বামীও নিজে যত্ন করে স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানদার মধ্যে অন্তঃপুরের বাইরে যাবার একটা তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। দুর্গাচরণ গুপ্ত ও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য না থাকলেও মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। ঐ সময় হিন্দু কলেজের তরুণ ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার একটা ঢেউ এসে লেগেছিল। দুর্গাচরণ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষালাভ করেন বিলাতে। তিনি জেমস্ এবং জনমিলের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন-একটা জাতি কতটা উন্নত, তা বোঝা যায়, সে জাতির মহিলাদের অবস্থা থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজের মেয়েদের উন্নত অবস্থা ও মর্যাদা দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সৌভাগ্যক্রমে সত্যেন্দ্রনাথকে স্বামীরূপে পেয়েছিলেন, তাই তার উন্নতি হয়েছিলো তরান্বিত।

কৈলাসবাসিনী রাসসুন্দরীর তুলনায় অনেক আধুনিকা ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন দেশে ইংরেজ রাজত্বের ফলে পাশ্চাত্যের ভাবধারার ছোঁয়া এসে না লাগলে ভারতীয় বিশেষ করে বাঙ্গালী মহিলাদের শিক্ষা ও অবরোধ মোচন অত ত্বরান্বিত হত না। কিন্তু রাসসুন্দরী প্রথম জীবনে একটি পরিবারের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁর লেখায় নিজের জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গে তৎকালীন সব মেয়েদের কষ্ট তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। রাসসুন্দরী তাঁর বার্ধক্য অবস্থায় এসে দেখলেন যে, সমাজে মেয়েদের অবরোধ অনেক শিথিল হতে শুরু করেছে।

কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর তফাৎ এখানে যে কৈলাসবাসিনী মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অবরোধের কঠোরতা মোচন, বিবাহের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যে মেয়েদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়, সে সব থেকে মুক্তির দাবী জানালেও, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন আছে, সে কথা চিন্তা করেননি। আর একথা স্বীকার করতেই হবে যে জ্ঞানদানন্দিনীর গ্রহণ ক্ষমতা ছিল অত্যধিক, তাই তিনি সব কিছুই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত্ব করতে পেরেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টা ও উৎসাহে ঠাকুর পরিবার থেকে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (ইংরাজীর ১৮৭৭) 'ভারতী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক হন। এই পত্রিকার মাধ্যমেই দ্বিজেন্দ্রনাথ একদল নবীন ও প্রতিভাবান লেখক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিলেন। এই নূতন লেখক গোষ্ঠীর লেখার ধরন, ভাষার ভঙ্গী ও ভাব সবই নতুন। এই লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সে সময় বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত আর একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য এইরূপ—"জ্যোতির ঝোঁক হইল একখানা নূতন মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা! আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপরে পড়িল।"[৬৪] তখন একালের মত মাসিক পত্রিকার এত হরিরলুট ছিল না। 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব', 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছিল।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন তখন মৃত প্রায়। প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র তখন দেশে আরও দু-তিনখানি ছিল—তার মধ্যে বান্ধব ছিল প্রধান। সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সময় 'ভারতীর' প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন পত্রিকা ছিল না। বঙ্গভাষায় সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে 'ভারতী' অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে 'ভারতী' পরিচালনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী সাহিত্যানুরাগিনী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঘোষণা করেন, "ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।"[৬৫] ১৮৮৪ সালে এই (১২৯১ বাংলা) দুঃসময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র দায়িত্বভার গ্রহণ করে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে 'ভারতী'কে উদ্বার করে তাঁর লালন ক্ষমতার পরিচয় দেন। শরৎকুমারী, চৌধুরাণী প্রমুখ বহু লেখিকা তাতে লিখতে আরম্ভ করেন।

'ভারতী'র পাতায় অঙ্ক, রসায়ন, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, জীবনদর্শন, কবিতা, সমাজনীতি উপন্যাস প্রভৃতি আলোচিত হত। স্বর্ণকুমারী দায়িত্ব গ্রহণের পর এগুলির সাথে আর একটি নতুন বিষয় যুক্ত করলেন তা হল বিজ্ঞান আলোচনা।

কোন ভারত মহিলা দ্বারা সেই সময় সাময়িক পত্র সম্পাদনা করা কেবল বঙ্গদেশেই নয়, ভারতবর্ষেও প্রথম। একজন বাঙ্গালী মহিলা বাংলা মাসিক পত্রের সম্পাদনা করতে পারেন—একথা তখন কেহ কল্পনায়ও আনতে পারতেন না। স্বর্ণকুমারী নিজে সাহিত্যক্ষেত্রে সফলতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই বহু বঙ্গ রমণীর সাহিত্য জগতে প্রবেশের পথকে তিনি মসৃণ করে তুলেছিলেন। বহু নবীন লেখক গোষ্ঠীকে 'ভারতী' উৎসাহ দিয়ে পরবর্তীকালে তাদের বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন করে দিয়েছিলেন।

'ভারতী' যে দীর্ঘজীবী হয়ে বঙ্গসাহিত্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা। এই মাননীয়া মহিলা সম্পাদকের অপূর্ব সম্পাদন প্রতিভার গুণেই 'ভারতী' পত্রিকা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছে। সেকালে আর কোন পত্রিকার ভাগ্যে 'ভারতী'র মত নিয়মিত প্রকাশ ঘটে নাই। সমালোচকগণ 'ভারতী'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর তাছাড়া লেখার সরলতায় সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল 'ভারতী'র উপর।

স্বর্ণকুমারী অক্লান্ত সাহিত্য সাধনা দ্বারা 'ভারতী'কে তৎকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী নিজে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে নিজের সৃষ্ট সাহিত্যের যেমন গৌরব বৃদ্ধি করেছেন সেইরূপ বহু নবীন মহিলা ও পুরুষ সাহিত্যিককে বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন করে দিয়েছেন। তাঁর এমন একটি শক্তি ছিল যার দ্বারা তিনি কার কোথায় কোন গুণ আছে তা খুঁজে বার করে তাদের উপযুক্ত মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তিনি গুণের আদর করতে জানতেন, সেই গুণের দ্বারা সমাজ ও সাহিত্যের উপকার কিভাবে করা যায় তা বুঝবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। এই অসাধারণ শক্তি ছিল বলেই তিনি সেই সময়কার বঙ্গদেশের নামী দামী সাহিত্যিকের নিকট থেকে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধরাজি সংগ্রহ করে 'ভারতী'র ডালিকে অপরূপ বেশবাসে সজ্জিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শিক্ষা যে কি জিনিষ তা স্বর্ণকুমারী বুঝেছিলেন বলেই আজীবন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। মহিলাসমাজ যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, উন্নত হয়, আর্থিক স্বনির্ভরতা লাভ করতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি সখীসমিতি ও মহিলা শিল্পমেলার আয়োজন করেছিলেন। তিনি নিজে ধনী কন্যা হয়েও উচ্চ নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মহিলাগণ যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, তাদের রুচি মার্জিত হয়, সকলে যাতে আনন্দে জীবন কাটাতে পারে সর্বোতভাবে সেই চেষ্টা করতেন। সকলের সঙ্গে সহাস্যমুখে মিশতেন এবং তাঁকে দেখবামাত্র সকলেই তাঁকে নিজের আপনজন বলে মনে করতেন। বংশগৌরব, শিক্ষার গৌরব ও আভিজাত্যের গৌরব ভুলে তিনি সকলকেই আপন করে নিতেন। এসব গুণের জন্যই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সকলের মন জয় করতেন। নিজের সাহিত্য সাধনার সাথে সাথে অন্যান্য লেখিকাদেরও সাহিত্য সাধনা করার প্রবেশ পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী হয়েও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার বোধ ছিলনা। তখনকার মাসিক জগতে 'ভারতী'র স্থান ছিল সর্বাগ্রগণ্য। 'ভারতী'র মত এমন উচ্চস্তরের একখানি মাসিকের সম্পাদনা একজন বঙ্গমহিলা করছেন এতে তখনকার সময়ে সকলেই বিস্ময়বোধ করতেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান আলোচনা কোনটা তিনি বঙ্গ সাহিত্যের ভান্ডারকে দান করেন নি। নারীজাতির মধ্যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা তিনি করে গেছেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর 'ভারতী'র দুর্দিনের সময় তিনি 'ভারতী'র লালনের ভার গ্রহণ করে সাহসিকতার সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলেই তো বহু বঙ্গরমণী তাঁর দৃষ্টান্তে ও উৎসাহে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর রচনা যেমন ছিল সরস তেমনি জীবন্ত। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল, আত্মসম্মান ও আত্মশক্তিতে ভরপুর ছিল। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ওরা বিপদের সময়ে হাহাকার না করে নারীত্বের গর্ব ও অন্তরের শক্তিতে এগিয়ে চলার সঙ্কল্পে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

লেখাপড়া শিখলেই যে মেয়েরা উগ্র হয় না বা নারীত্বের কোমলতা নষ্ট হয় না বরং জ্ঞানের দীপ্তিতে নারীত্বের মহিমাটি আরও উজ্জ্বল সুন্দর করে সংসার ক্ষেত্রটিকে আরো মহিমময় করে তুলতে পারা যায়, শিক্ষাভিমানের লেশমাত্র তাতে থাকে না স্বর্ণকুমারীর চরিত্র তার জীবন্ত উদাহরণ।

১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০১ পর্যন্ত এগারো বছর আর একবার ১৩১৫ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত সাত বছর স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকার কাজ

যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়েছিলেন। ১২৯৩-১২৯৯ পর্যন্ত 'ভারতী' ও 'বালক' একই সাথে স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর 'বালক', 'ভারতী'র সাথে মিশে যায়। স্বর্ণকুমারীর দুই বিদুষী সুযোগ্যা কন্যা, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী যুগ্মভাবে 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব কিছুকাল পালন করেছেন। ১৩০২ থেকে ১৩০৪ পর্যন্ত শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী যুগ্মভাবে 'ভারতী'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে ধারণ করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব থেকেই 'ভারতী'তে নিয়মিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখে তাঁরা পাঠক সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। কবিতা লেখাতে হিরণ্ময়ী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি সরলতায় ও ভাবমাধুর্যে পাঠক সাধারণের মন জয় করেছিল। তবে হিরন্ময়ী তাঁর কাব্য-চর্চ্চা বেশীদিন চালিয়ে যেতে পারেননি কারণ নানাবিধ সাংসারিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন।

মাঝে এক বৎসরের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে 'ভারতী'কে নূতন সাজে, নূতন ভাবে রাঙ্গিয়ে তুলেছিলেন। এইসময়ে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী থেকে 'সাধনা' নামে একখানি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশ পাচ্ছিল । তিন বছর বাদে রবীন্দ্রনাথ নিজে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরের বছরই 'সাধনা' উঠে যায়। ঐ সময়কালে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা 'সাধনা'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে যখন 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন 'সাধনা'র অকালমৃত্যু ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগে 'সাধনা'র ধাঁচে 'ভারতী'কে নূতন সাজে, নূতন সুরে সাজিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন। 'ভারতী' তখন 'সাধনা'র রূপ ধারণ করেছিল। উপরে 'ভারতী'র ছাপ না থাকলে 'ভারতী'কে তখন 'সাধনা' বলেই মনে হত।

এক বৎসর বাদে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী ১৩০৬ বঙ্গাব্দে একাই 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিজ হস্তে তুলে নেন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনার নেতৃত্বে 'ভারতী' এসময় ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের তৎকালীন নামী দামী মাসিক পত্রিকাগুলির শীর্ষস্থান দখল করেছিল। সরলা দেবীর আগ্রহ, যত্ন ও চেষ্টায় 'ভারতী'র পাতায় একটি নূতন প্রবাহের ধারা এসময়ে বইতে শুরু করেছিল—দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে জনচেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে

'ভারতী' জোরালো লেখনী ধারণ করেছিল। তার ভাষা যেমন ছিল জীবন্ত তেমনি আবেগমন্ডিত। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'ভারতী'র পাতায় প্রবল বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। শ্রীমতী সরলা দেবী জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যে স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা ঐ সময়ে বঙ্গনারীদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল বলা যায়। বহু বঙ্গরমণী স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশ সেবার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদকীয় কর্তব্য অতি সাহসের সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে কেউ হস্তক্ষেপ করুক এটা তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তখন তিনি বজ্রের মত কঠোর কঠিন হতেন। অনেক ক্ষমতাবান লেখককেও তিনি অনধিকার চর্চ্চার জন্য মার্জ্জনা করেননি। যেটা সঠিক বলে মনে হত তা তিনি নির্দ্বিধায় বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। বঙ্কিমের কবিতায় কোন গুণপনা নেই একথা বলতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। 'ভারতী'র সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই - বঙ্গদেশের কীর্ত্তিমান দুই বড় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ— এই দুই জনকে 'ভারতী' একই সঙ্গে আপন লেখকরূপে পেয়েছিল। ভারতী যে দীর্ঘজীবী হয়েছিল তার মূলে ছিল বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর পরিবারের সুযোগ্য কন্যাসন্তানদের নিঃস্বার্থ সেবা ও অনলস পরিশ্রম। 'ভারতী' ১৯২৫ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল।

ঠাকুর পরিবারের যশঃগৌরবকে যিনি স্বদেশের ভূমি অতিক্রম করে বিদেশের মাটিতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিকাশে ঠাকুর বাড়ীর উর্ব্বর পরিবেশ সহায়তা করেছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশে মহর্ষির পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি অনুজ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতিভা বিকাশে জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে, নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশে এই পরিবারের আর একজনেরও ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি হলেন জ্যেতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কাদম্বরী দেবী। তিনি বালক রবীন্দ্রনাথকে সেবা দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, মাতার মতই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ প্রতিভাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগিণী মহিলা। বালক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁর স্নেহাশ্রয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে

ঠাকুরবাড়ীর বধূদের মধ্যে একটি স্ফুটনোম্মুখ প্রতিভা অকালে শুকিয়ে গেল। তিনিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চ্চার একজন অংশীদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়তেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে - তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চায় আমি অংশীদার ছিলাম।"[৬৬]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদিকার হাতে 'ভারতী'র গৌরব কখনই ম্লান হয়নি। সম্পাদিকাগণ বহু সুললিত রচনা দ্বারা 'ভারতী'র গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাগণ যে অপরিসীম ত্যাগ, নিঃস্বার্থ সেবা ও নিরলস সাধনা দ্বারা জগৎসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন উত্তরপুরুষ এখন তার গুরুত্ব অনুভব করে, মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধের স্বাদ গ্রহণ করে, তাঁদের জ্ঞানপিপাসা মেটাচ্ছেন। এর জন্য বঙ্গসাহিত্য চিরকার ঠাকুর বাড়ীর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গসাহিত্য ঠাকুরবাড়ীর কাছে সমধিক লালিত-পালিত হয়ে বর্দ্ধিত হয়েছিল।

ঘ. সম্পাদিকাগণের ব্যক্তিপরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক-পরিমণ্ডল ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আলোচনা।

পাশ্চাত্যের উদার মুক্ত ভাবধারার প্রভাবে আমাদের দেশেও একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। তারই প্রভাবে আমাদের দেশের জনমনে একটা আনন্দের শিহরণ বইতে শুরু করে। আমরা সচকিত হয়ে উঠি। কোথায় আমাদের দৈন্য তা উপলব্ধি করতে শুরু করি এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হই। দীর্ঘদিনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ফলে নারীকে শিক্ষাবিহীন অবস্থায় নামিয়ে আনা হয়েছিল পশুত্বের পর্য্যায়ে। উনিশশতক নারীকে এনে দিয়েছিল মুক্তির আনন্দ। এই শতকেই সামাজিক বাধা নিষেধের গন্ডী অতিক্রম করে যে অল্পসংখক মহিলা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা বৃহত্তর মহিলা সমাজকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। একাজে পাশ্চাত্যের উদার ভাবধারায় বিশ্বাসী ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। এইসব পরিবারের

আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ সাহসে ভর করে শিক্ষার সাথে সাথে তাঁরা সাহিত্যসাধনা যেমন শুরু করেছিলেন তেমনি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী দাওয়া আদায়ের নিমিত্ত লেখনী ধারণ করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি—মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা'। এই পাক্ষিকখানির সম্পাদিকা ছিলেন মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। ইনি ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জীর ভগিনী। আনুমানিক ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মেছিলেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'বনপ্রসূন', 'সফলপ্রশ্ন', 'কল্যাণ প্রদীপ' প্রভৃতি। 'বনপ্রসূন' গ্রন্থে 'বাঙ্গালীবাবু' কবিতাটি কবি হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' শীর্ষক বিদ্রূপাত্মক কবিতার পাল্টা জবাব। কবিতাটি সেকালের পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছিল। তিনি একটি ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসও রচনা করেন। 'বাঙ্গালীবাবু' কবিতাটির কিছু অংশ এরূপ—

কে নায় খায় অই, করে দড়বড়ি,
বাঙ্গালীর বাবু ! হায় বড় তাড়াতাড়ি,
সাহেব করিবে রাগ, বেলা হলে যেতে,
তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে ।
চাপকান পেন্টালুনে, পোষাকের ঘটা,
শিরে শোভে পাকড়ী শাল দিয়ে আঁটা ।....[৬৭]

মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা 'হিন্দুললনা'-এর সম্পাদিকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি ।

মহিলাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা 'অনাথিনী'। এর সম্পাদিকা থাকমণি দেবীর বিষয়েও বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করা যায়নি। একমাত্র ইনি 'সহোদর' সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বালিকা কন্যা। তিনি পিতার সহিত বিবাহের পূর্বে ধুলিয়ানে অবস্থান করিতেন।

মোহিনী সেন (খাস্তগীর)-এর জন্ম চট্টগ্রামে ১৮৬০ সালের ১৯ শে মার্চ। পিতা খ্যাতনামা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর। তিনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেন আরাকান খ্রীষ্টান ফিমেল স্কুলে। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। 'নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট' স্কুলে প্রথমদিকের শিক্ষয়িত্রীদের অন্যতমারূপে যোগ্যতার

পরিচয় দেন। ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি বিদুষী ও সাহিত্যানুরাগী মহিলা ছিলেন। বেশ কিছুদিন 'পরিচারিকা' পত্রিকাখানির সম্পাদনার দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। অকালমৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ছবি আঁকা ও গানবাজনায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

৬ই মে ১৮৯৪ সালে মোহিনী দেবীর মৃত্যুর ফলে ময়ূর ভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী কিছুদিন 'পরিচারিকা' পরিচালনা করেছিলেন। সুচারু দেবীর জন্ম কলকাতায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। তিনি কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন 'পরিচারিকা' পত্রিকাখানি পরিচালনা করেছিলেন। সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'ভক্তি অর্ঘ্য' ও 'প্রণতি' উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদিকাগণের হস্তে 'পরিচারিকা'র সম্পাদন ভার ছিল। কুচবিহারের রাজা ভিক্টর নারায়ণের স্ত্রী নিরুপমা দেবী 'পরিচারিকা'র (নবপর্য্যায়) সম্পাদনা শুরু করেছিলেন ১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। তাঁর সম্পাদনায় ১৩২৩ থেকে ১৩৩১ পর্যন্ত পত্রিকাখানি চলেছিল। তারপর এর প্রকাশ রহিত হয়। উত্তরপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে এক সমৃদ্ধ বাঙ্গালী পরিবারে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নিরুপমার জন্ম হয়। তিনি পিতা মতিলাল গুপ্তের কাছে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন এবং মাতার অনুপ্রেরণায় কাব্যসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন। ১৯১১-১২তে কুচবিহারের রাজপরিবারে ভিক্টর নারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয়নি। দুটি পুত্র সন্তান রেখে পিত্রালয়ে কাকার আশ্রয়ে চলে আসেন। দ্বিতীয় বিবাহ হয় অর্থনীতির কৃতী ছাত্র শিশিরকুমার সেনের সঙ্গে ১৯২৫-২৬ এ।

নিরুপমা দেবী বিদ্যালয়ে যাননি বলেই মনে হয়। বাড়ীতেই তার পড়াশুনা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁর প্রথম কবিতাসংগ্রহ 'ধূপ' ১৯২১ এ প্রকাশিত হয় । তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গোধূলি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৮)। বিশের দশকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হন এবং সেখানে ২/৩ বছর কাটান। হস্তশিল্প, ছবি আঁকা এবং মৃৎশিল্প বিশেষভাবে শিক্ষা করেন। সেই সঙ্গে চলতে থাকে কবিতাচর্চ্চা। বাড়ীতে শান্তিনিকেতনের আদর্শে শিশু বিদ্যাপীঠও

চালাতে থাকেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোট গল্পের নাট্যরূপ দেন। চল্লিশের দশকে গান্ধীজীর সান্নিধ্যে আসেন এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘে' যোগ দেন এবং গান্ধীজীর উপদেশে গ্রামে কাজ করার নীতি মেনে নেন। ১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় ডায়মন্ডহারবার খাদি মন্দিরের অধিকাংশ কর্মী কারারুদ্ধ হলে তিনি সেখানকার মধুসূদনপুর আশ্রমে এসে স্বামীর সাথে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় ঐ অঞ্চলের দুর্গতদের পাশে এসে দাড়ান এবং সর্বতোভাবে তাদের সেবা করেন। ১৯৪৩ থেকে স্থায়ী ভাবে নদীয়ার সাহেবনগরে বসবাস আরম্ভ করেন। নদীয়া জেলার জলঙ্গী নদীর কিনারে দুই বিঘা জমি সমেত একটি ছোট বাড়ী কিনে পাকাপাকিভাবে গ্রামীন জীবন শুরু করেন। সেখানে একটি স্কুল ও নারী কল্যাণকেন্দ্র এবং ক্রমে ক্রমে 'কস্তুর বা ওয়ার্ক সেন্টার' গড়ে তোলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রশিক্ষণের কাজ দেখাশুনা করতেন নিরুপমা দেবী, অন্যদিকে প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন শিশির কুমার। অভিভাবকহীন ৬/৭টি মেয়েও সেখানে আশ্রয় পায়। পরিবেশ হয় অনেকটা আশ্রমের মত। আমৃত্যু নিরুপমা দেবী পলাসীর কাছে সাহেবনগর গ্রামে নিজের 'আশ্রমে'ই বাস করতেন। ১৯৮১-তে প্রায় তিন-চার দশকের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় নিরুপমা দেবীর 'শেষের কবিতা'। ১৯৮৪ তে ঐ আশ্রমেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে যে 'ভারতী' নামের পত্রিকাখানি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮৪ বঙ্গাব্দ/ইংরাজীর ১৮৭৭) খ্রীষ্টাব্দে। সাত বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালনা করার পর ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'র দায়িত্ব স্বর্ণকুমারীদেবী গ্রহণ করেন। উক্ত অধ্যায়ে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকীর্তি আলোচিত হয়েছে। সেই কারণে এখন আর তাঁর বিষয় আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি নেই।

স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ১৩০২-১৩০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত যুগ্মভাবে 'ভারতী'র সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্য 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু পর বৎসরই ১৩০৬-১৩১৪ সরলাদেবী একাই এর সম্পাদনা করেন। ১৩৩১ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত আবার তাঁকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল।

হিরন্ময়ীর জন্ম ১৮৭০ সালে। পিতা জানকী নাথ ঘোষাল। মাতা খ্যাতনাম্নী

উপন্যাসিক ও কবি স্বর্ণকুমারী দেবী। বেথুন স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৮৮৩ সালে অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর কর্মস্থল রাজসাহী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে কাটিয়েছেন। ১২বছর বয়স থেকে ছোটদের জন্য কবিতা রচনা শুরু করেন। ছেলেদের মাসিকপত্র 'সখা'য় তাঁর রচিত কবিতা নিয়মিত প্রকাশ পেত। মায়ের প্রতিষ্ঠিত 'সখিসমিতি'র কর্ত্রী ছিলেন। এই সমিতি একবার লুপ্ত হবার উপক্রম হলে তিনি নিজ সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিধবা শিল্পাশ্রম খুলে সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

হিরন্ময়ী দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী সরলা দেবী। সরলার জন্ম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা জানকীনাথ বিলাত গেলে শৈশব কাটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বড়ীতে। বেথুন স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। প্রথম জীবনে সঙ্গীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথমদিকে বালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তৎকালীন উর্দুপত্রিকা 'হিন্দুস্থান' (লাহোর) এর সম্পাদক ব্যবহারজীবী রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়। তখনকার প্রথা অনুযায়ী তাঁর কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে হয়নি। ব্রিটিশ রাজরোষে তাঁর স্বামী গ্রেপ্তার হলে তিনি স্বামীর পত্রিকা 'হিন্দুস্থান'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এর একটি ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশ করেন।

তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী, যিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি 'সপ্তকোটির' পরিবর্তে ত্রিশকোটি শব্দ যোগ করে পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর ভাবোদ্দীপক কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণ করে জনতার হৃদয় আবেগমন্ডিত হয়ে উঠত। স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক বহু সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন। সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এবং বীরাষ্টমী ব্রত উৎসব পালন করেন। বাংলার প্রথম গুপ্ত বিপ্লবীদল গঠনে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সাধারণের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর চেষ্টা ও যত্নে 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার শাখা ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানশীন মেয়েদের

মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজেও তিনি উদ্যোগী হন। ১৯২৩ সালে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। ১৯৩০ সালে কলকাতায় 'ভারত স্ত্রী-শিক্ষাসদন' স্থাপন করেন। স্বভাবসুলভ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুদূর মহীশূরে গিয়ে মহারাণী স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী-শিক্ষা জগৎ থেকে অবসর নিয়ে ধর্মীয়জীবনে নিজেকে' নিয়োজিত করেন। প্রথমদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মভাব দ্বারা প্রভাবিত হলেও গুরুপদে বরণ করেন কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মাকে। তাঁর রচিত ১০০টি জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্কলন 'শতগান' নামে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বেও কিছুকাল ছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তলোয়ার ও লাঠিখেলার প্রচলন তিঁনিই প্রথম করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের নেতৃত্ব দেন। বীরভূম ও লক্ষ্মৌ শহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন, তাঁর অন্যান্য রচিত গ্রন্থ 'নববর্ষের স্বপ্ন', 'জীবনের ঝরাপাতা', 'শিবরাত্রি পূজা' প্রভৃতি। কৃতী পিতামাতার সন্তানরূপে নিজের জীবনেও বহুক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এজন্য বাঙ্গালী মহিলারা তাঁর কাছে ঋণী।

২) ক্রমবিকাশ পর্ব (১৮৭৯-১৯৪৭) ঃ

৬. খৃষ্টীয় মহিলা ঃ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ইংরাজীর জানুয়ারী ১৮৮১) 'খৃষ্টীয় মহিলা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা মহিলাদের সম্পাদনায় প্রকাশ পাচ্ছিল। এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কুমারী কামিনী শীল। এতে মহিলাগণই মহিলাদের বোধোপযোগী বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকাতে যে সব গদ্য-পদ্য এবং প্রবন্ধাদি লেখা প্রকাশিত হত সেগুলি অতি সুন্দর ও সুখপাঠ্য ছিল। তাতে মনে হয় এইসব মহিলাগণ সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন।

৭. বঙ্গবাসিনী ঃ বঙ্গমহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা হল বঙ্গবাসিনী। ১৮৮৩ সনের (বাংলা ১২৯০) শেষভাগে কলকাতার টালা অঞ্চল থেকে এটি প্রকাশ পায়। এর লেখিকাগণ সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন । শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণ কামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিনী ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত লেখিকাগণ এতে লিখতেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় এর পাতায় আলোচিত হত। এছাড়া দেশীয় বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তক থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ সকল এর পাতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করত। দেশী-বিদেশী নানা সংবাদপত্রের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উদ্ধৃত ও আলোচিত হত। অশিক্ষিত জনসাধারণ যাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় ইহাই ছিল 'বঙ্গবাসিনী'র মূল লক্ষ্য।

৮. সোহাগিনী ঃ 'সোহাগিনী' মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত আর একখানি মাসিক পত্রিকা। কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে যুগ্মভাবে 'সোহাগিনী'র সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করতেন। ১২৯১ এর বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৮৪) মাসে ১নং গরানহাটা ষ্ট্রীট থেকে হৃদয়লাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত হত।

নারীশিক্ষা, নারীর অবরোধ মোচন, সামাজিক কু-প্রথাগুলি যা তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল সেগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্বলিত লেখনী সকল এর পাতায় স্থান পেত।

৯. বালক ঃ 'বালক' প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে, (ইংরাজীর ১৮৮৫-র এপ্রিল মাসে) প্রকাশিত হয়। এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি বালকদের রচনা প্রকাশের জন্য প্রকাশিত হলেও কেবলমাত্র তাদের লেখায় চলতে পারে না মনে করে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এতে রচনা প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' তে লিখেছেন ঃ বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবৌঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুধুমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। এক বছর সগৌরবে চলবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সাথে মিলিত হয় এবং স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' ও 'বালক' এই পত্রিকা দুটির যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'বালক' প্রকাশিত হয়েছিল।

১০. বিরহিণী ঃ 'বিরহিণী' মাসিকপত্রিকার প্রকাশকাল কার্তিক ১২৯৫ (অক্টোবর ১৮৮৮)। সুশীলাবালা দেবী এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। এই

কাগজখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহা প্রধানতঃ গল্পের কাগজ।

১১. 'পুণ্য' ঃ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী 'পুণ্য' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পবিত্র কাজের উদ্দেশ্য নিয়েই 'পুণ্য' প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশকাল ১৩০৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস (অক্টোবর ১৮৯৭)। এই মাসিকপত্রখানি প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এরূপ লিখিত হয়েছে ঃ "এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানব মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা যেন আমাদের এই পুণ্যকর্ম্মে সহায়তা করেন"। 'পুণ্য' উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রগুলির অন্যতম ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ষের (১৩১০-১২) পত্রিকা হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। যাঁদের লেখা এতে প্রকাশিত হত, তাঁরা হলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, ভূপেন্দ্রবালাদেবী ও উমাশশী দেবী। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী রন্ধন প্রণালী নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতেন। 'আনন্দ মিলন ও দুটি ফুল' ভূপেন্দ্রবালা দেবীর রচনা, আর 'যোগীবর পবহারী বাবার জীবনী' ছিল উমাশশী দেবীর আলোচনার বিষয়। প্রজ্ঞাসুন্দরী ৩য় বর্ষ (১৩০৭-১৩০৮) পর্যন্ত 'পুণ্য' সম্পাদনা করেছিলেন।

১২. অন্তঃপুর ঃ 'অন্তঃপুর এই পত্রিকাখানি সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশকাল মাঘ ১৩০৪ (জানুযারী ১৮৯৮)। এটি মাসিক পত্রিকা এবং 'কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত পত্রিকা।

তৎকালীন বঙ্গসমাজে মহিলাদের চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সম্পাদকীয় ও লেখিকাদের লেখা থেকে। প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ "আজকাল মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিত করা

আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।"

নামকরণের উদ্দেশ্য অন্যত্র এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় : 'অন্তঃপুর মনুষ্যজাতির চরিত্র গঠনের স্থান। মাতার ক্রোড়ে বসিয়া শিশুর জীবন গঠিত হয় এবং হৃদয়ের বিকাশসাধন হয় । এই শিশুই ভবিষ্যৎ সমাজের এক একটি উপাদান। অন্তঃপুরে যে ভাব প্রবল থাকিবে সমাজও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। এই অন্তঃপুরকে সুন্দর করাই রমণী জীবনের প্রধান ব্রত।'

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ফুলমালাদেবীর একটি প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে লেখিকা নিম্নরূপ মন্তব্য করেন : যে শিক্ষা ও সংসর্গগুণে সৎ অথবা দেববৃত্তিগুলি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, মানবকে কর্ত্তব্য সাধনরূপে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল করতঃ পরম মঙ্গলময়, অনন্তসুন্দর পরমেশ্বরের মহামহিমময়, চরণ প্রান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া, মানব জীবনকে ধন্য করে এবং যে শিক্ষা ও সংসর্গগুণে অসৎ অথবা পশুবৃত্তিগুলি নিয়মিত ও সংযমিত হয়, সেই শিক্ষা ও সংসর্গই রমণী জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয়।" অপরাপর প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর বৈজ্ঞানিকত্ব', সরোজিনী দেবীর 'ভারত মহিলার স্বাস্থ্য', প্রবোধিনী ঘোষের মহিলাদিগের শিল্পচর্চ্চা', চপলাসুন্দরী দেবীর 'শিশুচিকিৎসা', সরলাবালা দেবীর 'সন্তান শিক্ষা', অন্নদাসুন্দরী ঘোষের 'স্বদেশানুরাগ', হেমাঙ্গিনী চৌধুরীর 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা,' তরুলতা দেবীর 'জাতীয় মহাসমিতি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

'অন্তঃপুর' ২য় বর্ষ থেকে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। বনলতা দেবীর মৃত্যু হলে যাঁরা এই পত্রিকাখানি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম ও কার্যকাল—১৩০৭ মাঘ, (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) থেকে ১৩১১ বৈশাখ (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পর্যন্ত—হেমন্তকুমারী চৌধুরী। ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩১১ ভাদ্র—কুমুদিনী মিত্র। ১৩১১ আশ্বিন থেকে ১৩১১ মাঘ পর্যন্ত—লীলাবতী মিত্র। ১৩১১ ফাল্গুন থেকে ১৩১২ বৈশাখ পর্যন্ত সুখতারা দত্ত পর্যাযক্রমে এর সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯১৫) বিরাজ মোহিনী রায় সম্ভবতঃ 'নব পর্য্যায়ের' 'অন্তঃপুর' প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতকের মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার এটাই তালিকা। সংখ্যায় এগুলি অপেক্ষাকৃত কম বলে অনেকটা বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেয়া সম্ভব হল। প্রধানতঃ

পুরুষ পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাগুলির অনুকরণে মহিলাগণ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় ব্রতী হয়ে নিজেদের অভাব অভিযোগ গুলি পত্রিকার পাতায় তুলে ধরতে থাকেন। এইসব মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমেই নারীকণ্ঠে নারীসমাজের বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। দীর্ঘদিনের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাষা পত্রিকার পাতায় মুখরিত হয়ে উঠে এবং চার দেওয়ালের গণ্ডী অতিক্রম করে মহিলাগণ ক্রমশঃই আত্মপ্রকাশে মরিয়া হয়ে উঠেন ।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহিলাগণ যেমন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও মহিলাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় রমণীকণ্ঠে রমণীসমাজের অভাব-অভিযোগ ও কর্তব্যের কথা ধ্বনিত হয়েছিল। কতকগুলি সামাজিক কু-প্রথা ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে বা সাময়িক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে সেগুলি গোটা মহিলা সমাজকে বিষবৃক্ষের মত ঘিরে ধরেছিল, সেই মারক বৃক্ষকে উৎপাটিত করে মহিলারা সমাজে আবার মাথা তুলে দাড়াতে সক্ষম হয়েছে, এটা কম আশার কথা নয়। সেই মারক বৃক্ষের দূষিত আবহাওয়া থেকে মহিলারা বিংশ শতকের শেষ দশকেও যে একেবারে মুক্ত তা বলা যায় না। তবে অনেকটাই বিশুদ্ধ বায়ু সমাজে প্রবেশ করছে ।সমাজে নারী শিক্ষার বাধা দূর হয়েছে। নারীশিক্ষা, নারী প্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাহিত্যে মহিলাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিছু মহিলার সাহিত্যকীর্তি পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে অরো কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীনকালী দেবীর 'শ্মশান ভ্রমণ' নামক কাব্য, বসন্তকুমারী দাসীর 'রোগাতুরা', তরঙ্গিণী দাসীর 'সুগ্রীবমিলন' যাত্রার পালাগান, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মালতী' গল্প এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'কবিতাহার' প্রকাশিত হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দেও মহিলারচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে মণিমোহিনীদেবীর 'বিনোদকানন' নাটক, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা' নামক কাব্যগ্রন্থ, নয়নতারা দে-র 'মণিমোহিনী' উল্লেখযোগ্য।

১৮৮১ তে কামিনীসুন্দরী দাসীর 'কল্পনাকুসুম', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেবকৌতুক' এবং ১৮৮৪তে জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্তের 'ধূলিরাশি', রাণী মৃণালিনীর 'প্রতিধ্বনি', ১৮৮৫ তে উক্ত রাণী মৃণালিনীর 'নির্ঝরিণী' ও 'কল্লোলিনী' প্রকাশ পায়। দেখা যাচ্ছে, মহিলাগণ দ্বিগুণ উদ্যমে শত সামাজিক বাধা অতিক্রম করে

নিজেদের ভয় ও জড়তা কাটিয়ে সাহিত্যের আসরে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসরমান।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীর' সম্পাদনার দায়িত্ব স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর অর্পিত হয় এবং শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রমুখ বহু লেখিকা 'ভারতী'তে লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ তে আরো বহু মহিলার লেখা প্রকাশ পায়—যথা নিস্তারিণী দেবীর 'কেশবজ্যোতি', ষোড়শীবালা দাসীর 'পুষ্পকুঁড়ি', ১৮৮৫তে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্তৃক 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ পেলে তাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোট কন্যা সরলা দেবী ও অন্য অনেক মহিলার লেখা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৬তে নবীনকালী দেবীর 'ষট্‌চক্রভেদ', ১৮৮৭তে প্রসন্নময়ীদেবীর 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থ, মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী', ১৮৮৮-তে প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্যাবর্ত' নামক ভ্রমণকাহিনী, প্রফুল্লনলিনী দাসীর 'ষষ্ঠীবাঁটা' প্রহসন, ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসীর 'কবিতামালা' নামক কবিতাসংগ্রহ প্রভৃতি বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' বিনা নামে প্রকাশিত হলেও তাঁর কবি খ্যাতি তখন থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ভারতকুসুম' ও 'অশ্রুকণা', প্রসন্নময়ী দেবীর 'অশোকা' উপন্যাস, ১৮৯০ সালে মানকুমারী বসুর 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'আভাষ' নামক কাব্যগ্রন্থ, প্রমিলা নাগের 'প্রমীলা কাব্য, ১৮৯২ তে বিনয় কুমারী বসুর 'নির্ঝর', প্রমিলা নাগের 'তটিনী' কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'মীরাবাই' নাটক, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' ইত্যাদি বই প্রকাশ পায়।

১৮৯৩ সালে অর্থাৎ বাংলা ১৩০০ বঙ্গাব্দের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই মনোমোহিনী গুহের 'চারুগাথা' কাব্য, শতদলবাসিনী দেবীর 'বিধবা বঙ্গললনা', 'বনপ্রসূন' রচয়িত্রীর 'সফলস্বপ্ন' উপন্যাস।

এই সময় হিরন্ময়ী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলা দাসী, ইন্দিরা দেবী, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা বসু, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, বিনয়কুমারী বসু প্রভৃতি বহু লেখিকা বিভিন্ন মাসিকপত্রে নিয়মিত নানা বিষয়ে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখছিলেন।

স্বর্ণকুমারীদেবীর সমসাময়িক আরো বহু লেখিকার আবির্ভাব এইসময় দেখা যায় - সরোজকুমারী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, স্বর্ণলতা বসু, 'স্নেহলতা ও 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী কুসুমকুমারী দেবী প্রভৃতি অনেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর তিনজন প্রতিনিধিস্থানীয়া কবি এবং একজন উপন্যাস রচয়িত্রী ও সম্পাদিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হল । এঁরা হলেন—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী কামিনী রায় এবং

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ।

গিরীন্দ্রমোহিনী : বয়সের দিক দিয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এঁদের মধ্যে সবার বড় । গিরীন্দ্র মোহিনীর জন্ম ১৮৫৮ সালে কলকাতায়। পিতার নাম হারানচন্দ্র মিত্র। ১৮৬৮ সালে এক রক্ষণশীল পরিবারে দশ বছর বয়সে বিয়ে হয় । স্বামীর নাম নরেশচন্দ্র দত্ত। পিতা এবং স্বামীর কাছেই তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃত পড়ার দিকে, কবিতা লেখার দিকে এবং ছবি আকার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল প্রবল। পরবর্তীকালে এগুলির সকল ক্ষেত্রেই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে সেকালের বিখ্যাত 'সাবিত্রী-লাইব্রেরী' ছিল। 'জনৈক হিন্দুমহিলাব পত্রাবলী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা (১৮৭২)। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)। 'ভারত কুসুম', 'অশ্রুকণা', 'সন্যাসিনী', 'শিখ', 'অর্ঘ্য', 'সিন্ধুগাথা', 'স্বদেশিনী' প্রভৃতি তাঁর বইগুলিব মধ্যে ভাষার সারল্য ও ভাবমাধুর্য্য আজকের দিনে বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি তিনবছর 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। গদ্যে ও পদ্যে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' এর বাংলায় পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর থেকে গৃহকর্মের অবসরে সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। তাঁর লেখার নমুনা একটুখানি—

"মাটিতে নিকানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খোড়ো চালখানি ছাঁটা লতিয়া করলা লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান ।
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।"

মানকুমারী বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাইঝি ছিলেন মানকুমারী বসু । যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন । পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিধুশঙ্কর বসুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি প্রধানত বিয়োগ-বেদনা সঞ্জাত ।

বাংলাদেশে সর্বজনবিদিত মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। তাঁর আঁকা বাংলার পল্লীগ্রাম, তুলসীতলা, শিবপূজা প্রভৃতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিদিনের দেখা ছবিই দেখতে পাই। তিনি 'বামাবোধিনীর' লেখিকা শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সাহিত্য প্রতিভার জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু ভারত সরকারের বৃত্তি পান তিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক' এবং ১৯৪১ এ 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দানে সম্মানিত করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - 'প্রিয়প্রসঙ্গ', 'শুভসাধনা', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', 'পুরাতন ছবি', 'বাঙ্গালী রমণীদের গৃহধর্ম', 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য', 'বীরকুমার বধ' প্রভৃতি। ছোট গল্প রচনাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর রচিত 'রাজলক্ষ্মী', 'অদৃষ্টচক্র', 'শোভা' কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কাব্য সাহিত্য শাখার সভানেত্রী ছিলেন। তাঁর লেখার একটু নমুনা ঃ

"নমোদেব মহাদেব নমো রাঙ্গা পায়।
পোড়াহাড় ভস্মছাই, ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায় ....
এমন আপন ভোলা, এমন পরাণ খোলা,
এমন রজতগিরি শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথাও দেখিনি কেবল।"

শ্রীমতী কামিনী রায় ঃ উনিশশতকে মহিলা কবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁর নাম কামিনী রায়। পিতা চণ্ডীচরণ সেন বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং সাহিত্যিক ও সাব-জজ ছিলেন। বরিশাল জেলার বাসন্ডাগ্রামে ১৮৬৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। কবিতা লেখা শুরু করেন আট বছর বয়স থেকেই। শৈশবে পিতামহের নিকট কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতেই তাঁর কবিতার প্রতি আগ্রহ জন্মে। বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন ১৮৮৬ সালে এবং ঐ কলেজেই শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেন। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা অনার্স গ্রাজুয়েট। তাঁর শৈশব কাটে গ্রামে। সাত বছর বয়সে কলকাতায় এসে প্রগতিশীল সমাজের আবহাওয়ায় বড় হতে থাকেন। ত্রিশ বছর বয়সে সিভিলিয়ান কেদারনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।

'অম্বা', 'পৌরাণিকী', 'একলব্য', 'শ্রাদ্ধিকী', 'দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন', তাঁর প্রসিদ্ধ বই। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্বেতা' ও 'পুন্ডরীক' তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ -'দীপ ও ধূপ' 'জীবনপথে', 'নির্মাল্য', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'অশোকসঙ্গীত' প্রভৃতি। পুত্রশোকে রচিত তাঁর করুণরসের কবিতা - 'তোমার দেহের সাথে হলো ভস্মীভূত আমার অগণ্য আশা' প্রভৃতি।তাঁর আত্মবিলোপকারী প্রেমের কবিতাঃ

'হয় হোক প্রিয়তম, অনন্ত জীবন মম, অন্ধকারময়।
তোমার পথের পরে অনন্তকালের তরে আলো যদি রয়।'

প্রত্যেকটি কবিতাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর স্বদেশ প্রেমের কবিতার একটু নমুনাঃ

'যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিত তব কাজে।
ছোট খাটো দুঃখ সুখ কে হিসাব রাখে তার?
তুমি যবে চাহো কাজ মা আমার, মা আমার।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে সম্মানিত করেন (১৯২৯)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি (১৯৩২-৩৩) এবং নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্যা (১৯২২-২৩) ছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

'অন্তঃপুর' পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবীর জন্ম ১৮৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বর। পিতা প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী 'জীবনীকোষ' সম্পাদক শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার। বাড়ীতেই সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলাভাষা বিষয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি পিতার বিধবা আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। নিজেও সুমতি-সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজ সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্তঃপুর' নামে মাসিক পত্রিকার পরিচালনা ও

সম্পাদনা করেন। শুধু মহিলাদের লেখা দ্বারাই অন্তঃপুরের পাতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হত। সম্পাদিকা হিসাবে 'অন্তঃপুর' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তাঁর লেখা চার লাইন কবিতা থাকত। তাঁর রচিত কবিতা গ্রন্থের নাম 'বনজ'।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া (ইং ১৯০১) থেকে পুরুষ পরিচালিত পত্র-পত্রিকার মত মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় মহিলারা শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং জনমত গঠন ও নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে নিজেরা আরো অধিক উদ্যোগী হয়ে উঠেন। নিজেদের সুযোগসুবিধা ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য মহিলারা নিজেদের পরিচালনাধীনে পূর্বের তুলনায় অধিক বেশী পত্র-পত্রিকার সম্পাদনভার আপন হস্তে তুলে নেন এবং আরো অধিক সক্রিয়ভাবে শুধু মহিলা সমাজেরই নয়, পুরুষ সমাজেরও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত জনতার দরবারে আপন মতামত প্রকাশ করে সমাজের ও দেশের উন্নতি সাধনের জন্য অধিক তৎপরতার সঙ্গে লেখনী ধারণ করেন। এই সময়কার মহিলা পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) মুকুল ঃ 'মুকুল' নামের পত্রিকাখানি প্রথমে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (ইংরাজীর ১৮৯৫) প্রকাশ পায়।

'মুকুলের' প্রস্তাবনাটি ছিল বড়ই সুন্দর, উপভোগ্য ও মনোরম। প্রস্তাবনার মধ্যেই 'মুকুলে'র ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আশা ফুটে উঠেছে। প্রস্তাবনাটি এরূপ ঃ 'মুকুল' নামটি বেশ। মুকুল বলিলেই অনেক কথা মনে হয়। প্রথমে মনে হয় আশা। যাহা আজ মুকুলে আছে, কালি তাহা ফুটিবে। মুকুল আসিয়াছে, পশ্চাতে ফুল ও ফল আসিতেছে। এইজন্যই মুকুল দেখিলেই সকলের আনন্দ। মুকুল দেখিলেই বোঝা যায়, এ বৎসর ফলটা কেমন হইবে। যে বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আমের মুকুল জোরে হয়, লোকে বলিতে থাকে, — "ওঃ এবার আমটা যে আসবে, তা আর কি বলবো। এখন ঝড় বাদলে নষ্ট না করিলে হয়, অতএব মুকুলের সঙ্গে সঙ্গেই আশা। এই আশাটা একটা সামান্য জিনিষ নয়, জগতের বার আনা কাজ আশার উপরে চলিতেছে। দোকানদার দোকান খুলিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া আছে। আশা আছে যে বৎসরের শেষে অনেক লাভ হবে। ধনী ধন সঞ্চয় করিতেছেন, আশা আছে উত্তরকালে তাহার পরিবার পরিজন সুখে বাস করিবে।...... ।"

পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত প্রস্তাবনায় সম্পাদক

আরো লেখেন — " ...... আমরা মানব মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত হইবে, ... যাহাতে 'মুকুল' হাতে লইয়াই বালক-বালিকার প্রাণ সৌরভে আমোদিত হয়, যাহাতে তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসে, দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করে "বাঃ কি মজার কথা শিখিলাম ভাই" বলিয়া আনন্দ করে, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। এইজন্য গদ্য, হেঁয়ালি, কবিতা, চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইবে ।"

সত্যিই 'মুকুল' পত্র খানির পাতা খুললেই বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারেব চিত্রসহ নানা গল্প, কবিতা, উপদেশ, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি ও নানা রং বেরং এর বিভিন্ন সুদৃশ্য ছবি 'মুকুলে'র পাতা অলঙ্কৃত করত ।

'মুকুলের ২য় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ।ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের শিশু সাহিত্য কেন্দ্রিক মাসিক পত্রিকা ।ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি -বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বালক-বালিকাদের উপযোগী করে তোলাই ছিল এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করলে (১৩০৭ বঙ্গাব্দে) 'মুকুলে'র সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবীর উপর । চব্বিশ বছর চলে 'মুকুলের' প্রচার রহিত হয় । ২৩ শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪ (ইং মে ১৯১৮) বঙ্গাব্দ থেকে ২৪ শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (ইং জুলাই ১৯১৯) পর্যন্ত সম্পাদিকা হিসাবে লাবণ্য প্রভা সরকারের নাম বেঙ্গল-লাইব্রেরীর তালিকায় পাওয়া যায় ।

নব পর্যায়ের 'মুকুল' প্রকাশ পায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে । সম্পাদনার ভার ছিল শকুন্তলা দেবীর উপর। ৩য় বর্ষের 'মুকুল' বাসন্তী চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এর পরিচালনভার বাসন্তী চক্রবর্তীর উপর ন্যস্ত ছিল।

'মুকুলের' লেখকলেখিকা গোষ্ঠীতে ছিলেন ঃ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীমতী হেমলতা সরকার, শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস, শ্রীরমনীমোহন ঘোষ, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রভৃতি। এইসব লেখক লেখিকাদের রচনা 'মুকুলে'র পাতার গৌরব বর্ধন করেছিল। 'মুকুলে'র

পাতায় শিবনাথ শাস্ত্রীর বহু শিশুপাঠ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় ।

৮/৯ বছর বয়স থেকে ১৬/১৭ বছরের বালক-বালিকাদের কথা ভেবেই 'মুকুল' প্রকাশিত হয়েছিল । শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের মানসিক বিকাশ যাতে সুন্দররূপে বিকশিত হতে পারে মুকুলের লেখক লেখিকাদের সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ।

শ্রাবণ, ১৩০২, ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ পায় যে 'মুকুল' কাহাদের জন্য রচিত হয়েছিল ঃ " মুকুল সম্পূর্ণরূপে ছোট শিশুদের জন্য নহে । যাহাদের বয়স আট নয় হইতে ষোল সতের বৎসরের মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য । আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি । কিন্তু এই সকল বালক বালিকার একটা কর্তব্য আছে । তাহাদের বাটীতে যে সকল ছোট ছোট ভাইবোন আছে, তাহাদিগকে 'মুকুলে'র ছবি দেখাইয়া তাহার বিবরণ মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতে হইবে ।.....অনেকস্থলে পিতমাতাকেও এ কাজটা করিতে হইবে । তাঁহারা মনে করিবেন, 'মুকুল' তাঁহাদের কাজের সাহায্য করিবার জন্যই বাহির হইয়াছে। অনেক পিতামাতা হাতের কাছে দেখাইবার ও শুনাইবার মত কিছু একটা পান না বলিয়া ভাল করিয়া শিখাইতে পারেন না। 'মুকুল' সেই অভাব পূরণ করিবে ।.....বালক-বালিকাদের অভিভাবকগণ যদি এইরূপে আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন তাহা হইলে 'মুকুলে'র জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে।"

'মুকুল' কাদের জন্য তা এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়েছে। জনৈক লেখকের একটি কবিতা 'মুকুলে'র পৃষ্ঠাতে এইভাবে শোভাবর্ধন করেছিল ঃ—

'মুকুল'
এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?
যেমন সরল প্রাণ,
তেমনি তো তেজিয়ান,
স্বরগের হাসিমাখা সোনার পুতুল ?
হীরামনি দূরে ফেলে,
মুকুল লইছে তুলে,
বালক বালিকা সব হরষে আকুল ।

এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?
কি সুন্দর 'কালো ঘোড়া',
'নাসাবতী' হ'ল খোঁড়া,
মিথ্যাকথা অজিতার অনর্থের মূল
এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?
'সখের যাত্রার দল',
ছেলেদের কুতূহল,
'হাতকাটা মেয়েটির নাহি সমতুল,'
এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?
'কুমীরের অতিবুদ্ধি' কি মজা কি মজা,
'বুলবুল প্রজাপতি',
শিশুদের স্ফূর্ত্তি অতি,
উচ্চ আশে 'ফুলীবর' কত পেল সাজা ।
'মেরু প্রদেশেতে
শিক্ষা হল শিশুদের
ছোট বড় সাপ কত,
উঠিয়াছে অবিরত,
'এটা কি' দেখিয়া শিক্ষা বেড়ে গেল ঢের ।
অমৃত শরীরে মাখি,
সাহিত্য কাননে থাকি,
যে সুবাস ঢালিতেছ তুমিরে মুকুল ।
সে সুবাসে পুলকিত,
ছুটিতেছে অবিরত,
তোমার আশ্রম-ভূমে শিষ্য অলিকুল,
এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?

'মুকুল' পত্রিকাখানি যে শিশুদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবেই সার্থক হয়েছিল, তা বোঝা যায় 'মুকুল' প্রকাশের অতি অল্পকালের মধ্যেই তার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে । শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যার হস্তেও 'মুকুলের' গৌরব কিছু মাত্র ক্ষুন্ন না হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং দিন দিন তার পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হয়েছিল। বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে 'মুকুল' সার্থকতার পথেই অগ্রসর হয়েছিল।

(২) 'ভারতমহিলা' ঃ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (ইংরাজীর ১৯০৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর) 'ভারত মহিলা' প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী সরযূবালা দত্ত এর সম্পাদিকা ছিলেন। এখানি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা প্রথম সংখ্যায় এরূপ লেখেন ঃ- "এ দেশের নারীজাতির কল্যাণকল্পে সুপরিচালিত একখানি মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শিল্প বিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দন্ডায়মান না হইলে, পুরুষশক্তি কখনও সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গিনীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত বিহঙ্গের ন্যায়, এদেশের পুরুষেরাও সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইতেছেন। নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্ম্মের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য 'ভারতমহিলা'র জন্ম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ভারতমহিলা' এদেশ ও বিদেশের চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণীগণের নারীজাতির উন্নতি বিধায়ক চিন্তার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উন্নতি সাধক অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইবে।"

সাহিত্যসেবা ছাড়াও এই পত্রিকা নারীজাতির উন্নতির জন্য দেশ ও বিদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নারী জাতির উন্নতি বিষয়ক নানাবিধ কর্মপন্থা এবং নারীজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির উন্নতি বিষয়ক নানা আলোচনা এই পত্রিকার শোভাবর্ধনে সহায়তা করত। সমাজের সকল স্তরের মহিলারাই যাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পান তার জন্য বিভিন্ন ধরণের যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্রতকথা, মহীয়সী মহিলাদের জীবন কাহিনী সম্বলিত প্রবন্ধ প্রভৃতি পত্রিকার পাতায় আলোচিত হত। নারীজাতির মধ্যে স্বদেশী ভাবধারা প্রচারের জন্য জাতীয় ভাবোদ্দীপক বিভিন্ন ধরণের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি এই পত্রিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করত।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা', কুমুদিনী মিত্রের 'মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে মহিলাগণের কর্তব্য', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্বরলিপিসহ রবীন্দ্রনাথের

'সোনার বাংলা' গান—এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । অন্যান্য আরো বহু খ্যাতনামা লেখক লেখিকা—যেমন, প্রিয়ংবদা দেবী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাকান্ত রায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতির লেখা দ্বারাও এই পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেত। প্রতি সংখ্যায় মহিয়সী মহিলার চিত্র যেমন থাকত, তেমনি প্রতি সংখ্যার আখ্যাপৃষ্ঠায় সংস্কৃত শ্লোক এবং তার নীচে Tennyson-এর কবিতার কয়েকছত্র দৃষ্ট হত : *"The woman's cause is the man's, they rise or sink Together, dwarfed or God like, bond or free; If she be small, slight-natured, miserable, How shall men grow ?"*

'ভারতমহিলা' প্রথম কয়েক বৎসর সগৌরবেই চলেছিল। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সেই এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

(৩) **'জাহ্নবী' :** 'জাহ্নবী' পত্রিকাখানি ১৩১১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে আত্মপ্রকাশ করে। এর সম্পাদক ছিলেন প্রথমে নলিনীরঞ্জন পন্ডিত । এখানি মাসিক পত্রিকা। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস (৩য় বর্ষ) থেকে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে 'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উপর । পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় গিরীন্দ্রমোহিনী লেখেন ..... 'জাহ্নবী'র উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা যে নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে । এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবশ্যক, 'জাহ্নবী' তাহারই প্রার্থিনী । মুখ্যতঃ নিষ্পিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্ম্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবন-ব্রত ।

"এখন বাঙ্গলা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সময়ে সময়ে হৃদয়ে সত্যই নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয় । আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে আমাদের মাতৃভাষা - বঙ্গভাষা দীনা ? মাসিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি যোগ্যতম হস্তে পরিচালিত হইয়া জাতীয় জীবন ও জাতীয় ভাবের উন্নতি সাধন করিতেছে । তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্যতম জাহ্নবীর যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে বা হয়, তবে তাহা জাহ্নবীর পূর্ব্ব সম্পাদকের দ্বারাই হইয়াছে ও হইবে , আমি উপলক্ষ মাত্র।

"যে সকল সুলেখক ও লেখিকারা জাহ্নবীকে স্নেহচক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আনুকূল্যই যে জাহ্নবীর নির্ভর ও গৌরব তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ।"

বৎসরের শুরুতে 'সূচনা' লেখার প্রথা আছে । সেই প্রথা অনুযায়ী 'সূচনাপর্বে' সম্পাদিকা লেখেন :- "বর্ষারম্ভে সূচনা লিখিবার প্রথা আছে, কিন্তু

আমি আর কি সূচনা লিখিব ? সে ত অনেকদিন হইয়া গিয়াছে । যখন দ্বারে পাউরুটী বিস্কুট বিক্রয় করিতে আসিলে দুই বৎসরের শিশু আধ আধ ভাষায় বলিয়াছে "স্বদেশী খাব", যখন বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে সুখলালিত তরুণ যুবক স্বদেশী পরিধেয় বসনের মোট মাতৃ-আশীর্ব্বাদের মত মাথায় বহিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছেন; যখন উলকার্পেট নিক্ষেপ করিয়া বঙ্গীয় ভগিনীদের কোমল করপল্লব চরকার ঘর্ঘরে বিন্যস্ত হইয়াছে, তখনই কি সূচনা হয় নাই? যখন ধনকুবের ভ্রাতারা আপনা ভুলিয়া স্মিতহাস্যে দীনের হস্ত ধরিয়াছেন, যখন পন্ডিত মূর্খকে ক্রোড়ে লইয়া 'ভাই' বলিয়া আদর করিয়াছেন; যখন মসী-যুদ্ধ-ক্লান্ত কেরাণীকুল এককথায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন; সূচনা তখনই হইয়া গিয়াছে। অতএব নূতন করিয়া সূচনা আর কি লিখিব ? এখন মা, তোমার ঐ অপ্রতিহত গতিই আজ ভারতের শিক্ষণীয়, প্রার্থনীয়। ভীষ্মজননী, পাছে সেই অভিশপ্ত অষ্টবসু - তোমার সেই বরেণ্য সন্তানগুলি মর্ত্ত্য সংস্পর্শে কলুষিত হয়, সেই আশঙ্কার অনুরোধে তুমি একদিন নিজে স্বহস্তে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছিলে । আজ মা, তোমার সে সাহস - সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? জীবনদাত্রি, তোমার যে অমৃত-স্পর্শে শব-ভস্মে জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে সঞ্জীবনী-শক্তি আজ কোথায় ? ছিঃ মা, আট কোটী সন্তান তোমার তীরে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে, তুমি দেখিতেছ । জননী, তবে তোমার ওই পূতনীরে আর কি সেই পাবনী শক্তি নাই? যদি না থাকে, তবে যাও মা, তোমার সেই তুহিন শিখরাবাসে ফিরিয়া যাও, বঙ্গ আজ মুক্তিশক্তির ভিখারী " ।

সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিরীন্দ্রমোহিনী 'জাহ্নবী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিবেদনে তিনি লেখেন, "........ অনন্তকাল যে পথে ছুটিতেছে, রবিশশীতারা যে পথে ছুটিতেছে, গ্রহ-উপগ্রহ যে পথে ছুটিতেছে, সেই নির্দিষ্ট কি অনির্দিষ্ট পথে ক্ষুদ্র আমিও ছুটিতে চাই। গঙ্গে, তোমার বক্ষে কতশত আশাভরা তরণী নিত্য ভাসিয়া যাইতেছে, কেহ জ্ঞানের, কেহ মানের, কেহ ধনের, কেহ ধর্ম্মের, কেহ বা কেবল অধর্ম্মের বাণিজ্য লইয়া উন্মত্ত ।

হায়, কোথায় তিনি, যিনি কেবল প্রেমের বাণিজ্যে তরী ভাসাইয়া ছিলেন। সেই — "পহিলহি মাঘ গৌরবর নাগর"— দুঃখসাগরে সকলকে নিক্ষেপ করিয়া যামিনী-শেষ ত্রিযাম রজনীতে শয্যাত্যাগ করিয়া যিনি জগতে প্রেমের বাণিজ্যে তোমার বক্ষে তরণী ভাসাইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন — নদীয়া করিয়া আন্ধিয়ারী"।

হায় মা, তেমন রত্ন আর কি পাওয়া যায় না ? সেই পতিতে অঘৃণা,

নিষ্ঠুরে করুণা, প্রেমে উন্মাদ, ভাবের সাগর, অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তিমান মোহনমন্ত্র স্বরূপ ধর্ম্মবীর তোমার বিশাল তট-ভূমিতে এখনকি একেবারেই দুস্প্রাপ্য?

পুণ্যসলিলে, দেখিস্ মা, শুভ পুণ্যাহ বৈশাখে নববর্ষে তোমার বক্ষে আশা-ভরা তরীখানি লইয়া চলিলাম, যেন নিরাশ করিস্ না মা।"

১৩১৪-১৬ এই তিন বৎসর গিরীন্দ্রমোহিনী সুষ্ঠুভাবেই পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'জাহ্নবীর' আয়ু ফুরিয়ে আসে।

(৪) সুপ্রভাত : স্বদেশী আন্দোলনের পট ভূমিকায় মাতৃভূমির সেবাকল্পে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শ্রবণমাসে (ইংরাজীর ১৯০৭ সালের ২৭শে জুলাই) 'সুপ্রভাত' পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করে। এর সম্পাদিকা ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু)। এখানি সচিত্র মাসিকপত্রিকা।

'সুপ্রভাতের' কণ্ঠে এই কবিতাটি শোভা পেত :

"সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে,
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।"

স্বদেশী ভাবোদ্দীপক নানা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও নারী সমাজের উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন রচনা এই পত্রিকার পাতা অলঙ্কৃত করত। মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সুপ্রভাত' অতি উচ্চমানের অধিকারী ছিল।

লেখকগোষ্ঠীতে তৎকালীন বহু খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নী লেখক লেখিকা ছিলেন। এঁরা হলেন - শ্রীমতী মানকুমারী বসু, প্রমথ চৌধুরী, নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ ঘোষ, অবলা বসু, অনুরূপা দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভগিনী নিবেদিতা, নির্ঝরিণী ঘোষ, আমোদিনী ঘোষ প্রমুখ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীশক্তি' ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নারীশক্তির' সমালোচনা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলপাকা বৃত্তান্ত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা।

বিভিন্ন রচনার সমর্থনে যেমন চিত্র থাকত, তেমনি বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিদের চিত্রও এই পত্রিকায় মুদ্রিত হত। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকীর দুর্লভ চিত্র এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। প্রতি সংখ্যার প্রারম্ভিক পৃষ্ঠায় এক এক বছরে এক একটি কবিতার চরণ স্থান পেত। ২য় বর্ষের কবিতার চরণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত :-

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে

ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর ।"

৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যায়, শ্রাবণ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, 'সুপ্রভাতের' জন্মদিন উপলক্ষে ১ম পাতায় লিখিত হয়েছে—"যাঁহার অনন্ত করুণায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, অন্ধ চক্ষু পায়, বধির শ্রবণশক্তি লাভ করে, সেই সর্বমঙ্গলময়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় প্রভুর চরণে আজ 'সুপ্রভাতের' জন্মদিনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এবং কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণত হই । তিনিই গত বৎসরের বিঘ্নবিপত্তির ভীষণ ঝটিকা-বর্ত্তের মধ্য দিয়া ইহাকে ৩য় বর্ষে উপনীত করিলেন ।

"আপদের পর্বতভরে প্রাণ যখন অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্দ্দিনের বিপদরাশি যখন চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাঁহারই মঙ্গলহস্ত অন্তরীক্ষে থাকিয়া অভয়াশীষ প্রদান করিয়াছিল। দুর্দ্দিনের কাল মেঘের মধ্যেও তিনি প্রভাত সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মি প্রতিভাত করিলেন । দারুণ ঝঞ্ঝাবাতের দিনেও যাহাদের অনুগ্রহ অটল থাকিয়া এই অসহায় শিশুর পরিপোষণে সহায়তা করিয়াছে, আজ 'সুপ্রভাতের' জন্মদিনে সেই হিতৈষী সুহৃদবর্গকে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। তাঁহাদের অনুকম্পার মধ্যদিয়া সেই নিখিল ব্রহ্মান্ডাধিপতিরই পরিচয় লাভ করিয়াছি।

"আজ আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি সন্তাপিত, নিগ্রহ বিড়ম্বিত, তদুপরি নানাপ্রকার বিপদপাতে জর্জ্জরিত। বিপত্তির দিনে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সত্যপথে অবিচলিত থাকা দুরূহ । কিন্তু কর্ম্মে সহায়তা লাভ করিতে হইলে সম্মুখস্থিত বাধাবিঘ্ন দলন করিয়া যাইতে হয় । নতুবা বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া অর্দ্ধপথে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলে সে কর্ম্ম নিষ্ফলই হইয়া যায়। কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া কেহ কোনকালে কোন বিষয়েই জয়ী হইতে পারে নাই। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন । আজ আমাদের সম্মুখে বিপদ উপস্থিত বলিয়া, আমাদের মস্তকে দন্ড পড়িয়াছে বলিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী । যাত্রা যখন শুরু হইয়াছে তখন আর বাতাস ছুটিলে ও তুফান উঠিলেও ফিরিবার উপায় নাই । কারণ ফিরিলে মৃত্যু নিশ্চিত। জগতের মধ্যে উন্নত জাতিরূপে দন্ডায়মান হইতে হইলে আত্মশক্তির আশ্রয় লইয়া কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হইতেহইবে । ...... জন্মভূমিকে শ্রীসম্পদশালিনী করিতে হইলে,

"এইসব মূঢ় ম্লান মুখে

দিতে হবে ভাষা,
এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ।
ডাকিয়া বলিতে হবে —
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ।"

এই সব ব্রত সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক ভাই, প্রত্যেক ভগিনীকে সত্যপথে অবিচলিত থাকিয়া নির্ভয় অন্তরে, মুক্ত প্রাণে, শৌর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদের বাক্য, কার্য্য, পণ যেন সত্য হয় ।

" গতবর্ষের কণ্টক সমাকীর্ণ পথের ন্যায় আগামী বর্ষও আমাদিগের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হইবে কিনা তাহা বিশ্ব বিধাতারই পরিজ্ঞাত ।....... সেই ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অপরাজিত চিত্তে তঁহারই ইচ্ছা শিরোধার্য্য করিয়া যেন কর্ত্তব্য পথে চলিয়া যাইতে পারি ।

দুঃখের মুর্ম্মুর দহনে দগ্ধ হইয়াও ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তঁহারই চরণে লুটাইয়া যেন বলিতে পারি —

"যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি দন্ড সহিতে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয় ।"

'সুপ্রভাত' দেশসেবার কার্য্যে নিয়োজিত হয়ে নির্ভিকভাবে আপন কর্তব্য সমাধা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে 'সুপ্রভাত' সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল। মাতৃভূমির পরাধীনতা ও দুঃখদুর্দশায় ব্যথিত হয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর দুঃখ মোচনের জন্য, অসহায়, নিপীড়িত, নিরাশ্রয়, নানাপ্রকার বিপদে জর্জরিত অসংখ্য দেশবাসীর দুঃখ মোচনের জন্য এবং বিপদে তারা যাতে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে তারজন্য কোটি কোটি ভাইভগিনীর পাশে দাড়িয়ে অভয়মন্ত্রে দেশবাসীকে সাহস জোগাতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল। নয় বৎসর যোগ্যতার সহিত চলবার পর এর অবলুপ্তি ঘটে।

(৫) 'গৃহলক্ষ্মী' : 'গৃহলক্ষ্মী' পত্রিকাখানি শান্তিময়ী সেনের সম্পাদনায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে (ইংরাজীর ১৯০৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর) প্রকাশ পায়। এখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা।

মহিলা-সম্পাদিত এবং মহিলাদের জন্যই এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব হয়েছিল । মহিলাগণের নানাবিধ সমস্যা ও মহিলাদের শিক্ষণীয় বিবিধ বিষয় এর পাতায় স্থান পেত । মহামায়া গুপ্তার স্ত্রী-শিক্ষা, সরোজিনী দেবীর 'দয়ানন্দভারতী', সুশীলাসুন্দরী দেবীর 'আদর্শ গৃহিণী' ইত্যাদি লেখা 'গৃহলক্ষ্মী'র পাতার শোভা বৃদ্ধি করত । কবিতায় জোয়ান অব আর্ক স্মরণে 'অমর মরণ' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । 'গোটা কতক কথা' প্রসঙ্গে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে আলোচনা, গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধও এতে থাকত। পত্রিকাখানি সম্ভবতঃ ২য় বর্ষেই লুপ্ত হয় ।

(৬) 'ভারতলক্ষ্মী' : 'ভারতলক্ষ্মী' নামের পত্রিকাখানি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (ইংরাজীর ১৯১১ সনের ২৭ শে মার্চ) আত্মপ্রকাশ করে । এখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা । এই পত্রিকাখানিও মহিলাদের মঙ্গলের নিমিত্ত যোগমায়া মাতাজীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির পরমায়ু সম্ভবতঃ নিতান্তই অল্প ছিল । কারণ এই পত্রিকার আর কোন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়নি ।

(৭) 'মাহিষ্য মহিলা' : 'মাহিষ্য মহিলা' পত্রিকাখানি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে উদয়পুর শান্তিনিকেতন (নদীয়া) থেকে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত । এ পত্রিকাখানি মাহিষ্য সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ছিল।

সম্পাদিকার 'মাহিষ্য মহিলাদের উদ্দেশ্য আবেদন' - এর মুখবন্ধে বলা হয়েছে : "মাহিষ্য সমাজের অসার দেহে শক্তি সঞ্চারণ করিবার নিমিত্তই ইহার আবির্ভাব । ইহাতে রমণীগণের কর্ত্তব্য, শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, সন্তান প্রতিপালন, গুরুজনের প্রতি ব্যবহার, রন্ধন প্রণালী, মুষ্টি যোগ, মহাভারতীয় নীতিকথা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীধর্ম সংগৃহীত হইয়া বিশদভাবে আলোচিত হইবে।"

১ম সংখ্যায় শরৎকুমারী দেবীর 'গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বীর কর্তব্য', এবং ২য় সংখ্যায় 'মাহিষ্য মহিলাগণের উপাধি' উল্লেখযোগ্য রচনা । গিরিবালা দেবী ও আরো অনেকেই এতে লিখতেন । এই পত্রিকায় মাহিষ্য সমাজের বহু তথ্য এবং মাহিষ্য মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহু বিষয় আলোচিত হয়েছিল। আখ্যাপত্রে চাণক্যের এই শ্লোকটি শোভা পেত :

"মাতা শত্রু, পিতা বৈরী যেন বালেন পঠিত

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়াতু যত্নতঃ ।"

'মাহিষ্য মহিলা' অন্যান্য আরো বহু পত্রিকার মত দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয়নি। অনিয়মিত ভাবে চার পাঁচ বৎসর জীবিত থাকার পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

'মাহিষ্য মহিলা'র পাতায় নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ স্থান পেত । যেমন, মহিলাদের সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করার উপায়, শ্রীকৃষ্ণোক্ত পতিব্রতা ধর্ম্ম, স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, স্বামীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ, অতিথিসেবা, সন্তান পালনে জননীর জ্ঞাতব্য বিষয়, মহাভারতীয় নীতিকথা, নব-বিবাহিতা বালিকার প্রতি উপদেশ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখা 'মাহিষ্য মহিলা'র পাতার গৌরব বৃদ্ধি করত ।

(৮) 'প্রেম ও জীবন' ঃ 'প্রেম ও জীবন' পত্রিকাখানি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে (ইংরাজীর ১৯১২ সালের ১০ই আগষ্ট) প্রকাশ পায়। হেমলতা দেবী এর সম্পাদনা করতেন ।এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৯ নং ঈশ্বর মিত্র লেন, কলিকাতা, থেকে প্রকাশিত হয়।

(৯) 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' ঃ সঙ্গীত শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে, ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে এটি প্রকাশিত হয় । প্রতিভাদেবী এবং ইন্দিরা দেবী যুগ্ম ভাবে এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব বহন করতেন । মাত্র আট বৎসর ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত চলবার পর এর দায়িত্ব পড়ে আশুতোষ চৌধুরীর উপর। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল ঃ "আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ আর্য্য সঙ্গীতের চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে দুই একটি সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির দ্বারা সঙ্গীতের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য 'সঙ্গীতসঙ্ঘ' নামে একটি শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছি। যাহাতে সঙ্গীতে ও যন্ত্রাদি বাদনে বালক বালিকাগণকে যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া আর্য্য সঙ্গীতের শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয় তাহার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতের অনেক তত্ত্ব ও অনেক যন্ত্রাদি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে ।এমন সময় কাল পড়িতেছে যে মনে হয় বুঝি বা অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে আর্য্যসঙ্গীত ও আর্য্য যন্ত্রাদি

লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিদেশী সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি অধিকার করিয়া বসিবে। বালক বালিকাগণই আমাদের ভবিষ্যতে আশার স্থল । যাহাতে সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশ বিদেশে উহার পথ প্রসারিত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে ।........ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্প পূর্ণ করুন এই প্রার্থনা।"

"সহজে গান শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে একটি সঙ্গীত পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ইহার নাম 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই স্বরলিপি শিক্ষা করিয়া গানগুলিকে সহজে নিজের আয়ত্ত্বে আনা। এখন অনেকে নানা প্রণালীতে নিজের সুবিধামত স্বরলিপি বাহির করিয়া গানগুলি বিধিবদ্ধ করিতেছেন।আমাদের দেশের গানগুলি কত রকমে লোপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এবং যাহাতে এগুলি স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব সুখের বিষয়। খালি তো গানের শব্দ প্রয়োগে গান গাইতে পারা যায় না। সুর তাল লয়ে শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কণ্ঠস্বরে বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আমি বলিতে চাই, নানা প্রণালীতে সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহজ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা সহজে লোকের যাহাতে বোধগম্য হয় এমন উপায় এবং যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আমাদের মতে অবলম্বন করা উচিত। সঙ্গীত প্রকাশিকা নামে একটি সঙ্গীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান আমার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে এতদিন লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচি বাস করায় এবং আরও অন্যান্য কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে এতবড় কাজের জন্য কেহ সহানুভূতি দেখান নাই, কত উদার স্বভাবাপন্ন মহানুভব কত ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মারা আছেন তাঁহারা অনায়াসে অর্থের সাহায্য করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন । তাঁহাদের কত সময়ে কত কাজে বৃথা অর্থব্যয় হয়। এইরূপ একটি কাগজের আজকাল যে কত দরকার হইয়াছে ইহা অবশ্য সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এইজন্য ইহা সর্বসাধারণের নিকট এত আদরের বস্তু হয় নাই। যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, যাঁহারা সঙ্গীত প্রিয়, তাহাদের কাছে আমাদের এই নিবেদন, নিজেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক হইয়া এবং অনেক গ্রাহক করাইয়া ইহার সাহায্য

করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিয়াই যেন ইহার শেষ না হয় এবং বৃথা বাক্যব্যয় না হয় এই আমাদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং সকলের কাছে আমাদের অনুনয়।

আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সকলে অনুগ্রহ করিয়া ইহা চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহজ উপায়ে এই স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে গান শিক্ষা করা যায়। সঙ্গীত সংঙ্ঘে যত গান হিন্দুস্থানী এবং ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে । এবং অন্যান্য সঙ্গীতও প্রকাশিত হইবে। শুনিয়া সকলে সুখী হইবেন যে অনেক শিক্ষক এবং জনসাধারণ ইহাতে গান প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে এই পত্রিকা পরিস্ফুট হইবার অনেক উপায় হইবে আশা হয়।"....

"সঙ্গীত যে কাহাকে বলে তাহার উপক্রমনিকা খুব সংক্ষেপে বলিয়া সহজে গান শিক্ষার স্বরলিপি প্রণালী এই পত্রিকাতে দেখাইয়া দেওয়া হইবে । সঙ্গীত কাহাকে বলে তাহা বোধকরি বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। আমার বোধ হয় গান মানুষের স্বাভাবিক,.......সঙ্গীত সকল কলাবিদ্যার আদি বলিতে হইবে ।...... গান গাহিয়া পরকে সুখী করা ও নিজে সুখ পাওয়া ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি হইতে পারে? আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাল গলা (কণ্ঠস্বর) আছে, অনেকের ভাল করিয়া গান গাহিবার ক্ষমতা আছে এবং গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভাল গানের পুঁজি যাহাতে আরো বাড়ে আমাদের এই ইচ্ছা। এইজন্য লিখিয়া সহজে গান শিখিবার একটি উপায় অবলম্বন করা গিয়াছে। যে প্রণালীতে যে স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' এত দিন প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা গান ও সেতারের গতের সুর লিখিয়া পাঠকদিগের শিক্ষার জন্য সেই প্রণালীতে স্বরলিপি প্রকাশ করিব । ইহার প্রথম সূত্রপাতে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাহির করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। ইহার সহজ সঙ্কেত একবার শিখিয়া লইলে গান শিক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে"।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, শ্রীমতী অশোকা দেবী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত, সঙ্গীত সঙ্ঘের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাও, শ্রীমতী সুনীতি মজুমদার প্রমুখ স্বরলিপি তৈরী করেছেন। সুর ও কথা দিয়েছেন অনেকেই।

১ম সংখ্যায় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'বেদগানের' স্বরলিপি, প্রতিভাদেবীর 'সরস্বতী' বন্দনার স্বরলিপি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের 'পারমার্থিক' গানের স্বরলিপি অন্যতম। আ-কার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি ও তাহার চিহ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা প্রতি সংখ্যার প্রথমে দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববিধাতার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য যত রকমের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে, সঙ্গীত চর্চাই মনে হয় তার মধ্যে সর্বপ্রধান । এমন নির্মল বিশুদ্ধ আমোদ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না । Dryden সঙ্গীতকে 'Heavenly Maid' 'স্বর্গীয়া কন্যা' এই আখ্যায় বিভূষিত করেছেন । জগতের আদি কবি বলিয়াছেন : *"From harmony, from heavenly harmony This universal frame began"*

এ সম্বন্ধে অপর এক মহাপুরুষের মন্তব্য :

"Music plays the most important part in the social life from very remote times. . . . . . Every person of refined taste who can afford to spare a few hours for leisure, should do something, however small, for the cultivation of music."

তবে অসংযত আমোদও ভাল নয় । জীবনধারণের জন্য পরিমিত খাদ্য যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি পরিমিত আমোদও মানুষের মনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে ।

(১০) "নবপর্য্যায়ের পরিচারিকা" : (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)

(১১) "আন্নেসা" : "আন্নেসা" নামের পত্রিকাখানির আবির্ভাব ঘটে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে । এখানি মাসিকপত্রিকা । এর সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সফিয়া খাতুন । নারীর কল্যাণ সাধনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । 'আন্নেসা' 'মোহম্মদ আবদুর রসিদ সিদ্দিকী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত হত।'

(১২) "বাঙ্গলার কথা" : 'বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র' 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকাখানি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৪ আশ্বিন, শুক্রবার (ইংরাজীর ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২১) প্রকাশিত হয় । এর সম্পাদনা করতেন প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ।

১ম সংখ্যায় 'বাঙ্গলার কথা' প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছিলেন, " আমাদের দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের

দেশের সকলদিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাব-ধর্ম্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।.....

"আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গালার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র- প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায় - সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

চিত্তরঞ্জন দাস কারাবরণ করলে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী ১২শ সংখ্যা (২৩শে ডিসেম্বর ১৯২১) থেকে 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকাখানির সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাখানির আদর্শ ও সাহিত্যিক মূল্য ছিল অতি উচ্চস্তরের। এতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন—'শিক্ষার বিরোধ', 'স্বরাজ সাধনায় নারী', 'সত্য ও মিথ্যা', 'মহাত্মাজী' প্রভৃতি এর মধ্যে অন্যতম।

(১৩) 'নব্যভারত' ঃ 'নব্যভারত' পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইংরাজীর ১৮৮৩)। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নর আকস্মিক মৃত্যু হলে তৎপুত্র প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে একই বৎসরের মধ্যে প্রভাতকুসুমেরও মৃত্যু হয় (১২ ভাদ্র, ১৩২৮)। ১৩২৮ বঙ্গাব্দ আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যা থেকে তৎপত্নী ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী 'নব্যভারত'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নিজ হস্তে তুলে নেন

'নব্যভারত' পত্রিকাখানি ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশ পেত। 'নব্যভারতে'র পাতা যাঁদের রচনা দ্বারা পল্লবিত হয়েছিল তাঁদের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস', সত্যদেবের 'আমেরিকায়', শ্রীশিবরতন মিত্রের 'জাতীয় কবি গোবিন্দদাস', বিনয়

কুমার সরকারের 'সেকালের রাইয়ত', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' ও 'চীন ও জাপানে ভারতের বাণী', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'মাধবদর্শন', প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর খাদ্যবিচার' ও 'তরলবায়ু', অনাথনাথ বসুর 'হিন্দী সাহিত্য', সমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতার স্বরূপ', কামিনী রায়ের 'অনন্ত আশ্রয়', শ্যামমোহিনী দেবীর 'নারীর কর্ত্তব্য', বিপিনচন্দ্র পালের 'যুগসমস্যা', ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাইবেল ও বৈষ্ণবধর্ম' প্রভৃতি রচনা দ্বারা 'নব্যভারতে'র কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (৪৩শ বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

(১৪) **'শ্রেয়সী'** ঃ 'শ্রেয়সী' পত্রিকাখানি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতন থেকে আত্মপ্রকাশ করে। এর সম্পাদিকা ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর পত্নী কিরণবালা সেন। 'শ্রেয়সী'র শীর্ষদেশে এই লাইন কটি শোভা পেত ঃ—

"নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত লব শিক্ষা।"

কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ সহ পত্রিকার কণ্ঠে মুদ্রিত হত ঃ—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরিত্য বিধিনক্তি্থীনাঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেহর্থাৎ য উ শ্রেয়োরণীতে।।"

"শ্রেয় প্রেয় সবাইকে পায়;
দেখে' বেছে' বেছে ন্যায় যে যেটা চায়।।
যে ন্যায় শ্রেয় — সে পায় কুল।
যে ন্যায় প্রেয় — খোয়ায় মূল।।"

কঠোপনিষদ্, ১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ২য় শ্লোক।

সূচনাতে সম্পাদিকা কিরণবালা এরূপ লেখেন ঃ "এই পত্রিকাখানির নাম অনেকেরই ভালভাবে জানা আছে। এই নামটি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীমতি হেমলতা দেবীর উদ্যোগে ছোট মেয়েদের একটি সাহিত্য সভা ছিল। সে সভার ছোট মেয়েদের লেখা এবং বড় মেয়েদেরও কিছু কিছু লেখা লইয়া ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'শ্রেয়সী' প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকদিন এই পত্রিকাখানি বাহির হয় নাই। এতদিন পরে 'শ্রেয়সী' নূতন করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে। আগাগোড়া নিত্যনিয়ত আপনাকে সজীব সতেজ রাখা অল্প সাধনার কথা নয়। যে সব কাগজ চিরদিন নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আপন অপরিমিত জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে তাহাদের মত সৌভাগ্য ও সামর্থ্য ইহার নাই। তেমন কীর্ত্তি ও যশ দাবী না করিয়াই ইহা বাহির হইতেছে।

কতক গাছ আছে যাহাদের পাতা সারা বৎসর নবীন ও সবুজ থাকে। আবার এমন অনেক গাছও আছে যাহা দুর্দ্দিনে সব ফুল ফল পাতা ঝরাইয়া দিয়া দুর্ভাগ্য প্রাণহীনের মত কোনমতে দিন কাটায়। অকস্মাৎ বসন্তের বায়ুতে নূতন প্রাণের স্পর্শে তাহার জীবনের পরিচয়টুকু দিয়া নবজীবনের দেবতাকে প্রণামটি করিয়া লয়। আমাদের এই পত্রিকাটি আজিকার শুভদিনের প্রাণপ্রদ সমীরণে পুনরুজ্জীবিত হইয়া নবজীবনের দেবতাকে আপনার প্রণামটুকু জানাইতেছে। ধনীর গৃহের মত ঐশ্বর্য্য বা আরম্ভর প্রকাশ করিবার মত ভাগ্যও ইহার নাই। রাজপুরীতে যেদিন দীপাবলীর মহোৎসবে নানা মহামূল্য ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিতেছে, আতসবাজীর ধুমধাম চলিতেছে, সেদিন পল্লীবধূ সন্ধ্যায় শুভ মুহূর্ত্তে আপন সামান্য মাটির ক্ষুদ্র কল্যাণ-দীপখানি দেবমন্দিরের দ্বারে বা তুলসী মঞ্চের নীচে বা নদীর তীরে রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া সকলের কল্যাণে ভূমিনত প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার লগ্নটি পবিত্র করেন। সারারাত্রি জ্বাল্যইয়া রাখিবার মত তৈলসমৃদ্ধিও হয়ত তাঁর নাই তবু সকলের চিরকল্যাণের জন্য প্রণাম করিবার মত ভক্তি তাঁর আছে। এই যে সকলের শ্রেয়োবৃদ্ধির প্রার্থনা-এই শ্রেয়সীর সম্বল। বাহিরের সমৃদ্ধি যতই কম হউক ইহার অন্তরের কল্যাণ কামনা কাহারও অপেক্ষা কম নহে, তাই প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত সব অবস্থাতেই সকলের জন্য ইহার কল্যাণ প্রার্থনাটুকু অব্যাহত আছে ও থাকবে।...........

নববর্ষের প্রথম পুণ্যদিনে আবার এই শুভ কামনা লইয়া শ্রেয়সী আপন কর্ত্তব্যে হাত দিল। এই শুভদিনে সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। সকলের সম্মিলিত শুভ ইচ্ছা ও বিধাতার আশীর্ব্বাদই ইহার একমাত্র সম্বল। এই পাথেয়ের বলে ইহাকে নানা অসুবিধার মধ্যে চলিতে হইবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষিত হউক। ইহার ঐশ্বর্য্য, গৌরব ও শোভা যতই ক্ষীণ হউক না কেন ইহার সঙ্কল্প যেন কখনও

ক্ষীণ না হয়। দৈন্যে কখনও লজ্জিত না হইয়াও কল্যাণ ও সেবার নিত্য জাগ্রত থাকিবার মত শক্তি ইহার থাকে মঙ্গলময়ের কাছে ইহাই প্রার্থনা।—শ্রীকিরণবালা সেন।"

প্রধানতঃ শান্তিনিকেতনবাসিনী মহিলাদের রচনা দ্বারাই 'শ্রেয়সী'র পাতা সাজানো হত। 'শ্রেয়সী'র পাতা যাঁদের লেখা দ্বারা সমৃদ্ধ হত তাঁরা হলেন — শ্রী প্রিয়ংবদা দেবী, শ্রীমালতী সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসুধা দেবী, শ্রীবিনয়িনী দেবী, শ্রীপারুল দেবী, শ্রীশান্তা দেবী, শ্রীকিরণবালা সেন, শ্রীসুধাময়ী দেবী, শ্রীমাধুরী দেবী, শ্রীবাসন্তী দেবী, শ্রীআশা দেবী, শ্রীকুমুদকামিনী দেবী, শ্রীলীলা দেবী, শ্রীসোনামাখা দেবী, শ্রীসরোজকুমারী দেবী, শ্রীযুগলমোহিনী দেবী, শ্রীরেণুকা দেবী, শ্রীরমা দেবী, শ্রীপ্রতিমা দেবী প্রমুখ।

গান, কবিতা, শিক্ষামূলক বিভিন্ন গল্প, উপদেশ, নারীশিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নানা প্রকারের খাবার দ্রব্য তৈয়ারীর প্রণালী, বিভিন্ন মনিষীর লেখা থেকে বাংলা অনুবাদ, নারীর অভাব-অভিযোগের সমাধান চেষ্টা, আচার, মিষ্টি দ্রব্য তৈরী প্রভৃতি শ্রেয়সীর পাতার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করত।

এক বৎসর চলার পর পত্রিকাখানি 'শান্তিনিকেতন' পত্রের সহিত মিলিত হয় এবং কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় উক্তপত্রের 'নারীবিভাগ' রূপে ১৩৩০ সালের বৈশাখ থেকে পৌষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়েছিল।

(১৫) 'সেবা ও সাধনা' ঃ সেবা ও সাধনা সমিতির মুখপত্র 'সেবা ও সাধনা' পত্রিকা। এই সমিতি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'সেবা ও সাধনা' পত্রিকাখানির ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় আলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ২য় বর্ষ থেকে ইন্দুনিভা দাস একাই এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেবা ও সাধনা সমিতির মুখ্য উদ্দ্যেশ্য ছিল বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও গান্ধী প্রবর্তিত সেবা ও সাধনার পথ অবলম্বন করা। মাতৃজাতির পূজা, জাতীয় সমন্বয় এবং স্বদেশীয়তার সেবা করা ছিল সমিতির গৌণ উদ্দেশ্য।

মাতৃজাতি যাতে শিক্ষা ও স্বাবলম্বনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারেন, তার জন্য সমিতির প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। এই উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং দেশ সেবার কাজে নিয়োজিত মহিলাদের সাংসারিক অস্বচ্ছলতা সমিতি দূর করার চেষ্টা করত। ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে এক অখন্ড জাতিতে পরিণত হয়, এতদুদ্দেশ্যে হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ যাতে মুসলমান ভ্রাতাগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করে এবং মুসলমানদের কোরাণ প্রভৃতিতেও হিন্দু আস্থাশীল হয়, সমিতি সেদিকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখত। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের মীমাংসা, আহত ও দুর্গতদের সেবা এবং হিন্দু মুসলমানের আত্মিক মিলনোপযোগী নানা চেষ্টা সুষ্ঠুভাবে সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করত।

ভাব, ভাষা, আচার ব্যবহার এবং পোষাক পরিচ্ছদে ভারতীয়গণ যাতে খাঁটি স্বদেশী হয়ে উঠতে পারেন এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা করা, বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর সহিত ভাবের আদান প্রদানের জন্য হিন্দী, উর্দু, মারহাট্টি চর্চা প্রভৃতির দিকেও এই সমিতির সতর্ক নজর ছিল। ইন্দুনিভা দাস এই সেবা ও সাধনা সমিতির সেক্রেটারীও ছিলেন।

'সেবা ও সাধনা' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, সম্পাদকীয় 'প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য' প্রবন্ধে লিখিত ঃ "দয়ালঠাকুর আমাদের কতো কতো জিনিষই দিয়াছেন। ওগো! তা তোমরা স্বীকার করত। আমাদের জন্মভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে দিয়েছেন, আমাদের আকাশে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, বাতাসে মলয় গন্ধ, মৃত্তিকাতে স্বর্ণরেণু ভরিয়ে দিয়েছেন, আমাদের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ধন-ধান্য মণি-মাণিক্য, শোভা-সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর দিয়েছেন এক শিক্ষিত মার্জিত অননুকরণীয় সমাজ। নীতি ও ধর্ম্মের বেড়া দেওয়া প্রেমের পুষ্করিণী পূর্ণ জ্ঞান মৃত্তিকায় উজ্জ্বল ও উর্বর একটা সামাজিক ক্ষেত্র। আর দিয়েছেন নররূপে নারায়ণ। ঋষিরূপে, সন্ন্যাসীরূপে, প্রেমিক দেশভক্তরূপে, দরিদ্ররূপে আতুর অনাথ-দীনহীন-অস্পৃশ্য কাঙালরূপে নারায়ণ। নিরাকার সাকার অরূপে রূপময়, নির্গুণে গুণময় নররূপী নারায়ণ। কিন্তু এত পাওয়া এত নেওয়ার মাঝখানেতেও ত হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। "আমায় সকলি দিয়াছ নাথ। আমার আশা ত মিটিল না, অশ্রুবারি ঘুচিলনা। গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।" সত্যি! গভীর প্রাণের তৃষাত মিটিতে চায় না। তাই আরো পেতে হবে। আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য পেতে হবে, সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তার পেতে হবে, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মুক্তি পেতে হবে। রোগে শোকেঅকাল মৃত্যুতে আমাদের দেশ জর্জ্জরিত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহস্র বন্ধনে আমাদের দেশ চলচ্ছক্তিহীন, জ্ঞানের অভাব, শ্রদ্ধার অভাব, শক্তির অভাব, স্বাবলম্বনের অভাব। এই সমস্ত অভাব হতে, এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট হতে আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ করতে হবে। দয়াল ঠাকুরের স্বর্ণমন্দিরের সম্মুখে এখনো আমাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

"যা পেয়েছি তাই রক্ষা করার নাম সেবা। আর যা পাইনি তা পেতে আমরণ চেষ্টা করার নাম সাধনা। এই সেবা ও সাধনা দিয়ে মায়ের শ্বেত পাদপদ্ম রাঙা করে দিতে হবে।"

বর্তমান শতাব্দীতে নারীশিক্ষা ও নরীজাগরণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্য, শিল্পকলা, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, সমাজসংস্কার প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের সকল দিকেই মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনমত গঠন ও মহিলা সমাজকে সুশিক্ষিত করে প্রকৃত বিবেকবোধ জাগ্রত করার কাজে মহিলারা পুরুষের পার্শ্বে এসে দন্ডায়মান হয়েছেন। মহিলারা নিজেদের কথা নিজেরা বলবার জন্য বহু পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। মহিলা পরিচালিত অসংখ্য স্বল্পায়ু পত্রিকার অপমৃত্যু ঘটলেও দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। পশ্চিমের নারী প্রগতির বন্যা আমাদের ভারতীয় মহিলা সমাজের মধ্যেও প্রবেশ করে জনমানসে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মুসলমান মহিলা সমাজেও এই নবজাগরণের জোয়ার এসেছে। তারাও প্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। নতুন উদ্যমে ও নবচেতনায় দেশের মহিলা সমাজকে প্রগতির বন্যায় ভাসিয়ে পাড়ে তুলবার জন্য বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশে মহিলারা অগ্রসর হয়েছেন। কিছু কিছু পত্রিকার আয়ু অকালে নির্বাপিত হলেও অনেক পত্রিকাই উৎকর্ষ ও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণে ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী আসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। যতদূর সম্ভব চেষ্টা ও যত্ন সহকারে পত্রিকাগুলির সন্ধান করে যা পেয়েছি তার বিবরণ দিতে কুণ্ঠা করি নি।

মেয়েদের স্কুল কলেজ থেকেও বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় থেকে 'দীপালি' নামের মাসিক পত্রিকাখানি সীতাদেবীর সম্পাদনায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশ পায়। পাবনা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ত্রৈমাসিক 'দীপক' সুবর্ণময়ী গুহের সম্পাদনায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে, শিবপুর ভবানী বালিকা বিদ্যালয় থেকে সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩৪৮ এর অগ্রহায়ণ মাসে 'প্রদীপ' নামে একখানি পত্রিকা, জাহান আরা চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে 'রূপরেখা' পরবর্তী বৎসর থেকে 'বর্ষবাণী' নামে, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে রাধারাণী দেবীর সম্পাদনায় 'সোনার কাঠী', ১৩৪৫—এর মাঘমাসে শান্তাদেবীর সম্পাদনা ও পরিচালনায় 'উৎসব' নামের বার্ষিক পত্রিকাখানির আলোকপ্রাপ্তি ঘটে। আরো বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিভিন্ন

স্কুল-কলেজ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাহুল্য বোধে আমি সেগুলির বর্ণনায় অগ্রসর হই নি।

(১৬) **'মাতৃমন্দির'** : 'মাতৃমন্দির' একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১৩৩০বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অক্ষয় কুমার নন্দী ১ম বর্ষের শেষে পত্রিকা প্রচারের উদ্দ্যেশ্য সম্বন্ধে লেখেন : "মেয়েদের মধ্যে সাধারণ রকম কিছু কিছু উপদেশ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের বিজ্ঞাপন প্রচার — এ ব্যবসায় বুদ্ধিটুকুও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুই তিন সংখ্যা বের হবার পর বোঝা গেল 'রথ দেখা আর কলা বেচা' একসঙ্গে করতে গেলে রথ-দর্শন সার্থক হয় না, প্রাণের নিবেদন ঠাকুরের কাছে পৌছে না। আমরা অতঃপর ইহাকে মহিলাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকায় পরিণত করতে চেষ্টা পেয়েছি।" (চৈত্র ১৩৩০)

১৩৩০ থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ এই পাঁচবর্ষ সুরবালা দত্তের সম্পাদনায় পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সুরবালা দত্ত ও সুশীলা নন্দী যুগ্ম ভাবে 'মাতৃমন্দিরের' সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এর অব্যবহিত পরেই পত্রিকাখানির অদর্শন ঘটে।

(১৭) **'বঙ্গনারী'** : 'বঙ্গনারী' নামের পত্রিকাখানি অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ থেকে মুক্তিলাভ করে। এখানি মাসিক পত্রিকা। চিন্ময়ী দেবী এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রকাশকাল ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে অধিক বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি নি।

(১৮) **'শ্রমিক'** : 'শ্রমিক' একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। সন্তোষকুমারী গুপ্তা এই পত্রিকাখানির সম্পাদিকার দায়িত্বে ছিলেন।

(১৯) **'ত্রিপুরাহিতৈষী'** : 'ত্রিপুরাহিতৈষী' পত্রিকাখানি কুমিল্লা থেকে ৭০ বৎসরের অধিককাল পূর্বে গুরুদয়াল সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কমনীয়কুমার পত্রিকাখানি সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কমনীয়কুমারের মৃত্যু হলে তৎপত্নী ঊর্মিলা সিংহ অনেকদিন 'ত্রিপুরাহিতৈষী'কে জীবিত রেখেছিলেন।

(২০) **'বঙ্গলক্ষ্মী'** : 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাখানি সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্ররূপে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (ইংরাজীর ১৯২৫, নভেম্বর) মুক্তি লাভ করে। এই মাসিক পত্রিকাখানি সচিত্র বাহির হত। পত্রিকা

প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এরূপ লিখিত হয় ঃ "বাংলাদেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহারই মুখপত্র স্বরূপ 'বঙ্গ লক্ষ্মী' বাংলার নারী সমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাংলার মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারীশিক্ষার অবস্থা এবং নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে এযুগে কোন কার্য্যে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। নারীগণও তাঁহাদের উন্নতিসাধন মিলিতভাবে করিলে তাহা সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া নারীগণ যাহাতে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে পারেন, সেই সহজ, সরল সত্যটি নারী সমাজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই 'বঙ্গলক্ষ্মী'র প্রধান উদ্দেশ্য।"

'বঙ্গলক্ষ্মী'র ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৪, সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর বক্তব্য এরূপ ঃ "মেয়েরা ঘরে থাকবে, ঘরের কাজ করবে, ঘরকন্না সামলাবে, ঘরের মানুষদের সেবাযত্ন করে তাদের বাঁচাবে, ছেলেমেয়েগুলিকে সুস্থ সবল সুন্দর করে মানুষ করে তুলবে, এতেই মেয়েদের আনন্দ, এতেই তাদের জীবনের সার্থকতা, বাঙ্গালী মেয়েরা জন্মাবধি এই সংস্কারের মধ্যেই মানুষ হয়ে এসেছে। বাঙ্গালী মেয়েদের এই চিরসুন্দর সংস্কারের বিশেষত্বটি বজায় রেখে কেমন করে তারা বাইরের সঙ্গে—বাইরের কাজ, দেশের কাজ, পৃথিবীর কাজের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে, কেমন করে উপযুক্ত জ্ঞানলাভে তারা সমর্থ হয়, তার জন্যে দেশের স্ত্রীপুরুষ অনেকেই আজকাল ভাবতে আরম্ভ করেছেন। বাইরের এই বড় ক্ষেত্রে মেয়েদের দাঁড়াতে পারার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করছেন। প্রথম কথা ঘরের বাইরটা ভাল করে' তুলতে না পারলে ঘরের ভিতরটা ভাল করে তোলা যায় না। বাইরের সঙ্গে ভিতরের যে অচ্ছেদ্য যোগ আছে তা ত আর অস্বীকার করবার যো নাই। ...... কিন্তু ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য ঘরের বাইরে যে ভালভাল স্কুল কলেজ আশ্রম সমিতি ইত্যাদির কত প্রয়োজন—ঘরের সঙ্গে বাইরের একাত্মযোগ, ঘরের বাইরটা যে ঘরেরই এক অঙ্গ এই বোধ মেয়েদের মনে সুস্পষ্ট আকারে জেগে না থাকায়—তাঁরা সেটি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করতে পারেন না। দেশের সকল মেয়ের মনে এই ঘর বাইরের একাত্ম যোগের বোধটি জাগিয়ে

তোলাই বর্ত্তমানে মেয়েদের সম্বন্ধে দেশের প্রধান কাজ। প্রত্যেক মেয়েকে জানতে হবে যে ঘরের কল্যাণ কামনাটি এখন থেকে তাঁদিকে বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে, ঘরের মাটিটুকুর উপর যে দরদ, ঘরের বাইরের মাটিতেও অবিকল সেই দরদ না জন্মালে ঘর ও ঘরবাসী আমরা সবাই যে ছোট হ'য়ে, সঙ্কীর্ণ হয়ে, শুকিয়ে মারা যাব এই সত্যটি নিজেদের মনে তাঁদিকে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত করে' নিতে হবে তবেই দেশের কাজ এগোবে—তবেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হবে।

আজ শত শত চেষ্টা দেশের মধ্যে জেগে উঠেছে। ঘর বাইরের একাত্ম বোধটি মেয়েদের মনে জাগিয়ে তোলার ভার মেয়েদের উপরেই রয়েছে। মেয়েরা একাজে অগ্রসর হোন, সকল মেয়েকে ডেকে বলুন ঃ

"হৃদয়খানা বাইরে ফেলে দিতে হবে আজ,
সবার দুখে দুখী হ'য়ে করতে হবে কাজ ।
নিজের ছেলে পরের ছেলে থাকবে নাকো ভেদ,
সকল ছেলের ভালো হ'লেই মিটবে মনের খেদ ।
আপন স্বার্থ ঘোর অনর্থ ঘনায় বিপদ ভার,
সবার স্বার্থে পরমার্থ সকল দুঃখ পার ।"

'বঙ্গলক্ষ্মী' পরিচালনার দায়িত্বভার বরাবর মহিলাদের হস্তেই ছিল । বিভিন্ন সময়ে এর পরিচালনভার নিম্নলিখিত মহিলাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল । ১৩৩২ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৩৩ চৈত্র পর্যন্ত কুমুদিনী বসু বি. এ., ১৩৩৪ বৈশাখ থেকে কার্তিক লতিকা বসু বি. লিট. (অকসন), ১৩৩৪ অগ্রাহয়ণ থেকে ১৩৫৫ কার্তিক পর্যন্ত হেমলতা দেবী (ঠাকুর), ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ হেমলতা দেবী, শান্তাদেবী ও আরতি দত্ত প্রভৃতি এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

(২১) 'পাপিয়া' ঃ 'পাপিয়া' একখানি ছোটদের সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ - আষাঢ় মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বিভাবতী সেন এর সম্পাদকীয় দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ২য় বৎসর থেকে ইহা মাসিকে পরিণত হয় । ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বের হয়।

(২২) অর্ঘ্য ঃ 'অর্ঘ্য' নামের পত্রিকাখানি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনমাসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর । এখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ।

(২৩) 'তরুণশক্তি' ঃ 'তরুণশক্তি' এই পত্রিকাখানি পুরুলিয়া থেকে

প্রকাশিত হত। মানভূমের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের কর্মিসংঘ ও আশ্রমের মুখপত্র স্বরূপ এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব হয়েছিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হন। রাজবালা দেবী তখন 'তরুণশক্তি'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাখানি কতদিন জীবিত ছিল জানা যায়নি।

(২৪) 'আলোক' : 'আলোক' ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিকমাসে ভূমিষ্ঠ হয়। প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করে। ১ম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যক্ত করা হয়। "সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট পথকে লেখক সমাজে ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত করে তোলাই হচ্ছে এর কাজ।"

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'আলোকের' উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়েছে "শীতের অবসানে বিশ্ব চায়, তাহার কুহেলীর উত্তরীয় দূরে নিক্ষেপ করিতে। প্রকৃতি যেন নীরব ভাষায় নিরন্তর ভিক্ষা জানাইতেছে — "আরো আলো, আরো আলো অধিক আলোক" আলো চাই সত্য, কিন্তু খনির ধূমে আচ্ছন্ন আসানশোলে আলোকের বিকাশের সম্ভাবনা কোথায় ? . . . . খনির তিমির গর্ভ হইতেই হীরকের উৎপত্তি। তাহারই বিরাট দীপ্তিতে মধ্যাহ্ন তপনও নিষ্প্রভ ম্লান, মলিন হইয়া পড়ে।

কিন্তু তাহার সন্ধান পাইব কোথায় ? উপলখণ্ডের মত হীরক সর্ব্বত্র মিলিবে না। হয়ত, কোন স্থলে দেখিব কাচ কাঞ্চনের দ্যুতি প্রকাশ করিতেছে। রত্ন হয়ত মৃত্তিকার আবরণে ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া মৃৎপিন্ডেরই মত অপদার্থ ও অবজ্ঞেয় হইয়াছে। সে আবিষ্কারকের দৃষ্টি, এই অযোগ্য ব্যক্তির কোথায় ? যদি সে কোনদিন ধূলি কর্দ্দমের মালিন্য ধৌত করিয়া সেই গুপ্ত রত্নের নির্ম্মল আভা বিশাল বিশ্বে বিকশিত করিতে পারে, তবে তাহার প্রচেষ্টা হইবে সফল, তবে এই নগণ্য পত্রিকা সেই বিরাট দীপ্তির প্রতিবিম্ব তুলিয়া ধরিতে পারিবে — উচ্চ শিরে, সমগ্র জগতের সম্মুখে ।

আজ এই শিশু পত্রিকার অভিযান পথে যে মহর্ষিপ্রতিম প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ কামনা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে— প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকের আশীর্ব্বাদের বর্ম্ম নিঃসন্দেহে তাহার যাত্রা পথের বিঘ্ন দূরীভূত করিবে নিঃশেষে।

অগ্নিবীণার কবি নিপুণ করে তাহার বীণায় আলোকের বিজয় গীতির ঝঙ্কার তুলিয়াছেন । উজানীর রচয়িতার সুর লহরী উজান স্রোতে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে

সাফল্যের পথে ভাসাইয়া লইবার প্রয়াস পাইতেছে। 'পর্ণপুট' যাঁহার অনবদ্য রচনা, তাঁহার সহৃদয়তা পর্ণপুটে বহিয়া আনিয়া ধরিয়াছেন আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তথাপি এই প্রথম সংখ্যায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিবে যথেষ্ট। আশাকরি সহৃদয় সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণ স্নেহভরে তাহা উপেক্ষা করিবেন।" *

(২৫) **'মুক্ত'** ঃ 'মুক্ত' নামের পত্রিকাখানির প্রকাশকাল ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে ফাল্গুন শনিবার। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তরুবালা সেনের পরিচালনায় সচিত্র আকারে প্রকাশিত হয়।

(২৬) **'জয়শ্রী'** ঃ লীলাবতী নাগের (পরে রায়) সম্পাদনায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রথমে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। 'জয়শ্রী'র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাতে এরূপ লিখিত আছে ঃ "নববর্ষে এই নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলাম। বাংলার মহিলাদের মুখপত্র স্বরূপ কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত ছিল না। এই অভাব দূর করিবার প্রয়াসে জয়শ্রী প্রকাশিত হইল।

"নানা অনিবার্য্য কারণে ও সময়ের অল্পতার জন্য 'জয়শ্রী'র এই সংখ্যা আশানুরূপ করিতে পারা গেল না। আগামী সংখ্যা হইতে সকল ত্রুটি যথাসম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিব। আশাকরি বাংলার পাঠক পাঠিকাগণ বিশেষতঃ মহিলাগণ 'জয়শ্রী'কে সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। 'জয়শ্রী' মহিলাদের পরিচালিত কাগজ, ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার সকল দায়িত্ব তাহাদিগকেই লইতে হইবে। ইহার মধ্যেই মহিলাদের নিকট হইতে যেরূপ উৎসাহ ও সহযোগিতা পাইতেছি, তাহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

"এই সংখ্যার প্রচ্ছদপট শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত। তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

বাংলাদেশে 'মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক প্রবন্ধের লেখিকা শ্রীযুক্ত রাধারাণী দত্ত লিখিয়াছেন—"এই প্রবন্ধটি লিখিবার পর আরো কতিপয় মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা বারান্তরে লিখিবার আশা রাখি। উক্ত প্রবন্ধ পূর্ব্বেই ছাপা হইয়াছিল, তাই আমরা ইহা যথাস্থানে মুদ্রিত করিতে পারি নাই।"

'জয়শ্রী'র দ্বিতীয় সংখ্যায় এরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ "'জয়শ্রী'র দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইল। 'জয়শ্রী'কে বাংলাদেশ সাদরেই গ্রহণ করিয়াছে— মাত্র একমাস

কালের মধ্যে ইহার সভ্য সংখ্যার হার হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা 'জয়শ্রী'র বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিয়েছেন ও ছাপিতেছেন তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁহারা চিত্র ও নানারূপ অঙ্কন দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, পুরুষ ও নারীর লেখা সম্বন্ধে পার্থক্য কেন। এ বিষয়ে আমাদের মত এই যে, নারীদের মতামত সুসম্বদ্ধ করিবার কার্য্যে আরো অধিক সংখ্যক নারী যখন আত্মনিয়োগ করিবেন তখন এ পার্থক্যের প্রয়োজন থাকিবে না — বর্ত্তমানে এত অল্প সংখ্যক নারী এ কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন যে তাঁহাদের মতামত বিছিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়াতে বর্ত্তমান যুগের নারীর সুচিন্তিত সুসম্বদ্ধ মতামত দেশ জানিতে পারিতেছে না। কাজেই এই পত্রিকাখানির ইহাই হইবে প্রধান উদ্দেশ্য। পুরুষের মতামত আমরা 'চয়ন' ইত্যাদিতে উদ্ধৃত করিব। প্রত্যেক পাঠিকাকে আমরা লেখিকা হইতে অনুরোধ করিতেছি — এবং প্রত্যেক নারী ও জাতির মঙ্গ লকামী ব্যক্তিকে গ্রাহক গ্রাহিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। কারণ এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকারে দেশ সেবা।...... নানা দুর্যোগের ভিতর দিয়া 'জয়শ্রী'কে চলিতে হইতেছে। তাই এবারের সংখ্যাও কিছু দেরীতে প্রকাশিত হইল। আজ 'জয়শ্রী'র সম্পাদিকা ও সহসম্পাদিকা উভয়েই কারাগারে। কিন্তু 'জয়শ্রী' কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, ইহা মহিলাদের সকলেরই। তাই ভরসা হয়, মহিলাদের এই নিজস্ব সম্পত্তিটি তাঁহারা নিজেদের সমবেত ও ঐকান্তিক চেষ্টায়, শত দুর্য্যোগের ভিতরেও রক্ষা করিয়াই রাখিবেন।"

'জয়শ্রী'র ১ম বর্ষের ১১শ ও ১২শ সংখ্যাতে সম্পাদিকার 'নিবেদনে' জানা যায় যে — "পুরাতন বছরের আজ শেষ নিবেদনের পালা। বড় সঙ্কোচে আজ বিদায় নিতেছি।....

আশা ছিল, জয়শ্রী বাংলার নারী সমাজের সকল ভাবের সকল মতের সকল চিন্তা ধারার মিলনভূমি রচনা করিবে। জানি, সে স্বপ্ন আজও সার্থক হয় নাই। তবে নিষ্ফলও হয় নাই। নারীশক্তি অনন্ত সম্ভাবনায় জাগ্রত হইয়াছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। নূতন বছরে 'জয়শ্রী' সত্যই জয় ও শ্রীমন্ডিত হইয়া উঠিবে, এ বিশ্বাস আমাদের অমূলক নয়।

একটি বছরের সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর জীবন। ইহারই মধ্যে ঝড় ঝাপটা আমাদের উপর দিয়া কম যায় নাই, শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা ও সহ সম্পাদিকা মহোদয়াদের

কারাবরণ সত্যই আমাদের বিষম অগ্নিপরীক্ষা ছিল। এই সকল গ্রাহ্য করি নাই — করি নাই এই জন্য যে বাংলার নারীর প্রাণশক্তি ইহার পিছনে আছে। 'জয়শ্রী'কে যাঁহারা প্রথম হইতেই প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন তাঁহারা ইহাকে চিরদিনই রক্ষা করিবেন। 'জয়শ্রী' তাঁহাদেরই হৃদয়ের সামগ্রী। অর্থের বিনিময় কখনও ইহার সঙ্গে তুলনা চলে না। তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা আজ নববর্ষের যাত্রাপথে অগ্রসর হইলাম। বাংলার মা-বোনের প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণ কামনা পাইয়াছি, এই অক্ষয় কবচ আমাদের জয়যাত্রায় সহযাত্রী হইবে। ইহাই সম্বল লইয়া 'জয়শ্রী' দ্বিতীয় বর্ষে যাত্রা শুরু করিতেছে।......

প্রথম বছরের আজ শেষ নিবেদন ও নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইতেছি।"

বিনীতা শ্রী শকুন্তলা দেবী মাঘ সংখ্যা প্রকাশ করিতে না পারার জন্য পত্রিকা মারফৎ কৈফিয়ত দিয়েছেন এই ভাবে ঃ "শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা ও সহসম্পাদিকা মহোদয়াগণ কারারুদ্ধ হওয়াতে এবং সরকার হইতে সিকিউরিটি দাবী করাতে 'জয়শ্রী' মাঘ ও ফাল্গুন মাসে যথা নিয়মে বাহির করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে সিকিউরিটি বর্ত্তমানে না চাওয়াতে আমরা পুণরায় 'জয়শ্রী' প্রকাশ করিলাম। তাড়াতাড়িতে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা একত্র প্রকাশিত হইল। মাঘ সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব হইল না। আগামী বছর একটি বিশেষ সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া আমাদের পুরাতন গ্রাহক গ্রাহিকাদের দিবার সঙ্কল্প রহিল। কাজেই আর্থিক ক্ষতি না হইবারই কথা আশাকরি, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনার সহৃদয়তাগুণে ক্ষমা লাভ করিবে।.......

দ্বিতীয়বর্ষের 'জয়শ্রী'র মূল্য সডাক ৪।।৯ চারি টাকা পনর আনা। মনি অর্ডার করিয়া পাঠানো গ্রাহক গ্রাহিকাদের পক্ষে সুবিধাজনক। আমাদের পক্ষেও বটে। নতুবা আমরা সকলের নিকট ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠাইব। যাঁহারা নূতন বছরে 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠপোষকতা করিতে একান্তই পারিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ২১শে চৈত্রের মধ্যে জানাইয়া বাধিত করিবেন। নচেৎ আমাদের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইবে। তবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে, 'জয়শ্রী' গত বছরের চেয়ে এবার অধিকতর আদরণীয় হইবে। ইতিমধ্যে যে আশা ও উৎসাহের কথা নানাদিক হইতে পাইতেছি, তাহাতে আমাদের এ আশা অমূলক নয়।"

'জয়শ্রী' আগাগোড়া মহিলাদের হস্তেই পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা এই পত্রিকাটির পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম — লীলাবতী নাগ, শকুন্তলা

দেবী, বীণাপাণি দেবী, উষারাণী রায়, লীলাবতী রায় প্রমুখ বিদুষীগণ।

(২৭) 'অঙ্কুর' ঃ 'অঙ্কুর' এই পত্রিকাখানি রেঃ সুরেন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে (ইংরাজীর আগষ্ট ১৯৩১) প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রটি ছোটদের জন্য। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে নিম্নরূপ লিখিত হয় ঃ " তোমাদের আনন্দ ও শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে উদ্যোগী হইয়াছি। আমি সৎ উদ্দেশ্যে দেশের বালক বালিকাদের কল্যাণার্থে স্বল্প মূল্যে ইহা প্রকাশ করিলাম।..... এই কাগজখানি ভারত বিখ্যাত Treasure Chest নামক ইংরাজী কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উক্ত কাগজখানা যে ভাল এ বিষয় কাহারও অবিদিত নহে, সুতরাং উক্ত কাগজের অনেকাংশ বাংলায় তর্জ্জমা হইবে এবং যে সকল বালক বালিকা ইংরাজী জানে না তাহারাও তাহা পড়িবার সুযোগ পাইবে।"

লাবণ্যপ্রভা মল্লিক বি. এ. বি. টি. ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে এই কাগজখানির সম্পাদনার দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলে নেন।

(২৮) মহিলা বান্ধব ঃ 'মহিলা বান্ধব' পত্রিকাখানি মিশনারি মহিলাদের পরিচালনায় প্রকাশিত হত। এই সচিত্র মাসিকখানি মহিলাদের জন্যই বেলপুর থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। মিসেস্ এস. কে. মন্ডল এর সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সনের পর সম্ভবতঃ পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। এর ১৯৩২ সনের একটি সংখ্যাই পাওয়া গেছে।

(২৯) 'এডুকেশন গেজেট' ঃ অনুরূপা দেবী ও কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকাখানি ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(৩০) 'রূপশ্রী' ঃ 'রূপশ্রী' একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিকমাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী বেলা দেবী (ঘোষ) এর সম্পাদনায় পত্রিকাখানি দুই বৎসর ভালভাবে চলেছিল।

(৩১) 'অনুভব ও সাহিত্য' ঃ 'অনুভব ও সাহিত্য' নামের পত্রিকাখানি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে প্রকাশ পায়। এর সম্পাদিকা ছিলেন জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত। এখানিও মাসিক পত্রিকা।

(৩২) 'গৃহলক্ষ্মী' ঃ কনকপ্রভাদেব মহাশয়ার সম্পাদনায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে শারদীয়া সংখ্যা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকাখানি পরবর্তীকালে 'জাগৃহি' নাম ধারণ করেছিল। সম্পাদিকা 'নিবেদনে' লেখেন ঃ 'দেশের

এই দুর্দ্দিনে নারী প্রগতির গতি ও প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মকে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সংবাদপত্রের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীহট্ট, তথা সমগ্র আসামে মাতৃজাতির উন্নতি বিষয়ক নারী পরিচালিত কোন সংবাদপত্র নাই । সেই অভাব যথাসাধ্য দূর করিয়া বাংলা ও অসামের নারী জাতিকে জগৎবরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য আমরা ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা এই 'গৃহলক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিলাম । জানি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, — জানি আমাদের এই দরিদ্র পীড়িত দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, এ পথ কন্টকাকীর্ণ - পদে পদে লাঞ্ছনা ইহার পুরস্কার । তবুও ইহা মাথা পাতিয়া লইয়াছি। ভরসা মা, ভগিনী ও স্বদেশবাসীগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলিবে । আমার এ অযোগ্যতার ভিতর দিয়াও নারীজাতির কথঞ্চিত উন্নতি সাধিত হয় তবে জীবন সার্থক মনে করিব ।"

এই শারদীয়া সংখ্যাটি প্রকাশের বহু দিন পর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'ভাদ্রসংখ্যা' প্রকাশ পায়। এই সংখ্যাটিকেই ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বলা হয় । ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 'শারদীয়া সংখ্যা' । 'গৃহলক্ষ্মী' ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে এর নাম রাখা হয় 'জাগৃহি' আসামের মহিলা পরিচালিত একমাত্র বাংলা মাসিক" ।

এই সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এরূপ লিখিত হয়েছেঃ- 'গৃহলক্ষ্মী' আজ 'জাগৃহি' নাম ধারণ করিয়া পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । একদিকে আমাদের শুভানুধ্যায়ী লেখক লেখিকাদের তাগিদ অপর দিকে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে "'গৃহলক্ষ্মী'র নাম পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় তাই আজ 'জাগৃহি' নারী জাগরণের বার্ত্তা বহন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । আমরা আমাদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি । নারী জাতির যুগযুগান্তর সঞ্চিত বেদনার অবসানই আমাদের আদর্শ ।" 'জাগৃহি'র মাত্র তিনটি সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ।

(৩৩) **"মন্দিরা" :** 'মন্দিরা' একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা । ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে প্রকাশিত হয় । শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যক্ত করেন : "পত্রিকার নাম 'মন্দিরা' কেন হল সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার ।

আশাকরি 'মন্দিরা' নিজেই নিজের পরিচয় দেবে এবং সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল পরিচয় । উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে কিছু বলা দরকার ।

"জাতির জীবনে আজ চলার গতিবেগ এসেছে । রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক —সর্ব্বদিকেই আজ মুক্তি অভিযান শুরু হয়েছে । এই মুক্তি অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় মন্দিরা ।"

দীর্ঘ দশ বৎসর পত্রিকাটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মহিলাগণ । তারপর এর দায়িত্বভার পড়ে পুরুষের হস্তে । এই দশবৎসর সময়কালে নিম্নলিখিত মহিলাগণ এর সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন । শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাস পর্যন্ত সুনিপুনভাবে আপন কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন । তৎপরে কমলা দাশগুপ্তা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ পর্যন্ত এর সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন । পরবর্তী কয়েক বৎসর স্নেহলতা সেন ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত উক্ত কর্মদায়িত্ব পালন করেন । ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত আবার কমলা দাশগুপ্তা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ।

তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাবলী, যেমন—যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের 'নীল আন্দোলনের ঘটনাবলী' সম্বন্ধে আলোকপাত, শ্রী সুব্রতা চৌধুরীর 'পরাধীনতাই সমস্যা' প্রবন্ধে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয় । নগেন দত্ত মহাশয়ের 'সর্বহারা বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন' সম্পর্কে আলোচনা যুগপোযোগী হয়েছিল । এছাড়া শান্তিসুধা ঘোষের 'বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলন', নগেন দত্ত মহাশয়ের 'বিশ্বরাজনীতিতে কূটনীতি' প্রভৃতি মূল্যবান রচনা 'মন্দিরা'র পাতায় শোভা পেত ।

(৩৪) 'বিজয়িনী' ঃ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে 'বিজয়িনী' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অরুণচন্দের সহধর্মিণী জ্যোৎস্না চন্দ বি. এ । এখানিও মাসিক পত্রিকা, শিলচর থেকে প্রকাশিত হয় । ১ম সংখ্যায় সম্পাদিকার মন্তব্যে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় ঃ "মহিলা সমাজের নিজস্ব একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও এতদঞ্চলে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের পৌনঃপৌনিক ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়া বহু ভয়

ভাবনার মধ্যে আমরা স্থানীয় 'নারী কল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে ও সাহায্যে নারী সমাজের সেবাকল্পে 'বিজয়িনী' নামক সাময়িকপত্র লইয়া আপনাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম।.....

...... আমাদের পরম সৌভাগ্য যে যাত্রারম্ভে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রচেষ্টা কে আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে ইহার নামকরণ করিয়াছেন।....... আমাদের মহিলা সমাজে দুঃস্থ সহায় সম্বলহীনার সংখ্যা অগণিত। 'বিজয়িনী' প্রকাশ দ্বারা আর্থিক কোন লাভ হইলে তাহা দুঃস্থ সমাজের কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার এক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

তবে দুঃখের বিষয় এই যে সম্ভবতঃ পত্রিকাখানির পরমায়ু প্রকাশের অল্পদিন পরেই শেষ হয়ে যায়। এটা নিছক অনুমানের বিষয়। কারণ দ্বিতীয় বর্ষের 'বিজয়িনী'র কোন সংখ্যা আর দৃষ্টিগোচর হয় নি।

(৩৫) 'শিক্ষা' ঃ 'শিক্ষা' নামের পত্রিকাখানির প্রথম প্রকাশকাল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস। এটিও মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা স্বর্ণপ্রভা সেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখা যায় ঃ-

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

"শিক্ষা ভিন্ন অন্য আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।"

প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কথায়' এরূপ লিখিত আছে ঃ "সমগ্র জগৎ যখন রণকোলাহলে শব্দায়মান, আমাদের অস্তিত্ব যখন দোলায়মান, আমরা সেই সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিলাম ; কারণ যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যদি করিতে পারি তবে ইহাই বা কেন পারিব না? শিক্ষার পরিকল্পনা, তাহার আলোচনা ও বিচার, নিত্যকালের ব্যাপার, সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। আমাদের দেশে যাঁহারা এ বিষয়ে দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন তাঁহাদের সাধনার ফল আমরা কিছু পরিমাণে পাইতে পারিব, এবং তাহাতে আমাদের চিন্তাও পরিণতি লাভ করিবে, এই আশায় 'শিক্ষা' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।"

(৩৬) 'আশ্রমী' ঃ রংপুর হরিসভা থেকে 'আশ্রমী' পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী। এখানি পাক্ষিক পত্র। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কেশব লাল বসু ও কমলবাসিনী দেবী।

(৩৭) 'মেয়েদের কথা' ঃ 'মেয়েদের কথা' এখানি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা ছিলেন কল্যাণী সেন এম. এ। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে এর শুভ

আবির্ভাব ঘটে। 'বঙ্গবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙ্গালী মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগস্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি" এই ছিল 'মেয়েদের কথা' পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। নানা কারণে পত্রিকাখানি দীর্ঘ পরমায়ু থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর্থবর্ষেই ১৩৫৩ বঙ্গাব্দেই এর অকাল মৃত্যু ঘটে।

(৩৮) 'জাগরণ' ঃ 'জাগরণ' এর জন্মস্থান বাঁকুড়া তরুণী সংঘ। সম্পাদিকা সুলতানা বেগম। এখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে আলোক প্রাপ্তি ঘটে। মাত্র ছয় সংখ্যা প্রকাশের পরই এর দেহলুপ্তি ঘটে।

(৩৯) 'প্রভাতী' ঃ 'প্রভাতী' সুধা ঘোষের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এর জন্মস্থান বাঁকুড়া। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে মুক্তিলাভ করে। এখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে।

রবীন্দ্রনাথের বাণীকে অক্ষয় অমর করে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে কিছু উৎসাহী উদ্যোগী লেখক লেখিকার রচনা দ্বারা 'প্রভাতী'র পাতা উজ্জ্বল হত। বাঙ্গালীর দূরবস্থার মূলে সুযোগ্য নেতার অভাব চিরকালই ছিল। যে নেতার কাজ হওয়া উচিত "এইসব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা,/এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" এককালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সুযোগ্য নেতা। আশাবাদী কবি বাঙ্গালীকে যে অভয়বাণী দিয়াছেন—আজ জাতির এই দুর্দিনে সেই অভয় বাণীই আমাদের বিক্ষুদ্ধ সাগর পাড়ি দিতে সহায়তা করবে। "শৃংখলে বারবার ঝন্‌ঝন ঝংকার, নয় এতো তরুণীর ক্রন্দন শঙ্কার, বন্ধন দুর্ব্বার সহ্য না হয় আর, টলমল করে আজ তাই ও। হাইমারো মারো টান হাঁইও। ওগো নেয়ে নাওখানি বাইও।"

'প্রভাতী'র দশম সংকলন প্রকাশিত হবার কথা ছিল দোল পূর্ণিমার দিন। কিন্তু এই পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ২৫ শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের শত জন্মজয়ন্তীর শুভ-লগ্নে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বিশেষ সংকলনটি প্রকাশ পায়। সম্পাদিকা সুধা ঘোষ 'আমাদের কথা' প্রসঙ্গে বলেন ঃ "... আজ শুধু আমরা নই সমস্ত বিশ্বের সুধী সমাজ বিশ্ব কবির প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ লাভ মানসে তাঁর পূজা বেদীমূলে উন্মুখ প্রতীক্ষায় ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছিল এক অনন্য সাধারণ ভাস্বর প্রতিভা। অমর প্রতিভা কালের কুটিল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে শাশ্বত কালের মানুষের কাছে তার অম্লান দ্যুতি রেখে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

তাঁর দীর্ঘ সাধনায় কাব্যে, প্রবন্ধে, নাটকে, গল্পে, সংগীতে, রম্যরচনা ও বিভিন্ন পত্রাবলীতে তাঁর অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর চিন্তাধারা, কর্মধারা ও ভাবধারা সমস্ত বিশ্বের মানুষকে জুগিয়েছে প্রেরণা, মহামিলনের সঞ্জীবনী মন্ত্র, দুঃসাধ্যকে জয় করবার অনমনীয় স্পৃহা, দুর্জ্ঞেয়কে আয়ত্ত করবার অসাধ্য সাধনা। পৃথিবীতে যত অশান্তি অন্যায় আমাদের বিচার বুদ্ধিকে লোপ করেছে তার একমাত্র কারণ আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালবাসতে শিখিনি। এইজন্যই সারা বিশ্বে লেগে থাকে হিংসা, দ্বেষ, নিত্য-নিঠুর-দ্বন্দ্ব'। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হোক অন্তরের সর্বপ্রকার মালিন্য দূরীভূত হোক—এ ছিল কবিগুরুর জীবনসাধনা .... জানি আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি আছে, অন্তরে আছে অনেক পুঞ্জীভূত অক্ষমতার বেদনা, কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার দৈন্য যেন আমাদের সংকুচিত করে না দেয়। আমরা তাই এই শত-জন্মদিনের শুভ মুহূর্তে আমাদের মধ্যে কবিগুরুর অমর আত্মার আবির্ভাব অনুধ্যান করি, প্রার্থনা জানাই - তাঁর ক্ষমা সুন্দর প্রসন্ন অন্তরের অকৃপণ আশীর্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হোক। —বিনীত সম্পাদক, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮।"

যাঁদের আশীর্বাদ ও উৎসাহে 'প্রভাতী'র সাহিত্যসেবীগণ অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি 'প্রভাতী'র লেখক লেখিকাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ঃ শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, ধীরেন্দ্রলাল ধর, প্রমথনাথ বিশী, কল্যাণী প্রামাণিক, প্রবুদ্ধ, কালিদাস রায় ও চিত্তরঞ্জন মাইতি প্রভৃতি। বাংলাদেশের এই সকল সাহিত্যিকদের আশীর্বাদে নতুন লেখকগণ উৎসাহিত হ'য়ে 'প্রভাতী'র মাধ্যমে সাহিত্য চর্চ্চায় মন দিয়েছিলেন।

'প্রভাতী' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য — রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা - রাবীন্দ্রিকী, কাব্যসাধনায় যুগমানব রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও কিশোরদল, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ, মানুষ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসাহিত্যে কয়েকটি সমাজ সমস্যা, রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি, যুগমানব রবীন্দ্রনাথ, গল্প, আলোচনা ইত্যাদি।

'প্রভাতী'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১। 'রবীন্দ্রপাঠচক্র' বামনবাড় রবীন্দ্রপাঠাগারের পাঠক পাঠিকাদের দ্বারা গঠিত একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা।

২। 'প্রভাতী' রবীন্দ্রপাঠচক্রের আদর্শে বিশ্বাসী লেখক-লেখিকাদের মুখপত্র।

৩। প্রতি বৎসর 'প্রভাতী'র শারদীয় ও দোলসংকলন বাহির হয়।

৪। সংক্ষিপ্ত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া শ্রাবণ ও পৌষমাসের মধ্যে প্রভাতী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হবে ।

৫। পাণ্ডুলিপির নকল রাখিয়া পাঠাইতে হয়, কেননা অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না ।

৬। লেখা সংশোধন করিবার অধিকার সম্পাদকের থাকিবে ।

৭। সাধারণতঃ স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখা ও পল্লীর সুখ দুঃখ ও সমস্যা লইয়া রচিত গল্প ও প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হয়। দীর্ঘ কবিতা ছাপানো হয় না ।

৮। লেখকের রবীন্দ্র পাঠচক্রের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বার্ষিক চাঁদা দুই টাকা ।

৯। স্থানীয় প্রাচীন দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতির ফটোর ব্লক পাঠাইলে বা নির্মাণের ব্যয় বহন করিলে ছাপানোর ব্যবস্থা হয়।

১০। বিজ্ঞাপনের হার স্থান অনুযায়ী এবং যোগাযোগ সাপেক্ষ ।

১১। লেখা, ছবি ব্লক ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি পাঠাইবার ও বিস্তৃত বিবরণ জানিবার ঠিকানা - সম্পাদক ঃ 'প্রভাতী', বামনবাড় রবীন্দ্র পাঠাগার, পোঃ বামনবাড়, জেলা মেদিনীপুর (প্রধান কার্য্যালয়)। ১৩নং প্রতাপ চাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা - ১২ (কলিকাতা অফিস), মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা ।

(৪০) **'অর্চ্চনা' ঃ** 'অর্চ্চনা'র প্রথম আলোক প্রাপ্তি ঘটে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে । ১৩১০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনমাসে এর শুভ আবির্ভাব ঘটে । এখানি মাসিক পত্রিকা । ৪০বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ থেকে চিত্রিতা দেবী এর অন্যতম সম্পাদিকা নিযুক্ত হন ।

'অর্চ্চনা' তখনকার অন্যান্য মাসিকপত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতায় প্রথমশ্রেণীর মর্য্যাদা দাবী করতে পারে । এর লেখক লেখিকা গোষ্ঠীর সকলের রচনাগুলিই সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ । পত্রিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে । 'অর্চ্চনা'র লেখক লেখিকা গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সু-সাহিত্যিক । তাঁদের প্রবন্ধগুলি যেভাবে বঙ্গসাহিত্যের ভালমন্দ নির্ভীকভাবে বিচার করে সমালোচনায় অংশ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

বিভিন্নপত্র-পত্রিকা 'অর্চ্চনা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে এটাই উপলব্ধি হয় যে 'অর্চ্চনা' আকারে ক্ষুদ্র হলেও লেখনী ও পরিচালনায় তখনকার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে উৎকর্ষ ও সাহিত্যিক মূল্য

বিচারে শ্রেষ্ঠতার পরিচয় বহন করেছিল। উৎকর্ষের বিচারে 'অর্চ্চনা' জনমানসে গভীর উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 'অর্চ্চনা' সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে আর উল্লিখিত হল না।

(৪১) 'মাতৃভূমি' ঃ 'মাতৃভূমি' নামের মাসিক পত্রিকাখানি প্রথমে পুরুষ পরিচালনা ও সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। ১৩৫২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অমিতা দত্ত মজুমদার এম. এ।

মাতৃভূমির প্রতি সংখ্যার উপরে শোভা পাচ্ছে এই শ্লোকটি ঃ 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তৎকালীন বহু স্বনামধন্য লেখক ও পন্ডিত ব্যক্তি দের রচনা সম্ভারে 'মাতৃভূমি'র পাতা সমৃদ্ধ হত। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এর 'গীতায় অভ্যাসযোগে ভগবদ্যুক্তি', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাববার কথা', শ্রী কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার ধারা', সখানাথ বসু মহাশয়ের 'সাম্প্রতিক রবীন্দ্রকাব্যে মানবতা' প্রভৃতি রচনা 'মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।

(৪২) 'পরিক্রমা' ঃ 'পরিক্রমা' পত্রিকাখানির প্রকাশকাল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাস। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এই চারিটি ঋতুর চারিটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কল্যাণী মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদিকা ছিলেন।

(৪৩) 'মহিলা' ঃ মহিলাদের একমাত্র মুখপত্র 'মহিলা' নামের পত্রিকাখানি বীণা গুহের (এম. এ.) সম্পাদনায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাসে প্রকাশ পায়। ১ম সংখ্যায় সম্পাদিকা বীণা গুহ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ লেখেন, "মহিলাতে রসসাহিত্যের পরিবেশন করিতে গল্প উপন্যাস কবিতা ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও প্রবন্ধাদি, যেমন সব কাগজে থাকে, তেমনি থাকিবে — অধিকন্তু থাকিবে মেয়েদের জ্ঞাতব্য ও ব্যবহারিক দিক, যাহা বর্ত্তমানে অন্য কোন পত্র-পত্রিকায় থাকে না।. . . . আমরা পরিকল্পনা করিয়াছি যে মহিলাতে সাহিত্য ছাড়া, রূপচর্য্যা, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, দেহচর্চ্চা অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যায়াম ইত্যাদি, গৃহ ও গৃহস্থালী, সেলাই, রান্না, পরিচ্ছদ, চিত্রকলা ও আল্‌পনা, সঙ্গীত, কুটীরশিল্প, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, শিক্ষা, নারী জাতির জ্ঞাতব্য ও আলোচ্য প্রশ্নোত্তর এবং কন্যা, জায়া ও জননীর কর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা থাকিবে। এতদ্ভিন্ন দেশ-বিদেশের নারী, সাময়িক অনুবাদসাহিত্য, মেয়েদের উল্লেখযোগ্য রচনার নাম, মেয়েদের সভা-সমিতির সংবাদ, মেয়েদের

অভাব-অভিযোগ, মেয়েদের খেলাধূলা প্রভৃতির সংবাদও নিয়মিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।"

'মহিলা'র ২য় বর্ষ থেকে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী আশা দেবী এম. এ. সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সম্পাদনা পরিষদের সভানেত্রী ছিলেন।

(৪৪) 'মহিলা মহল' ঃ 'মহিলামহল' একটি মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত অ-দলীয় পাক্ষিক পত্রিকা। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাসে প্রথম প্রকাশ পায়। চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে (আষাঢ় ১৩৫৭) মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সম্পাদিকার দায়িত্বে ছিলেন প্রথমে শ্রীমতী অঞ্জলি সরকার এম. এ, শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায় এম. এ. ও শ্রীমতী গীতা বোস। দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ় থেকে অঞ্জলি সরকার একাই সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। পরবৎসর ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র থেকে 'মহিলা মহলে'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন গীতা বোস। প্রথম সংখ্যার সম্পাদিকাগণের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ 'অতি অল্পসংখক বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্রের মধ্যে 'মহিলামহলে'র একটি বিশিষ্ট আসন প্রাপ্য, কারণ, এর পরিচালনা এবং সম্পাদনার সম্পূর্ণভার নিয়েছেন মেয়েরা। বর্ত্তমান সমস্যা-বিড়ম্বিত দিনে মেয়েদের এমন একটি মুখপত্রের অবশ্যই প্রয়োজন যার ভিতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের অসংখ্য সমস্যা সম্বন্ধেও নিজেরা আলোচনা করতে পারেন। এমনকি সমাজকে সচেতন করতে পারেন, বিবিধ দুরারোগ্য কঠিন ও জটিল রোগ যা আমাদের সমাজজীবনকে নানাভাবে বিপন্ন করে ব্যক্তি ও সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। আর পারেন জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে। শুধু সাহিত্যের পসরা নিয়ে ভাবরাজ্যে বিচরণ করবার জন্যে 'মহিলা মহলে'র আবির্ভাব নয়—মেয়েদের জীবনের সত্যিকারের যে সব সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে ক্ষয়রোগের মতো মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্যজীবনকে নষ্ট করছে তার সমাধান করা এবং সমাজজীবন থেকে নানাবিধ কু-আচার ও কু-নীতিকে বিদেয় করতে 'মহিলামহল' কৃতসঙ্কল্প। 'মহিলামহল' নামকরণের উদ্দেশ্য নয় পুরুষদের এর এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করা, যেভাবে যেটুকু সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে, অকুণ্ঠিত এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করা হবে। তবে মেয়েদের উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশে যেন বাধা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এই অ-দলীয় পত্রিকাটি।"

(৪৫) 'সংগঠন' ঃ 'সংগঠন' একখানি পাক্ষিক পত্রিকা। প্রথমে কাগজখানির সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২রা শ্রাবণ কাগজখানি আত্মপ্রকাশ লাভ করে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের মন্তব্যে এরূপ লিখিত হয় ঃ 'সংগঠন' সাহিত্যিক ও সাহিত্যে ঘেঁষা পত্রিকা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জাতির ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির ও সংযমের যথাযথ বিকাশে যে রচনা সাহায্য করিবে ও যে রচনার প্রয়োজন থাকিবে তাহাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 'সংগঠনে'র বিশেষ অঙ্গ হইবে 'চিন্তয়সি', সংবাদসংগ্রহ, গঠনকর্ম্ম-বিবরণ, কর্ম্মী, সংবাদ, জাতীয় সঙ্গীত ও স্বরলিপি, জাতীয় পুস্তক পরিচয় ও প্রশ্ন উত্তর। এতদ্ভিন্ন গঠনকর্ম্মবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও সমস্যা কর্ম্মিগণের ও বিশেষজ্ঞগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে এবং গঠনকর্ম্মিগণ যে ভাবধারা দেশে সঞ্জীবিত করিতে চাহেন তাহার দ্রুত প্রচারের জন্য উপযুক্ত প্রচার পদ্ধতি ও তাহার জন্য বিশেষভাবে লিখিত গান, নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হইবে । জাতিগঠনের মূলনীতি ও বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাহাতে এই গঠন কর্ম্মের সাহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই 'সংগঠনে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।"

শচীন্দ্রনাথ আততায়ীর হাতে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর । শচীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী অংশুরাণী মিত্র পঞ্চম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ থেকে সংগঠনে'র সম্পাদন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সপ্তম সংখ্যা অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'সংগঠন' মাসিকপত্রে পরিণত হয়।

(৪৬) 'বেগম' ঃ 'বেগম' নামের পত্রিকাখানি মুসলিম মহিলাদের সম্পাদনায় বাহির হয় । এখানি 'মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক' পত্রিকা । ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৩রা শ্রাবণ, ইংরাজীর ১৯৪৭ সালের ২০শে জুলাই সুফিয়া কামাল ও নূরজাহান বেগম যুগ্মভাবে এর সম্পাদনা কার্য্যে অংশ নেন। "নারীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল তথা দেশের ও দশের উন্নতি ও মঙ্গলসাধন এই সাপ্তাহিকের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য"। পরবর্তী ১ম বর্ষের ১২শ সংখ্যা, (ইংরাজী ২রা নভেম্বর) থেকে নূরজাহান বেগম একাই এর পরিচালনা করতেন।

(৪৭) 'শতাব্দী' ঃ 'শতাব্দী' পত্রিকাখানি সুজাতা ঘটক ও মুরারি দে-র সম্পাদনায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে প্রকাশিত হয় ।এখানিও মাসিক পাত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক তাঁর ভাষণে নিম্নরূপ বক্তব্য রাখেন ঃ "বাঙ্গলার এক দুর্যোগময় সঙ্কট মুহূর্ত্তে 'শতাব্দী' আত্মপ্রকাশ করল। বাঙ্গলার আকাশ বাতাস আজ

দুঃখ ভারাক্রান্ত । শারদশ্রী আজ বাঙ্গলাকে আনন্দ দান করতে পারছে না। আজ বাঙ্গালা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বিমর্ষ। আমাদের জাতীয়জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের মুখে বাঙ্গলাকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে বিভক্ত হতে হয়েছে । ..... "নূতন জাতি, নূতন দেশ গঠন করবার মহান্ ব্রতে আমরা সবাইকে আহ্বান করি। ..... আজ মায়ের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা নেব।—আমরা বৃথা সময় ক্ষেপণ করবো না, প্রতিটি মুহুর্ত্ত আমরা জাতিগঠন মূলক কর্ম্মে নিযুক্ত করবো, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজেদের মনকে পঙ্কিল করে তুলবো না, জাতির কল্যাণে মনকে সব সময় নিয়োজিত করবো । আজ আমাদের একটি মাত্র ব্রত, সে ব্রত হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলা...। "সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধ্বংস করে, তারই উপর আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আদর্শ সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মহান্‌ব্রত নিয়ে আজ সবাইকে বৃহৎ সংহতির সাধনায় নিয়োজিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন তা কে নৈতিক সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন—'শতাব্দী'র ব্রত হচ্ছে সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা । শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'শতাব্দী' জনগণকে সচেতন করে তুলবে। তাই 'শতাব্দী' আজ তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেঃ তাদের সকল শক্তি দিয়ে 'শতাব্দী'র ব্রতকে সার্থক করে তুলুন।"

'শতাব্দী' দীর্ঘ পরমায়ু পায়নি। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে আর একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছিল 'শতাব্দী'র বিশেষ শিশু ও মহিলা সংখ্যা।'

তথ্যপঞ্জী ঃ

১) প্রাচীন ভারতে নারী, ক্ষিতিমোহন সেন, মাঘ, ১৩৩৮, পৃ: ২৪।

২) প্রাচীন ভারতে নারী, ক্ষিতিমোহন সেন, মাঘ, ১৩৩৮, পৃ: ৩৫।

৩) Bengal Past and present, Diamond Jubilee Number, Vol., LXXXVI, July- December, 1962, "The conflict within the Bengal Renaissance" by Susobhan Chandra Sarkar, P-106.

৪) ইতিহাস চর্চ্চা, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বার্ণিক রায় সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, মাঘ, ১৩৯৩, উনিশশতকী বাঙ্গালীর পুনরুজ্জীবন প্রবন্ধ, পৃ: ৩৯-৪০।

৫) Bengal Past and present, Diamond Jubilee Number, Vol., LXXXVI, July - December, 1962, "The conflict within the Bengal Renaisance" by Susobhan Chandra Sarkar, P-108.

৬) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৩৬৪, পৃ: ৯৫ ।

৭) বাংলার সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮ - ১৮৬৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, চৈত্র, ১৩৫৯, পৃ: ১৯।

৮) বাঙ্গালী নারী, সাহিত্যে ও সমাজে, আনিসুজ্জামান, এক্ষণ পত্রিকা, শারদীয় ১৪০১,

পৃ: ২৩।

৯) Bethune College Centenary Volume 1879 - 1979 (Calcutta) "The christian Missionaries and Female Education in Bengal (First Half of the Nineteenth Centrury by Dr K. P. Sen Gupta, P-134

১০) 'আধ্যাত্মিকা, প্যারিচাঁদ মিত্র, কলিকাতা ১২৮৬, P- i.

১১) Bethune College Centenary Volume 1879-1979 (Calcutta) "Literary Education of the Bengali Female in the Past by Sukumar Sen, P-131

১২) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, ৩য় খন্ড, বিনয় ঘোষ, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৬, পৃ. ১৩০। (সুলভ পত্রিকা, ২য় খন্ড, ১-২ সংখ্যা, ১২৬১ সাল)।

১৩) Missionaries and Education in Bengal 1793 - 1837 by M A Laird (Oxford 1972), P-133.

১৪) A Social History of Modern Indian-Kali Kinkar Dutta (1975), P-150.

১৫) ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৫১), পৃ: ৫৮।

১৬) বামাতোষিণী — প্যারিচাঁদ মিত্র, (১২৮৮/ইংরাজীর ১৮৮১), পৃ: ২৭।

১৭) 'সাহিত্যে নারী, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, অনুরূপা দেবী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী কর্ত্তৃক প্রদত্ত লীলা লেকচারস্, ১৯৪৭, পৃ: ১১৯।

১৮) 'সাহিত্যে নারী, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, অনুরূপা দেবী, ১৯৪৭, পৃ: ১১৯ ।

১৯) 'সাহিত্যে নারী, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, অনুরূপা দেবী, ১৯৪৭, পৃ: ১২০ ।

২০) 'সাহিত্যেনারী, স্রষ্টী ও সৃষ্টি, অনুরূপা দেবী, ১৯৪৭, পৃ: ১২০-১২১ ।

২১) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা, ৭ই মে ১৮৪৯/২৬ শে বৈশাখ ১২৫৬, পৃ· ৪। (এই তারিখে বেথুন সাহেবের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের উদ্বোধন হয়েছিল। 'প্রভাকরে' অবশ্য স্কুলের নাম লেখা হয়েছিল 'বিক্টরিয়া বাংলা বিদ্যালয়'।)

২২) Bethune College and School Centenary Volume 1849-1949, 'সাহিত্যে বঙ্গমহিলা' প্রবন্ধ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৯৬।

২৩) চিত্তবিলাসিনী কাব্য - কৃষ্ণকামিনী দাসী, (কলিকাতা ১৮৫৬), ভূমিকা, পৃ: ২-৩।

২৪) বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ২য় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬০, পৃ: ১০।

২৫) চিত্তবিলাসিনী — কৃষ্ণকামিনী দাসী, কলিকাতা ১৮৫৬, ভূমিকা, পৃ: ৩।

২৬) চিত্তবিলাসিনী—কৃষ্ণকামিনী দাসী, কলিকাতা ১৮৫৬, 'আত্মপরিচয়' কবিতা পৃ: ৪।

২৭) তদেব পৃ: ৪-৫।

২৮) চিত্তবিলাসিনী—কৃষ্ণকামিনী দাসী, কলিকাতা ১৮৫৬, ভূমিকা, পৃ: ২।

২৯) The Calcutta Review, Vol. IV, July to December 1846, P-416.

৩০) 'অধিবেদন', বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ—'চিত্তবিলাসিনী', পৃ: ১৫৭।

৩১) 'চিত্তবিলাসিনী', ব্রহ্মবন্দনা, কৃষ্ণকামিনী দাসী, পৃ: ১ (বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দু'টি মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ৯৭)।

৩২) রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, দশম খন্ড (প্রবন্ধ), পঃ বঃ সরকার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২৭)।

৩৩) বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২য় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণেরকথা।

৩৪) নারী জাগৃতি ও বাংলাসাহিত্য— ডঃ জ্ঞেনেশ মৈত্র, ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৮৭, পৃ: ৭৪।

৩৫) কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে ? বামাসুন্দরী দেবী (১৮৬১) ভূমিকা - শ্রী লোকনাথ মৈত্রেয়, পৃ:/০-২/০। মূল বইতে মুদ্রিত ১২৮৩ শক সম্ভবতঃ ছাপার ভুল।

এটি হবে ১৭৮৩ শক অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

৩৬) কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে? বামাসুন্দরী দেবী (১৮৬১) 'স্ত্রীশিক্ষার পরিচয়', পৃঃ ১৭।

৩৭) কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে? বামাসুন্দরী দেবী (১৮৬১) 'স্ত্রীশিক্ষার পরিচয়, পৃঃ ১৫।

৩৮) বামাবোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১২৭১, 'বামাগণের রচনা', পৃঃ ২২৯।

৩৯) বিদ্যা দারিদ্র্যদলনী কাব্য — হরকুমারী দেবী, কলিকাতা, ১৭৮৩ শক, পৃঃ ১১।

৪০) 'আমার জীবন - রাসসুন্দরী দেবী, নূতন সংস্করণ, ৭ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩, পৃঃ ৪০।

৪১) তদেব, প : ৫৬।

৪২) 'আমার জীবন - রাসসুন্দরী দেবী, নূতন সংস্করণ, ৭ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩, পৃঃ ৪০-৪১।

৪৩) তদেব, পৃঃ ৩২।

৪৪) 'আমার জীবন - রাসসুন্দরী দেবী, নূতন সংস্করণ, ৭ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩, পৃঃ ৮৯।

৪৫) বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষা, হেমশ্রী জানা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০০, পৃঃ ১০।

৪৬) 'আমার জীবন - বাসসুন্দরী দেবী, নূতন সংস্করণ, ৭ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩, পৃঃ ১৯-২০।

৪৭) তদেব, প : ২৪।

৪৮) তদেব, প :২৫

৪৯) 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৮৫১, পৃঃ ৩৯। (গ্রন্থটি ডেভিড হেয়ার স্মারক সভার আহ্বানে লিখিত ও পরে পুরস্কৃত হয়। এর প্রথম সংস্করণ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।)

৫০) সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, পৃঃ ২-৩।

৫১) তদেব, পৃঃ ৪। বি.দ্র.ঃ সম্পাদিকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

৫২) সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, পৃঃ ৬।

৫৩) তদেব, পৃঃ ১৫।

৫৪) 'ভারতী' সম্পাদকীয় মন্তব্য, ১২৮৪, শ্রাবণ, ইং ১৮৭৭

৫৫) আমার বাল্যকথা - সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩, অনন্য প্রকাশন।

৫৬) ইন্দিরাদেবী সংকলিত 'পুরাতনী'।

৫৭) সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত ১৬/১১/১৮৬৩ তারিখের চিঠি, ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী' থেকে।

৫৮) সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত ২/৭/১৮৬৪ তারিখের চিঠি, ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী' থেকে।

৫৯) সৌদামিনী দেবী — পিতৃস্মৃতি

৬০) আমার বাল্যকথা — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪।

৬১) আমার বাল্যকথা —সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪-৫।

৬২) 'বালক'—সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২ পৃঃ ১০৬।

৬৩) 'দ্বিজেন্দ্রনাথ, পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়। (সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ষ্ঠ খন্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৭)

৬৪) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ('ভারতীর ভিটা' বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২১)

৬৫) 'জীবনস্মৃতি', সাহিত্যের সঙ্গী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ীর কথা — শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাময়িক সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রতিফলিত বাঙালী জীবন

ক. পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঃ

পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশের আকাশে যে ঝড় উঠেছিল, তার গতিবেগ প্রথমটায় সামান্য হলেও পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এই ঝড়ের উৎসে ছিল পাশ্চাত্য ভাবধারায় ইংরাজী শিক্ষিত উদার প্রগতিপন্থী 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে নব্যযুবকবৃন্দের সহিত প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল দলের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে পুরাতনের মধ্যযুগীয় জীর্ণশীর্ণ কু-প্রথা, কুসংস্কারের আচার বিচারের গ্লানি ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ্ হয়ে গেল। যদিও এতে সময় লেগেছিল অনেক।

তখনকার সমাজচিত্র আলোচনা করলে বোঝা যাবে কি পরিমাণ আবর্জনা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছিল । ঝড়ের ফলে দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্প, আবর্জনা দূর হয়ে আস্তে আস্তে ভোরের সুশীতল মুক্ত বায়ুপ্রবাহ বইতে লাগল। এরজন্য দায়ী দীর্ঘদিনের পরাধীনতা, বিভিন্ন জাতির ভারতের উপর আধিপত্য, লুণ্ঠন, শোষণ, পীড়ন প্রভৃতি। অশিক্ষার অন্ধকারে ভারতবাসীর আপাদমস্তক ডুবে গিয়েছিল। বদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে যখনই মুক্তবায়ুর প্রবেশ ঘটতে শুরু করেছিল, ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসী সে সুযোগ গ্রহণ করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। সেই সুযোগ ঘটেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মারফৎ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভবধারায় প্রথমে বাঙ্গালী আপ্লুত হয়েছিল। প্রথম বেগ ধারণ করতে গিয়ে বঙ্গবাসী কিছু দিশাহারা হলেও হাল ধরতে সক্ষম হয়েছিলো। সেকালে বঙ্গ ললনাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন ছিল তা উপলব্ধি করবার জন্য পুরুষ পরিচালিত সাময়িক সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কিত আলোচনারূপ প্রেক্ষিতটি তুলে ধরা দরকার। পরে সেই আলোকে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বঙ্গনারীর পারিবারিক ও

সামাজিক জীবন সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই সূত্রে বঙ্গদেশের প্রথম পুরুষ রামমোহন রায়। যিনি বুঝতে পেরেছিলেন দীর্ঘদিনের স্তূপীকৃত আবর্জনার হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় দেশের কুসংস্কার দূর করা ও নারী পুরুষ উভয়ের সমান শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। আমাদের দেশীয় যে কু-প্রথার উপর তিনি প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা হল সতীদাহের মত নির্মম-নিষ্ঠুর প্রথাকে সমাজের বুক থেকে উপড়ে ফেলা। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা রামমোহনের পূর্বেও অনেকে করেছিলেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে বহু ইংরাজ রাজকর্মচারী ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ এই নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে বন্ধ করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি নানাকারণে। সুপ্রীমকোর্ট তার নিজের এলাকায় এবং ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসী শাসকেরা চন্দননগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে রামমোহনের জোরালো যুক্তি ও প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল এমনই, যার ফলে সরকার আইন করে এই প্রথা বন্ধ করতে সমর্থ হন। একই ভগবানের সৃষ্টি নারী ও পুরুষ। নারীর প্রতি পুরুষের নির্মম অত্যাচার তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করেছিল। বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা যা সমাজের অভিশাপস্বরূপ তা নারীকে সহ্য করতে হত। সকলের আগে নারীকে এর হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে সমাজের তথা দেশ ও জাতির মঙ্গল আসবে না। সমাজের মঙ্গল না এলে আমাদের পরাধীনতাও ঘুচবে না। এক পায়ে দাঁড়িয়ে কোন জাতি উন্নতির স্বপ্ন দেখতে পারে না। সমাজজীবনের পঙ্গুত্ব মোচন করতে হলে নারীর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। নারী ও পুরুষ সমাজদেহের এই দুটি স্তম্ভের উপর জগৎসংসার টিকে আছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা ভাবা যান না। পক্ষী যেমন একটি ডানার সাহায্যে উড়তে পারে না, তেমনি নারী পুরুষ উভয়ের উন্নতি ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না।

তখন কি করুণ অসহায় অবস্থা ছিল নারীর। তখনকার সমাজের নারীর অসহনীয় দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবনের কিছু কিছু চিত্র বিভিন্ন লেখক লেখিকার লেখা থেকে জানা যায়, সেযুগে নারীর না ছিল কোন কিছু চাইবার সাহস, না ছিল কোন দাবী। শিক্ষা তো দূরের কথা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের জীবন চলেছে 'রাঁধার পরে খাওয়া, আর খাওয়ার পরে রাঁধা' এই গতানুগতিক পদ্ধতিতে। অবশেষে

তাদের জীবনে নেমে আসত শেষ পরিণতি—মৃত্যু। রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' পড়লে বোঝা যায়, কি অসহনীয় অবস্থা ছিল নারীর জীবন ঘিরে। লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি নারী বলে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সেযুগে নারীর লেখাপড়া শেখার কোন অধিকার ছিল না।

গত শতকে সাধারণ গৃহস্থঘরে নারী ছিল জঞ্জালের মত। এমনই রীতি ছিল যে মেয়ে জন্মালে আতুরঘরে পদাঘাত করে তাকে এই পৃথিবীতে অভ্যর্থনা করা হতো। বিভিন্ন গ্রাম্য প্রবচনে শোনা যায় ঃ -

মেয়ের নাম ফেলি
পরে নিলেও গেলি
যমে নিলেও গেলি

মেয়েছেলেমাটির ডেলা
টপ করে নে জলে ফেলা ।

দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও কু-সংস্কার নিয়ে রামমোহন গভীরভাবে চিন্তা করতেন। রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত হয় ১৮১৫ সালে। এই 'আত্মীয়সভা'তে রামমোহন নারীজাতির নানান সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। 'সহমরণ' বিষয়ে রামমোহন যে পুস্তকগুলি লেখেন তাতেও স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত হত। 'সহমরণ বিষয়ে' দ্বিতীয় পুস্তকে রামমোহন লেখেন ঃ "প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগাকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রী-লোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?"[১] রামমোহনের প্রতিপক্ষরা শাস্ত্রের দোহাই, সতীর ইচ্ছা, পারলৌকিক পুণ্যলাভ ও দেশাচারের দোহাই দিয়ে নারীকে পতির মৃত্যুর পর পুড়িয়ে মারাই শ্রেয় মনে করতেন। একথা ভাবতেও অবাক লাগে যে 'সতীদাহ প্রথা' নিষিদ্ধ হবার বহুবছর পরেও প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৬০ সালে 'রামারঞ্জিকা' পত্রিকাতে সহমরণের বিষয়ে গৌরব প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের লোকের

শিশুকাল থেকে পশু হত্যা দেখে দেখে স্ত্রীলোকের মরণকালীন কাতরতা তাঁদের চিত্তে দয়ার উদ্রেক করত না।১৮২৯ সালে 'সতীদাহ প্রথা' আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বিধবা বিবাহের প্রশ্নটি সামনে এসে পড়ে।

সমাজে প্রচলিত সতীদাহ, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার ফলে নারীর জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছিল। কুলীনপাত্রে কন্যার বিয়ে হলে বংশগৌরব বৃদ্ধি পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু মৃত্যু পথযাত্রী কুলীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া হত। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই বালবিধবা নারীকে সংসারে অশেষ গ্লানি ও বঞ্চনা সহ্য করে পরাশ্রিত জীবন যাপন করতে হত। একমাত্র মৃত্যুই তাকে বন্দিনী জীবন থেকে মুক্তি এনে দিতে পারত। নব্যশিক্ষিত 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের এক প্রতিনিধি মহেশচন্দ্র দেব এক বন্দিনী মহিলার করুণ চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তার বক্তব্যে : *''The woman lay, condemned to a life of long prison, a helpless prostrate and pathetic figure with enfeebled health, her naturally keen senses dulled through in action, without the light of knowledge illuminating her vision, steeped in ignorance and prejudice, groping in the dark, a martyr to the convensions of the society in which she had been born ...... Nothing can be morestrikingly deplorable than the wretched situation of the companion of man in this part of terraqueous globe.''*[২]

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বহু নারীর ভাগ্যে অকালবৈধব্যের করাল কালো রেখা অঙ্কিত হত। বালবিধবার সংখ্যা সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখনকার সমাজে যারা প্রভাবশালী ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাদের পরিবারে একটিমাত্র কন্যা যদি বালিকা বয়সে বিধবা হয়, তার বৈধব্যকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সংকট দেখা দিত। এই সংকটের সমাধান করার জন্য তাঁরা অনেকেই বিধবা বিবাহ প্রচলন করার চেষ্টাও করেছেন অনেক সময়। রাজা রাজবল্লভের বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা এই ধরণের কোন ঘটনা বলে মনে হয়। তবে তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি।

'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' গ্রন্থের লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এ

সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্র সমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধরাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হৃদয় হইয়া, বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থার জন্য পূর্বপশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলের পন্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পন্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পন্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পন্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজাকৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পন্ডিতগণেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব।"[৩]

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে রাজা রাজবল্লভের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর একশ বৎসরের মধ্যে এই ধরণের আর কোন চেষ্টা হয়নি। সাধারণ লোকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে হয়ত পন্ডিতদের বিধান আদায় করতে পারেননি। অষ্টাদশ শতকের সমাজের কিছু লোকের মনে এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। উনিশশতকের গোড়া থেকেই কিছু জনমানসের এই ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করার প্রবল চেষ্টা শুরু হয়।

নারীর জীবনে বাল্যবৈধব্যের সমস্যা এনেছিল কৌলীন্য প্রথা ও পুরুষের বহুবিবাহ। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টি কুল-লক্ষণ নিয়ে বল্লালসেন যে কৌলীন্য প্রথার জন্ম দিলেন, পরবর্তীকালে তা সমাজে এক ভয়ঙ্কর সমস্যা নিয়ে এল মেয়েদের জীবনে। এক একটি কুলীনপাত্র বহু বিবাহের সময় অভিভাবকের নিকট হতে প্রচুর মর্যাদা মূল্য আদায় করতেন। সেই সব কুলীনদের তাদের স্ত্রীর ভরণ পোষণের কোন দায় ছিলনা। স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে আবার অন্যত্র আরো বহু মেয়ের কুলরক্ষায় তাঁরা মেতে উঠতেন। এইসব কুলীনেরা নানা বদ্‌নেশার বশীভূত ছিলেন। শ্বশুর বাড়ী ঘুরে ঘুরে টাকাকড়ি আদায় করতেন। যেখানে প্রাপ্তির আশা থাকত বেশী সেখানে রাত্রিবাস করতেন।

রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'য় নানা বিষয় আলোচিত হত— জাতিভেদপ্রথা, পৌত্তলিকতার সমস্যা যেমন থাকত, তেমনি মেয়েদের সামাজিক দুর্দ্দশার কারণ,

সতীদাহ, বাল্যবৈধব্য, বহুবিবাহ, নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলিও আলোচনায় স্থান পেত। ১৮১৯ সালে এই সভার একটি বৈঠকের বিবরণে দেখা যায় : *"At the meeting in question ..... the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned ...... "*[৪] তিরিশের দশকের গোড়া থেকেই ডিরোজিও ও তার ছাত্রশিষ্যদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের বৈঠকে নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। 'ইয়ংবেঙ্গল' দল হিন্দুজাতির কু-সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকে আঘাত করেন। তাদের সংগ্রামের একমাত্র ভাষা হল— *'Down with Hinduism ! Down with orthodoxy.'*

উনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে ভারতীয় 'ল' কমিশন শিশুহত্যা প্রথার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে হিন্দু বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আইন প্রণয়নে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তৎকালীন 'ল' কমিশনের সেক্রেটারী জে. পি. গ্রান্ট ১৮৩৭ সালের ৩০ শে জুন হিন্দু বিধবাদের পুনর্বার বিবাহ দেওয়ার জন্য কোন আইন পাশ করা যায় কিনা এ বিষয়ে মতামত জানতে কলিকাতা, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের কাছে এক পত্র লেখেন। এই সব আদালতের বিচারকগণ তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজের সদর আদালতের বিচারকগণ সকলেই পত্রোত্তরে আলাদা আলাদাভাবে জানান : হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমাজে যে নানা রকমের কুফল দেখা দিচ্ছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও, কোর্টের মত হল এই ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য আইন পাশ করা হলে তা ভারতীয় জনসমাজের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করা হবে। (প্যারা ২)

হিন্দুরা বিবাহকে একটা বিধানিক চুক্তি বলে মনে করে। .... হিন্দুরা সকলে বিশ্বাস করে এবং শাস্ত্র বচনেও তাই যে, বিধবারা পুনর্বিবাহ করলে কেবল যে ইহ জগতেই হেয় প্রতিপন্ন হয় তাই নয়, পরলোকে স্বর্গবাস থেকেও বঞ্চিত হয়। (প্যারা ৩)

জাতিগত প্রথা ও সামাজিক প্রথা দুয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে আইন

পাশ হলে । (প্যারা ৪)

তাছাড়াও এই আইন পাশ করা হলে হিন্দু দায়ভাগের মূল ভিত্ পর্যন্ত নড়ে উঠবে । (প্যারা ৫)[৫]

১৮৩৭ সালের ৩১ শে জুলাই ফোর্ট সেন্ট জর্জের সদর আদালতের রেজিষ্টার ডবলিউ ডগলাস গ্রান্টের পত্রের উত্তরে লেখেন ঃ ভারতের হিন্দুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, দেশাচার ও সামাজিক প্রথার প্রতিঅন্ধ আনুগত্য। তাতে হস্তক্ষেপ করলে তাদের বিরাগ ভাজন হতে হবে। বিধবাদের পুনবির্বাহ প্রথা হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে । সাধারণত উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজেই এই প্রথা নিষিদ্ধ দেখা যায়। সুতরাং আইনের জোরে এই পুনবির্বাহ প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা করলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করতে পারেন যে ভিন্নধর্মী বিদেশী সরকার আইনের বলে তাঁদের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সমস্তরভুক্ত করে দিচ্ছে। .... হঠাৎ আইনের আঘাতে ধূলিসাৎ করে দেওয়া বিচক্ষণের কাজ হবে না। (প্যারা ৩)[৬]

১৮৩৭ সালের ১১ই আগষ্ট এলাহাবাদ সদর আদালতের রেজিষ্টার এইচ. বি. হ্যারিংটন সাহেব গ্রান্টের উক্ত পত্রের উত্তরে লেখেন ঃ হিন্দুপরিবারে নারীর যে বিশেষ স্থান ও মর্যাদা আছে তার গুরুত্ব তাঁদের কাছে অত্যন্ত বেশী। হিন্দু বিধবাদের দুঃখকষ্টকে তাঁরা পীড়াদায়ক বলে মনে করেন না। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, নীতি ও ধর্মরক্ষার জন্য এইটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা প্রত্যেক হিন্দুবিধবার অবশ্যকর্তব্য। বিধবারা পুনবির্বাহ করলে শুধু যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে, তাই নয়, সমাজের চোখে যে পরিবারের বিধবারা তা করবে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হবে । এই জন্যই এ বিষয়ে কোন আইন পাশ করার যথেষ্ট গুরুদায়িত্ব আছে। (প্যারা ২) "তবে মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাশ করলে নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত কাজই করা হবে ; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে তা করলে জনসাধারণের অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে আঘাত করা হবে। (প্যারা ৩)[৭]

এ সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিধবাবিবাহ আলোচনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছিল। ১৮৩৭-৩৮ সালে ভারতীয় 'ল' কমিশনও বিধবাবিবাহের জন্য আইন প্রণয়নের প্রশ্ন সোজাসুজি উত্থাপন করেন। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল

'স্পেক্টেটর' ১৮৪২ সালে লেখেন "যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয়। .....'[৮]

১৮৪২ সালের জুলাই মাসে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর আবার লেখেন ঃ 'এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃ স্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না . . . . ।' এই সময় সমাজসংস্কার বিষয়কে কেন্দ্র করে দুটি দল - সংস্কার পন্থী ও সংস্কার বিরোধী গড়ে উঠে। ছোট ছোট দল উপদলও ছিল । কিন্তু তাঁরা চরমপন্থী ছিলেন না। আসলে সংস্কার সকলেই চাইতেন । কিন্তু তাঁরা কোনরূপ বিতর্কে নিজেদের জড়াতে চাইতেন না। সংস্কারকে কেন্দ্র করে তাঁরা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে সরব ছিলেন 'ইয়ংবেঙ্গল' দল।

১৭৭৬ শকের ফাল্গুনমাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' — এই শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন । ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই নামে তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশ পায় । এই বছর অক্টোবর মাসে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠান ।

'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়ী লোক দলবদ্ধ হয়ে একটি বিধবা বিবাহ দেবার জন্য উদ্‌যোগী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার জন্য পন্ডিতদের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন । এই ব্যবস্থাপত্রে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত স্মার্তপন্ডিতেরা স্বাক্ষর করেছিলেন । পরে এই পন্ডিতেরাই বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন

কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রও বিধবাবিবাহ বিষয়ে পন্ডিতদের দিয়ে বিচার করান। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের অনেক আগেই তিনি এবিষয়ে পন্ডিতদের মতামত সংগ্রহ ও খোঁজখবর করছিলেন।

দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র লিখেছেন : "বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পন্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত, তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্বজনহিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে, বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রধান ভয় এই হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রহিত করিবেন। কেহ কেহ কহিলেন, 'যদি আমাদিগকে অন্যের দ্বারে যাইতে না হয়, জীবিকা নির্ব্বাহের এরূপ সংস্থান করিয়া দিতে পারেন, তবে মুক্ত কণ্ঠে আমাদিগের মত প্রচারিত করিতে পারি।"[১০]

বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এইসময় বিভিন্ন স্থানে অনেক আন্দোলন গড়ে উঠে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বিধবাবিবাহের একটি খবর পত্রে প্রকাশিত হয়, "সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে কেরাণীবাবুর পলায়ন এবং বিধবাবিবাহ করণের যে সংবাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এইক্ষণে অবগত হইলাম তাহা যথার্থ বটে, ঐ বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ হইয়াছে, গন্ধর্ব্বমতে কি অন্যপ্রকার তাহা জানিতে পারি নাই, জ্ঞাত হইতে পারিলে বিস্তারিত লিখিয়া পাঠাইব, ইহাকে একপ্রকার নূতন শাস্ত্র সম্মত নূতন মত বলিতে হইবেক।"[১১]

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' পুস্তিকার শুরুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখেন : বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে এদেশে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে কোনক্রমেই প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব অগ্রে ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিবন্ধ করা অতি আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক ।'[১২]

বিদ্যাসাগর মহাশয় জানতেন আমাদের দেশের লোক বুদ্ধি বা যুক্তির উপর নির্ভর করে কাজ করার পরিবর্তে শাস্ত্রবচন অনুসরণ করতেই বেশী আগ্রহী । এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এদেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করে যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রের বচন সন্ধান করতে হয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন ঃ 'বিধবা বিবাহ পুস্তক' প্রচারিত হইবামাত্র, লোক এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিককাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয়, আবার তিনসহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, পুনর্ব্বার দশ সহস্রপুস্তক মুদ্রিত করেন।ঐ পুস্তক এরূপ আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়া ছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া, উত্তর-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া, তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ঐ উত্তর পুস্তকগুলি দেখিয়া, শাস্ত্র জলধি মন্থন পূর্ব্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া, একত্র সংগ্রহ করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক মুদ্রিত করেন।'[১৩]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' যে সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, চতুর্থভাগ, ১৩৯ সংখ্যা) বিদ্যাসাগরের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় ঃ "কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃসংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারম্বার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এবৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসব হয় নাই । শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ব্বমাসের পত্রিকায়

পুস্তকও ঐ অক্টোবর মাসেই প্রকাশ করেন। এতে তিনি বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে গ্রন্থের শেষে ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন। "যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্ অসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।"[১৫]

বিধবাবিবাহের পক্ষে বহু আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে জমা পড়েছিল। বিপক্ষেও বহু আবেদন জমা পড়ে । তার মধ্যে শোভা বাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মার্চ ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদী আবেদন পাঠান। শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধির জয় হল। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই (১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ) তারিখে বিধবাবিবাহের পক্ষে আইন পাশ হয় (Act XV of ১৮৫৬)।

'বিধবাবিবাহ আইন' পাশ হলেও তা কার্যে পরিণত করা খুবই কষ্টকর ছিল। এই আইনের বিরোধিতা করার লোকের অভাব ছিল না। মানুষের সংস্কার সহজে যায় না। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবাবিবাহ আইন পাশ করাতে যেমন অশেষ বেগ পেতে হয়েছিল, তেমনি তা কার্যকর করা ছিল আরো কঠিন। 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্তকবি বিদ্রূপ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন ঃ

"শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্ম্মাণ কারক ।
যাঁরা সবে হতে চান, বিধবা তারক ।।
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে ।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ?
গোলেমালে হরিবোল, গন্ডগোল সার ।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার ।।
. . . .
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায় ।।

সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ ।

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং ঐ বিষয়ই সর্ব্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পন্ডিত মহাশয়েরা শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবা বিবাহের নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতি বিবর্ণ, কীট নিষ্কুশিত, পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি অশেষ গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন ও পর্য্যালোচনা করিতেছেন, কু-সংস্কার পরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের ......পন্ডিত বর্গকে পারিতোষিক প্রদানের আশ্বাস দিয়া বিদ্যাসাগর প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরাজী, কি বাঙলা, এতদ্দেশীয় সমুদায় সংবাদ পত্রই ঐ বিষয়ের কল্পনায়, ঐ বিষয়ের আলোচনায়, ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে ।.... উল্লিখিত পুস্তকে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে। আর যাঁহারা নিরপেক্ষ যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিবেন, বিধবা-বিবাহ এই দন্ডেই প্রচলিত করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গ ম হইবে।[১৪]

১৭৭৬ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এই শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার অল্প পরেই ঐ একই শিরোনামে তাঁর প্রবন্ধ পুস্তিকাও প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত তা তিনি দেশবাসীকে জানিয়েছেন। বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে পরাশর সংহিতা থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন ঃ "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।" অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হলে এই পঞ্চবিধ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নারীর অন্য পতি গ্রহণ করা বিধেয়। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে ৯৮৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ এক আবেদন পত্র পাঠান হয়। এতে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর দ্বিতীয়

সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ।।
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন ।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ।।
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর ।
অকারণে হই হই, উপহাস সার ।।"[১৬]

'সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়? কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়' গুপ্ত কবির সে অভিযোগ বিদ্যাসাগর মহাশয় মোটেই অস্বীকার করেননি। 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবাবিবাহের প্রচন্ড বিরোধী ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থকদের ও প্রধান উদ্‌যোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তীক্ষ্ণবাণে জর্জরিত করেন। বিদ্যাসাগর তাতে মোটেই বিচলিত হয়নি। তিনি শুধু মুখে নয়, কাজেও কথার সত্যতা রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। 'সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন, তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন'—ঈশ্বরগুপ্তের এই মন্তব্যের উত্তর যথার্থই নিজ অর্থে বিধবাবিবাহর ব্যবস্থা ও সমাধা করে দেখিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যেমন প্রতিজ্ঞা ছিল অটল তেমনি সৎসাহসেরও অভাব ছিল না। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানকার্য্য ও ব্যয়ভার বহন করেন। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি।

প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্র হলেন সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ২৪পরগণা জেলার খাটুয়া গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র। আর প্রথম পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। বিবাহ উৎসবে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল । ঐ ঐতিহাসিক তারিখটি ছিল ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬, (শকাব্দ ১৭৭৮, বঙ্গাব্দ ১২৬৩-এর ২৩শে অগ্রহায়ণ। বাংলা ও ভারতের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই প্রসঙ্গে লেখেন ঃ এই বিবাহের জন্য প্রায় ৮০০ নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্যদের জন্য সংস্কৃত ভাষায় আলাদা নিমন্ত্রণ পত্র রচিত হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে নানা রঙ্গ রসিকতা

প্রকাশ পায়। 'সংবাদ প্রভাকর' বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন । বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা শেষে তাদের বিরোধিতার ভাষা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে । 'প্রভাকর' লেখেন— "পাঠকগণ! আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এবং এক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দুবিধবার এই প্রথম বিবাহ কোনক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় না এবং কন্যার খুড়া কিংবা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন ।"[১৭] অনেক বিরুদ্ধবাদী নানা অশ্লীল ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দ্বারা প্রতিবাদ জানান। 'সংবাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'অরুণোদয় প্রভৃতি পত্রিকা' বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠান হয়, প্রথম বিবাহের পরদিন। ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার সহিত পানিহাটি গ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশের হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে। এই বিবাহ প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন ঃ "আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদের চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ....উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শুভবিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্রপরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্রসন্তান কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন।.... বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ পন্ডিতেও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন কোন ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিতহইয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেছেন এবং কোন কোন লোক শোকেতে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা এই ঘটনাকে স্বদেশের চির কল্যাণের কারণ জানিয়া ইহার প্রযোজক ও প্রবর্ত্তকদিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ইহাকে নিশ্চয় ভারতবর্ষের কলঙ্কস্বরূপ ও হিন্দুধর্ম্মের উৎসেদের হেতু মনে করিয়া ইহার

উদ্যোগকর্তা ও উৎসাহদাতাদিগকে নানা প্রকার অশ্রাব্য কটুকাটব্য করিতেছেন।"[১৮] বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা যে মন্তব্য করেন ঃ 'বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে কলিকাল ক্রমে ঘোর হওয়াতে ধর্মাচরণ লোপ পেতে আরম্ভ করল, ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধিনিষেধও লোকের কাছে অমান্য হয়ে উঠল এবং অধর্ম্মের প্রধান্য বাড়তে আরম্ভ করল। তাঁরা তারস্বরে প্রচার করতে লাগলেন যে ভারতবর্ষ থেকে এইবার হিন্দুদের নাম একেবারে লোপ পেয়ে যাবে, এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যগৌরব এইসব অধর্ম্মাচরণের জন্য ম্লান ও কলঙ্কিত হবে।" এই ধর্মাভিমানী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী' আরো লেখেন ঃ 'ধর্ম্মাভিমানী মহাশয়েরা কেন যে বিধবা বিবাহের কথা শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বোঝা যায় না। আসলে ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নেই, কেবল দেশাচারের প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পন্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্ম্মপালক বলিয়া দম্ভ করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এই প্রকার আনন্দের স্থলে তাঁহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘকালের পর শরীরের কোন চিররোগ আরোগ্য হইলে তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত সেইরূপ দেশপ্রচলিত কোন প্রাচীন কুপ্রথার উৎসেদ দেখিয়া খেদ করা অন্যায়।' অবশেষে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লেখেন ঃ 'এক্ষণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্নে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাদিগের উৎসাহে এই চিরবাঞ্ছিত সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্যগুণের বিষয় বর্ণনা না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহৎ ব্যাপার যে কয়েক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টাদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্ত্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।"[১৯]

বিধবাবিবাহ চালু হল বটে কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আরো সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন। বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং চারিদিক থেকে যে সামাজিক

উৎপীড়ন আসত তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য বহু লোক অর্থ সাহায্য নিতেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে যে সব সহৃদয় বিত্তবানেরা অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা সেই সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বিবাহের জন্যও বিদ্যাসাগরের প্রচুর অর্থব্যয় হত। সমাজসংস্কারের দায় বহন করতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন ।

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে নিন্দা ও অকথ্য গালাগালি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর প্রাণসংহারের চেষ্টাও করেছেন শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে 'হিতবাদী পত্রিকা'য় ডাঃ অমূল্যচরণ বসু পরবর্তীতে লিখেছিলেন ঃ বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত, কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কিছু মাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া সোজা তাদের আবাসে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপানার লোকেরা আমাকে মারিবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে খুঁজিতেছে। তাই আমি তাহাদিগকে কষ্ট না দিয়া নিজেই আসিলাম। এখন আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করুন । ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন ।[২০] এসময় বিদ্যাসাগরের পিতা ছেলের জীবনরক্ষার জন্য বীরসিংহ গ্রাম থেকে শ্রীমন্ত নামে এক জেলে সর্দারকে কলকাতায় পাঠালেন। শ্রীমন্ত সর্বদাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকতেন।

বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণ খানাকুল, কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন । বিদ্যাসাগরের সহোদর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র নারায়ণের বিবাহের পূর্বে বিদ্যাসাগরকে যে চিঠি লেখেন, বিবাহের চারদিন পরে ১২৭৭ সালের ৩১শে শ্রাবণ তারিখে তার উত্তরে বিদ্যাসাগর ভাইকে লেখেন ঃ "বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ

নই।..... আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"[২১]

এইভাবে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহযোগী যোদ্ধাগণের সহায়তায় সমাজের বুক থেকে 'সতীদাহে'র পর আর একটি কু-প্রথার পাহাড় প্রমাণ বোঝা অপসারিত হয়েছিল। বালবিধবাগণের জীবনে নেমে এসেছিল স্বস্তির নিঃশ্বাস।

জীবনের শেষে বিদ্যাসাগর দুঃখ করে বলেছিলেন, বিধবা বিবাহের জন্য তাঁর উপর ঋণের বোঝা এত স্তূপীকৃত হয়েছিল যে ঋণ পরিশোধের কোন উপায় না দেখে পুনরায় সরকারী চাকরী করবেন বলে স্থির করেছিলেন। তিনি অতিশয় বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন "আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।[২২]

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার পর মনে আশা রেখেছিলেন যে বহু বিবাহ প্রথাও আইন দ্বারা বন্ধ করা যাবে। তিনি ভারত সরকারের কাছে আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং প্রথমেই তিনি ভারতবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতের ধর্ম বিশ্বাসে কোন রকম আঘাত দেওয়া হবে না। বহুবিবাহ প্রথা আইনদ্বারা রোধ করা না গেলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। ১৮৭১ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দুখানি পুস্তিকা প্রকাশ করে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের পক্ষে সনাতন পন্থীদের উদ্দেশ্যে 'বিদ্যাদর্শন পত্রিকা' কুলীনদের সম্বোধন করে লেখেন: "হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধি পূর্ব্বক আপনাদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, অথচ

আপনারা যে কি গুপ্ত মর্ম্মের আস্বাদ বশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। যদি বলেন বল্লালসেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লালসেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন, অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ঈশ্বর দ্বত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে হেলা করা কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে ? অবশেষে আপনারদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভ কর্ম্মে যাত্রাকালীন সম্মুখদ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে একবার ঈষৎ কটাক্ষ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন, যে অপরদ্বারে কি আশ্চর্য্য পাপের নৃত্য হইতেছে।"[২৩]

'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ' পুস্তকে বল্লানসেনের কৌলীন্যপ্রথার আবশ্যকতা স্বীকার করলেও অক্ষয়কুমার এই প্রথাটিকে যুক্তির দিক থেকে মানতে পারেন নি। তাই তিনি বল্লালসেনকেও 'একজন ভ্রমশীল মনুষ্য' বলেছেন। অক্ষয়কুমার যুক্তি ও মানবিকতা কোন দিক থেকেই এই প্রথাকে স্বীকার করে মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করেন নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে বল্লাল সেনের পশ্চাদ্ধাবন করা কুলীনদের অনুচিত।

'বিদ্যাদর্শন পত্রিকা'র চিঠিপত্র কলমে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ নিয়ে বহু আলোচনা তর্ক বিতর্ক হয়। এই প্রথার সামাজিক কুফল নিয়ে বহু গ্রামবাসী 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় চিঠি লেখেন। একজন গ্রামবাসী লেখেন ঃ কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধকরি বঙ্গদেশের ব্যক্তি মাত্রেরি-বিদিত আছে। যে অবধি এই ঘৃণিত কার্য্যের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্ব্বদাই নগর মধ্যে বসতি করেন, পল্লীগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্য সমাজে যাঁহারা কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারাই বল্লালসেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভার্য্যাগণের পরিত্রাণার্থ মহাশয়কে যত্নশীল দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। এইক্ষণে নিতান্ত মনে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর মহাশয়কে অচিরাৎ কৃতকার্য্য করুন।'[২৪] সুতরাং বল্লাল সেন যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তীকালে তা মহিলাদের

জীবনে অশেষ দুঃখ ও অভিশাপের বিষময় ফল বহন করে এনেছিল। আজকের দিনে তার সঠিক উপলব্ধি একেবারেই অসম্ভব।

কোন সামাজিক কুপ্রথা দীর্ঘকাল ধরে সমাজে প্রচলিত থাকলে পরবর্তীকালে তার উচ্ছেদসাধন করা বড়ই কষ্টকর। কোন একদিন তা আপনা থেকেই নির্মূল হবে একথা ভেবে নিশ্চিন্তে বসে থাকা কোন দেশের সমাজ সংস্কারকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা সম্পূর্ণরূপে সমাজের বুক থেকে উচ্ছেদ করতে হলে কোন রাজনিয়মের আবশ্যক হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপলব্ধি করেছিলেন যে বাল্যবৈধব্য এবং কৌলীন্য ও বহু বিবাহের মত কু-প্রথা যা সমাজের বুকে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে তা একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারাই নিবারিত হতে পারে। বিদ্যাসাগরের সমমনোভাবাপন্ন অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ সালে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় বহুবিবাহের মত সামাজিক কু-প্রথাকে দূর করবার জন্য জনমত সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেন। বিধবাবিবাহ আইন পাশ হলেও তৎকালে বহুবিবাহ নিবারণ আইন রাষ্টীয় হস্তক্ষেপের অভাবে পাশ করা সম্ভব হয়নি।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' গঠিত হয়েছিল। সেই সমিতির পক্ষ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ রোধ করার জন্য প্রথম আবেদন করেন। সেই সমিতির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। "হুগলী জেলার স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথম 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উহার পক্ষ হইতে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় সুতরাং ইহা রহিত করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন প্রেরণ করেন।"[২৫] পরে ঐ একই বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ প্রথা রদ করার জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ এক আবেদন পাঠান। এই আবেদন পত্রে বর্ধমানের মহারাজা অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকেরাও বহুবিবাহ রোধ করলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে বলে প্রতিবাদী আবেদনপত্রে তাদের মনোভাব জানান।

রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বহুবিবাহ রোধ করার

জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। বহুবিবাহ নিবর্তক আইনের জন্য বিলটি রমাপ্রসাদ রায় তৈরী করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য এইসময় তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ পুস্তকে' রমাপ্রসাদ রায়ের কথা উল্লেখ করেন, তবে তার কোন 'কপি' পাওয়া যায়নি। ১৮৬৩ সালে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য যে আবেদনপত্র পাঠান হয়েছিল তাতে ২০ হাজারেরও বেশী ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন যাদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা প্রতাপ সিং, রামচন্দ্র ঘোষাল, যজ্ঞেশ্বর সিংহ, পূর্ণচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ছিলেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় ও অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র বাংলার ছোটলাট সিসিল বিডনের কাছে ১৮৬৬ সালের ১৯শে মার্চ, সোমবার বিকাল পাঁচ ঘটিকার সময় জমা দেওয়া হয়। বর্ধমানের মহারাজা আর একটি আবেদন পত্রও জমা দেন। রাজা সত্যশরণ দুটি আবেদন পত্রই পাঠ করে শোনান। এই আবেদনের উত্তরে ছোটলাঠ যা বলেন তার মর্ম— 'রাজা, সানন্দে আমি আপনাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করছি। আপনারা সমাজের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি....বহুবিবাহের মত একটি সামাজিক কু-প্রথাকে কোন আইন পাশ করে উচ্ছেদ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।....আমি এই সামাজিক প্রথা সংস্কারের জন্য পূর্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, এবং এখন আবার চেষ্টা করব বলে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'[২৬]

অবশেষে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী কমিটি জানান বহুবিবাহ-নিবর্তক আইন প্রনয়ণ করা সমীচীন হবে বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগর এতেও বিচলিত না হয়ে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দুখানি পুস্তিকা' প্রকাশ করেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই রাজবিধির সহায়তা নিয়ে 'সমাজ সংস্কার' অনুমোদন করেন নি। তাঁরা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করেছেন, পছন্দ করে বিয়ে করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

ব্রাহ্মসমাজের সদস্যেরা বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ

রোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র কর্তব্যবোধেই বহু দুঃসাহসিক কাজ ব্রাহ্মরা করেছিলেন। ব্রাহ্মদের জন্য বহু মেয়ে জীবনে সৎভাবে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

বহুবিবাহ হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখেন ঃ বিধাতা হিন্দুসমাজের প্রতি একান্ত বাম। শীঘ্র যে এ সমাজে সৌভাগ্য লাভ হয়, সে সম্ভাবনা নাই। সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঋষিশ্রাদ্ধের কান্ড উপস্থিত হয়। ফল যত হউক না হউক, আড়ম্বরের সীমা থাকে না। অগ্রে শাস্ত্রবিচার আরম্ভ হয়, কিন্তু সে বিচার বিচার নয়, ঋষিহত্যা। উভয় পক্ষই ঋষির বচন তুলিয়া আপনার মনোমত তাহার ব্যাখ্যা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান। ঋষিরা কি উভয়পক্ষেরই যাহাতে মনোরথ পূর্ণ হয়, এইরূপ বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন? এ কি মকদ্দমা কারিদিগের কালীঘাটের স্বস্তয়ণ? যাঁহার যথার্থ মকদ্দমা তিনিও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, আর যাঁহার মকদ্দমা অযথার্থ, তিনিও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, এখন কালী কাহার মন রক্ষা করেন? আমরা এতদিন কৌতুক দেখিতেছিলাম, দুইদল পন্ডিত শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একদল কহিতেছেন বহু বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, আর একদল কহিতেছেন শাস্ত্রসিদ্ধ। নিষেধবাদ দলই প্রবল, আমরা ভাবিতেছিলাম, এবার আর বহুবিবাহের নিস্তার নাই।[২৭] এই মন্তব্যের পর 'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তক' সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ 'আমরা এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল।....বিদ্যাসাগর কুলীনদিগের অত্যাচার ও কুলীন কন্যাদিগের ক্লেশের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িতে অনেকবার আমাদিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। মনে মনে এদেশের পুরুষদিগকে কতই ধিক্কার দিলাম ...প্রস্তাবিত গ্রন্থের অত্যাচার বর্ণনাটাই যে কেবল চমৎকারিণী হইয়াছে এরূপ নহে, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে যে অংশে শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন, সে অংশটীও অতি মনোহারী হইয়াছে।[২৮] বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তক সম্বন্ধে এই ধরণের মন্তব্য ও আলোচনা করে অবশেষে 'সোমপ্রকাশ' গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ

উত্থাপন করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণে সরকার অনেকটা ভয় পেয়েই হয়ত বহুবিবাহ নিবারণ আইন প্রণয়ণে রাজী হয়নি।

সমাজের আর একটি বিষফল ছিল মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা দান। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যদিও নারীশিক্ষার অবরুদ্ধ দ্বার অনেকটাই খুলে যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে মুখে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করলেও, মেয়েদের গৃহবন্ধী করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতাই তাঁরা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে সে রিপোর্ট লেখেন তাতে স্পষ্ট ভাবেই তিঁনি উল্লেখ করেছেন যে দেশের সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবারের মধ্যে মেয়েদের গৃহশিক্ষার আয়োজন করা হলেও, প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাবার প্রয়োজন বা ইচ্ছা এখনও অনুভূত হয়নি। সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকের মন থেকে দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল।

১৮৬৫ সালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষার ৫টি অন্তরায় নিয়ে আলোচনা করেন।

১ম, এদেশের পুরুষেরাই আজ পর্যন্ত ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেনি, সুতরাং তারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হবে কি করে। ২য়, বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে মেয়েরা বেশীদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে না। ৩য়, অল্প বেতনের লোক দিয়ে শিক্ষার কাজ চালানো যায় না। ৪র্থ, ছেলেবেলায় স্কুলে যেটুকু লেখাপড়া শেখে বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মেয়েরা তা ভুলে যায় । এদেশের জাতি ভেদ প্রথার জন্য সাধারণতঃ উপযুক্ত পাত্রে মেয়েদের বিবাহ হয় না এবং সেইজন্য বিবাহের আগে তাদের যে যৎকিঞ্চিত শিক্ষা হয়, তা বৃথা হয়ে যায় । ৫ম, ইউরোপের মেয়েরা নিজেরা বিশেষ রান্নাবান্না করে না, হোটেলে খায়। সুতরাং তাদের লেখাপড়া করার অবসর আছে । কিন্তু এদেশের মেয়েদের যেহেতু গৃহকর্ম ও রান্নাবান্না করতে হয় সেই কারণে তারা লেখাপড়ায় মন দেবার সুযোগ পায় না । [২৯]

'সোমপ্রকাশের' এই মন্তব্যের মধ্যে বাল্যবিবাহের ফলে যে মেয়েরা বেশীদিন লেখাপড়া শিখতে পারেনা এবং যেটুকু লেখাপড়া শেখে শ্বশুড়বাড়ী গিয়ে তা ভুলে যায়--—এদুটি স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রচন্ড বাধা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই।

১৮৬৬-৬৭ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হলে 'সোমপ্রকাশ' বালিকা বিদ্যালয় ও তার ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত না হয়ে ঐ একই মন্তব্য করেন। তাঁরা লেখেন ঃ 'বিদ্যালয় ও পাঠার্থিনীর সংখ্যা যেরূপ হউক, স্ত্রীশিক্ষা যে সামান্যরূপ হইতেছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শীঘ্র ইহার উন্নতি হয়, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।'[৩০]

তৎকালীন সমাজ প্রেক্ষিতটি পুরুষ পরিচালিত সাময়িক পত্রিকাগুলিতে স্ফুটোজ্জ্বল ভাষারূপ লাভ করেছিল। তাঁদের পত্রিকাগুলিতে প্রতিফলিত বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র জটিলতা, দ্বন্দ্ব কুসংস্কার প্রভৃতির অর্গল সংস্কার আন্দোলন, আইন প্রণয়ন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে খসে পড়ছিল। একদিকে প্রাচীন সংস্কার - অনেক ক্ষেত্রেই কুসংস্কার, প্রথাবদ্ধ জীবন, অন্যদিকে নবশিক্ষার আলোকস্নাত প্রগতিশীল জীবন—এই দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচিত হচ্ছিল। অর্ন্তবর্তী কালের সেই দ্বিধাচল অথচ আত্মপ্রকাশে উন্মুখ নারীচেতনা কিভাবে সমাজ সচেতন হয়ে নারী জাগরণে ও নারীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করেছিল এবং নানা ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় আছে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলির বিভিন্ন পৃষ্ঠায়। সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্তরায় সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী' 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলি যেমন সরব হয়েছিল, মহিলা-পরিচালিত সাময়িক পত্রিকাগুলিও তদ্রূপ। এ সম্পর্কে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য - 'বামাবোধিনী' পত্রিকা লেখেন ঃ ''শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে এদেশের লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মৌখিক যেরূপ যত্ন দেখা যায় কার্য্যে সেরূপ অতি অল্পই আছে। বিবাহকাল পর্য্যন্ত কেবল বালিকার্দিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করিয়া ৮/৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগকে বিবাহদিয়া, বিদ্যালয় হইতে অপসৃত করা হয়। এ প্রকারে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।'[৩১] স্ত্রীশিক্ষার প্রধানতম বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের ছাত্রীসংখ্যার হার লক্ষ্য করে এই পত্রিকা নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ 'আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এদেশের সর্ব্বপ্রধান বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টী মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে।....'ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া' সংবাদপত্র লিখিয়াছে যে,

এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেন্টের ইহার শিক্ষার কার্যে (১৪২৭৭৬) এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে ৬০,০০০ ষাটি হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাটীর সংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুদ্ধ ৩০ টী মাত্র সাত আট বৎসর বালিকার সামান্য শিক্ষালাভ হইতেছে, তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে।[৩২]

কি গৃহ পরিবেশ, কি প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার কোন অগ্রগতি না দেখে অতঃপর 'বামাবোধিনী' পত্রিকা আবার মন্তব্য করেন ঃ 'আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর হইল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছি । কিন্তু নগরের কোন ব্যক্তিকেই তাহাতে যোগ দিতে দেখা যায় না ।' এই প্রসঙ্গেই 'বামাবোধিনী' আবার মন্তব্য করেন ঃ 'বাল্যবিবাহ রীতি এদেশ হইতে নির্ব্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে । বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব, প্রতিবর্ষে এত বি. এ, এম. এ হইতেছে কিন্তু স্ত্রী জাতির দুরবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে । আমাদিগের এই বিস্ময় কিছুতেই নিরাকৃত হইল না যে মূর্খ, কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ও সুবর্ণমন্ডিত স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা কিরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করেন? ....আমাদের দেশের অন্তঃপুর যেন একটী সুসজ্জিত ক্রীড়ালয়। তথায় কতকগুলি লাবণ্যবতী সুবর্ণরত্ন মন্ডিতা নরপুত্তলিকা ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তথায় কেবল বেশভূষা, আমোদকোলাহল, পানভোজন, হাস্যপরিহাস দিবানিশি দৃষ্ট হইয়া থাকে । এখন দুইটী স্ত্রী একত্র হইলে বেশভূষা রন্ধনভোজন প্রভৃতি জল্পনা লইয়া কালক্ষয় করে। .....অনেকানেক বিজ্ঞবিদ্ধান এবং দেশহিতৈষীদিগের পরিবারেরও এইরূপ দুর্দ্দশা, তাঁহারা দেশের কুরীতি সংশোধন করিতে যান, কিন্তু নিজ পরিবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহার কোন প্রতিবিধান করেন না। এরূপ দেশহিতৈষণা দ্বারা প্রকৃত ফললাভ হইবে না। যদি পরিবার সংশোধনের চেষ্টা অগ্রে না করা হয় তবে দেশের মঙ্গল চেষ্টা কদাপি হইতে পারে না।...যদি একটী পরিবার সংস্কৃত হয় তাহাতেই প্রকৃত ফল উৎপন্ন হইবে।[৩৩]

'বামাবোধিনী'র এই সমালোচনা অবশ্যই যুক্তি গ্রাহ্য, বাস্তব সত্য। অগ্রে

নিজ পরিবারটির সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রতিটি পরিবার নিয়েই একটি সামাজিক কাঠামো গঠিত হয়। সামাজিক কু-প্রথা দূর করতে হলে পারিবারিক সংস্কার সকলের আগে প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারকদের সেদিকে আদৌ নজর ছিল না। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে কু-সংস্কারগুলি আঁকড়ে থাকতেন অথচ বাইরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুগম্ভীর মতবাদ প্রকাশ করতেন। সংস্কার সহজে যায় না। তা কু-ই হোক, আর সু-ই হোক। সু-সংস্কার পরিবারের বা সমাজের মঙ্গল ডেকে আনে, আর কু-সংস্কার সমাজ তথা পরিবারকে ধংসের দিকে টেনে নেয়। এইসব কারণে তখন স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ফললাভ হয়নি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ-সংস্কার মূলক কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন যে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির ও পরিবারের বাইরের প্রগতির মুখোশ বাস্তব সমস্যার ধাক্কায় কত সহজে খয়ে পড়ে গেছে। ইংরাজীবিদ্‌গণের বাইরে যতটা হাঁকডাক ছিল, ভিতরটা ছিল তুলনায় অনেক ফাঁপা। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের দেশের লোক সামান্য কাজের জন্য শত শত মন ওজনের কথা বলতে অভ্যস্ত। তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। নির্মম অভিজ্ঞতার আঘাতেই তিঁনি স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বাতিল করেছিলেন। এইজন্য তাঁর বহু বন্ধু ও সহযোগীর সঙ্গেও মতভেদ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ত্রিনি নিজের মত প্রকাশ করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেননি। বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে তাঁর নীতির ব্যর্থতা ও পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন।

নানাজনের আপত্তি সত্ত্বেও সরকারী ইচ্ছায় এবং কয়েকজন দেশীয় অত্যুৎসাহীর আগ্রহে কাগজে কলমে স্ত্রী নর্মাল স্কুল হল। বিদ্যাসাগরের মত গৃহীত হল না। স্ত্রী-নর্মাল স্কুল স্থাপিত হলেও তা তিন বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়নি। কারণ শিক্ষিকা জোগাড় করা নিয়ে তীব্র সমস্যা দেখা দিল। কে বা কারা ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হবেন ? খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্মপরিবারের মহিলা হলে চলবে না। ধর্ম্মভয় আছে। হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের তো ১০/১১ বৎসর হলেই বিয়ে হয়ে যায়। কয়েকবৎসর বাক্‌যুদ্ধের পর ১৮৭২ সালের জানুয়ারী মাসে নর্মাল স্কুল উঠিয়ে দেওয়া হল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় আগের মত চলতে লাগল এবং তার ছাত্রীসংখ্যা

ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির বাধা দূর হল ১৮৭৮ সালে। এই বছর থেকে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। ১৮৭৮ সালের ২৭ শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হল : *'That the female candidates be admitted to the University examination, subject to certain rules.'*[৩৪] ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন তরুণ যুবক— দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষার্থীরা প্রবেশের অধিকার পেলেও তাদের কপালে বিরোধিতার গুঞ্জন উঠল । এমনকি ব্রাহ্মরা পর্যন্ত এতদূর স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ সুনজরে দেখলেন না । 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখলেন : 'বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে । প্রতি বৎসরই বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী বালিকাগণেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি আবার বঙ্গীয় অবলাগণ উত্তীর্ণ হইতেছেন । গত তিন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুইজন এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন । আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে অনেকে বি.এ, এম. এ, পরীক্ষাদানে কৃতকার্য্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন, ... কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করিনা । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা কি শুভকর ফল তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি। .....আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস শূন্য ও সুনীতি বিচ্যুত হইবেন।......বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নতিকর ও শুভ ফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান এবং পুরুষ প্রকৃতি স্বভাবতঃ বুদ্ধিপ্রধান। অতএব

তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ, এম. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।'[৩৫]

তখনকার সমাজে যারা নিজেদের সবচেয়ে বেশী প্রগতিশীল বলে মনে করতেন সেই ব্রাহ্মরা পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে অর্ধশতাব্দীর আন্দোলনের পরেও 'প্রকৃতির বিভিন্নতার' যুক্তি দিয়ে স্ত্রীলোকগণের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী শুভ ফলপ্রদ নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতির প্রয়োজন নেই, শুধু হৃদয়বৃত্তির উন্নতি সাধনের জন্যই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বুদ্ধিপ্রধান সুতরাং সে শিক্ষা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত নয়। যখন সমাজের প্রগতিপন্থী বলে পরিচিত তাদের মনোভাব এইরূপ, সেখানে অন্যান্য শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মনোভাব যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। উনিশশতকের শেষ দশকেও যেখানে সমাজের এই মনোভাব যেখানে দীর্ঘদিনের কু-সংস্কার সমাজের বুক থেকে দূর করতে অনেকদিন সময় লেগেছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আর মতান্তরের অবকাশ রইল না।

দুঃখিনী বামাগণের মুক্তি আন্দোলন ও শিক্ষার অধিকার এইভাবেই চলছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে মহিলাগণ কিছু কিছু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও শিক্ষা ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই এগিয়ে চলেছেন। যদিও সে পথ পিচ্ছিল, বিপদ সঙ্কুল, তথাপি তা অতিক্রম করবার চেষ্টা ও সাহস এবং প্রতিবাদী মনোভাব তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

মহিলারা সমাজের এরূপ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিজেরা শিক্ষালাভ করতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। শুধু তাই নয়, জনমত সংগ্রহ ও নিজেদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও উন্নতিকল্পে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে অগ্রবর্তী হন। সেই সব পত্র-পত্রিকায় মহিলাদের বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ সংস্কার, নৈতিকতা ও সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পারিবারিক

ও সামাজিকজীবন, কর্মজীবন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও ধর্মজীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়। তবে তখনও তাদের লেখার মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে ফুটে উঠেনি । ভীরুতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু কমে গেলেও পুরুষের সমান স্বাধীনতার কথা তাদের মনোমধ্যে তখনও জাগ্রত হয়নি। সদ্যমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় কিছু ডানা-ঝাপটানি তাদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছিল ।

তৎকালীন সমাজের ভ্রূকুটি ছিল এমনই যে নারী হয়ে জন্মানোই ছিল যেন একটা অভিশাপ। একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতামাতা পর্যন্ত তাকে সংসারের বোঝা, অমঙ্গলের প্রতীক বলে মনে করতেন। একটি কন্যাসন্তানের পৃথিবীতে আগমনে আনন্দের পরিবর্তে সকলের মনেই বিষাদের ছায়া নেমে আসত। আনন্দসূচক শঙ্খধ্বনির পরিবর্তে উলুধ্বনিও কেউ দিত না। সকলেই পুত্রসন্তান কামনা করতেন। পুত্র বিবাহকালে একটি বধূসমেত বহু টাকাপয়সা ও বহু মুল্যবান ধনসম্পত্তি যৌতুকরূপে প্রাপ্ত হতেন। এছাড়া বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা ও সংসারের আরো অন্য বহু ব্যক্তির ভরণপোষণ ও দেখাশুনার ভার পুত্রের উপর অর্পিত হত। বয়ঃকালে অর্থ-উপার্জ্জন করে তারা সংসারের শ্রীবৃদ্ধি আরো বর্ধিত করতেন । কিন্তু একটি কন্যার না ছিল শিক্ষার অধিকার, না ছিল অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষমতা । ৮/১০ বছর বয়স হলেই তার বিয়ে হয়ে একেবারে সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত পরিবারে মুখ বুজে নানাবিধ অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সমস্ত জীবন যাপন করতে হত। বাল্যবিবাহের ফলে অল্প বয়সেই সন্তানের জননী হয়ে সংসারের যাঁতাকলে বদ্ধজীবন যাপন করতে হত । তাদের না ছিল কোন স্বাধীনতা, না ছিল কোথাও যাবার বা কিছু দেখবার স্বাধীনতা । শ্রীমতী মায়াসুন্দরী দেবী দুঃখ করে লিখেছেন ঃ 'স্ত্রীলোকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই । কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্ম্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিলাম না । আমরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে না পারিলাম, জগতের অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া জন্মসার্থক করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের জীবনে অল্পই সুখ । আমরা যে একেবারে সুখবিহীন তাহা বলিতেছি না । সুখ আছে কিন্তু দুঃখের ভাগই অধিক ।'[৩৬] কত করুণ অসহায় মনের ভাব।

মনের ইচ্ছা মনোমধ্যে অবদমিত করে সারাজীবন অন্যের মন জুগিয়েই নারীর জীবনতরী শেষের ঘাটে এসে জমা হত।

তবে ভগবান জন্ম থেকে তাদের একটি মহৎ গুণের অধিকারিণী করেছেন, সেটা হল সহ্যশক্তি। সহ্যশক্তি হল নারীর একটি মহৎ গুণ। এই সহিষ্ণুতা গুণের জন্যই পরমেশ্বর নারীকে মহীয়সী করে তুলেছেন। "আমাদের জন্মাবধিই পোড়া কপাল। ভূমিষ্ঠহইবামাত্র পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই বিমর্ষ, মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি পর্যন্ত হইল না। পিতা বলিলেন ! আহা একটি পুত্র না হইয়া 'একটা মেয়ে' হইয়াছে। সময়গুণে সকলই হয়।' আমরা যে কি দোষে তাঁহাদের বিষচক্ষে পতিত হই, তাহা বুঝিতে পারিনা। যদি বল, আমাদের বিবাহে অধিক টাকা লাগে, কিন্তু তেমন পুত্রদিগের ন্যায় আমাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এক পয়সাও ব্যয় হয় না। যদি বল, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিবে এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণপোষণ করিবে, আমরা তাহা পারিব না। বরং কত টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইব, কিন্তু সে দোষ কাহাদের? তোমাদের একটী পুত্র থাকিলে তোমরা তাহার বিবাহের সময় যদি দুই হাত দিয়া টাকা কুড়াও, ও কন্যা কর্ত্তার সর্ব্বস্বান্ত কর, তবে তোমাদের কন্যার বিবাহের সময় তোমাদের নিকট হইতে অপরে কেন না লইবে?"[৩৭] আসলে সমাজের মূলেই যে বিষবৃক্ষের জন্ম, সেদিকে আমাদের সমাজ কর্তাদের মনদেবার প্রয়োজন ছিলনা। সমাজ কর্ত্তগণ বিষবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করেছেন, তখন তাদের চিন্তায় হয়ত আসেনি যে এই বিষবৃক্ষের ফল তো বিষফলই হবে। বেথুন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ ক্রমশঃই একটু একটু করে অবারিত হতে থাকে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যে ছিল না এমন নয়। বহু বিদুষী মহিলার বিদ্যার খ্যাতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। কি কারণবশতঃ বামাগণকে পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে বন্দিনী করে রাখা হত, তার সঠিক কারণ না জানলেও মনে হয় অন্তঃপুরের নানা ব্যাপারের শৃঙ্খলা রক্ষা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির মানসেই পুরুষগণ নারীজাতিকে বিদ্যানুশীলন ও মনোবৃত্তির চর্চ্চার জন্য অধিক উৎসাহ ও সময় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। নিজেদের সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব বজায় রাখার কারণেই বামাগণকে তাদের অপেক্ষা হীনাবস্থায় রেখেছিলেন। আপন স্বার্থ চরিতার্থতার জন্যই বোধহয়

এদেশে ও অপরাপর দেশে মহিলাগণের যথোচিত উন্নতির কোন চেষ্টা হয় নাই। তবুও যে কয়েকজন ভাগ্যবতী রমণীর অদৃষ্টে শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেছিল তাতে মনে হয় স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণবশতঃ এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বহুদিন বন্ধ ছিল। "বোধ হয় মুসলমান রাজ্যকালীন কতকগুলি দুর্বৃত্ত নবাব ও অপরাপর প্রধান কর্মচারীর দৌরাত্ম্যের ভয়ে অস্মদ্দেশীয়েরা বামাগণকে অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হন এবং তৎসঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি তিরোহিত হয়।"[৩৮] তবে একথা সত্যি যে মুসলমান রাজত্বেই নারিগণের অবস্থা হীন থেকে হীনতর হতে থাকে, ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাদুর্ভাব হয় নাই তথায় কিন্তু মহিলাগণের অবরুদ্ধ জীবনের করুণ কাহিনী তত বেশী প্রকটভাবে দৃষ্ট হয় না। মহারাষ্ট্রীয় ও পার্শীরমণিগণই এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তথাকার রমণিগণ উন্মুক্ত ভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারতেন।

মধ্যভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ প্রদেশেই বিশেষতঃ নাগপুর অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয়দের বাসস্থান। জাতি হিসাবে তারা যেমন সাহসী তেমনি বলবান, তেজস্বী এবং দেখতে সুশ্রী। তাদের স্ত্রীলোকগণ বিশেষতঃ ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত সুন্দরী রূপবতী। এঁদের স্ত্রীলোকেরা কাছা ও কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে। রমণিগণ সর্বদাই একটা জামা গায়ে রাখে। নিতান্ত গরীব যে সেও সর্বদা জামা পরিধান করে। কলিকাতাবাসী হিন্দু বঙ্গরমণিগণের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ কখনও পাতলা কাপড় পরিধান করেন না। তাঁরা বঙ্গমহিলাগণের ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ নন, সর্ববিষয়ে তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। পদব্রজে প্রকাশ্য রাজপথে গমনাগমনে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়না। শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী, দেবর সকলের সঙ্গে একসাথে বসে ভোজনেও কোন নিন্দা নাই বা স্ত্রীগণকে সর্বদা ঘোমটা দিয়ে নিজের বদন আবৃত করে অন্তঃপুরে বন্দীজীবন যাপন করতে হয় না। কেবল বিধবা স্ত্রীলোককে মাথায় কাপড় দিতে হয়। আর বঙ্গরমণিগণ অবরোধ প্রথার জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এখানে উচ্চশিক্ষা বোঝাতে ইউনিভারসিটির ডিগ্রীকে বোঝায় না। "যে শিক্ষা স্ত্রীলোককে কেবল সহধর্ম্মিণী নহে কিন্তু জীবনের সঙ্গিনী করে, সেই শিক্ষাই এই স্থলে উচ্চশিক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে: আমাদের নারীগণ অবরুদ্ধ থাকেন বলিয়া পুরুষের সকল আমোদে যোগদিতে বা বিষয় সমস্যার

সময়ে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রকাশ করতে অসমর্থ। যে আমোদে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে যোগদান না করে, সে আমোদ কখনও বিশুদ্ধ ও আনন্দদায়ক হইতে পারে না।"[৩৯]

বঙ্গরমণিগণ স্বামীর সহধর্ম্মিণী হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেননি। ১০/১২ বছর বয়ঃকালে যে নারীর শিক্ষা শেষ হয়ে যায় এবং সংসারের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, ১৪/১৫ বছর বয়স হতেই সন্তানের জননী হয়ে সংসার যাঁতাকলে অবরুদ্ধ হন, তার পক্ষে সংসার সমুদ্র সুশৃঙ্খলরূপে পার হওয়া বড়ই কষ্টকর। মাতা শিক্ষিতা না হলে কেমন করে তিনি সুসন্তান গড়ে তুলবেন। রমণিগণ সুশিক্ষা না পেলে তারা কিভাবে পৃথিবীকে সুসন্তান উপহার দিবেন। নারী তার অশিক্ষা, অজ্ঞানতাবশতঃ স্বামীকে কোন গুরুতর বিষয়ে সাহায্য বা পরামর্শ দিতেও সক্ষম হন না। অবরোধ প্রথাই নারীর জীবনের সকল উন্নতির মূলে কন্টকস্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছিল। মুসলমান রাজত্বকালে বহু অত্যাচারী নবাব ও রাজকর্মচারীর দৌরাত্ম্যের ফলেই মহিলাগণ অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। "মুসলমানরা যখন ভারত অধিকার করিলেন, তখনি অবরোধ প্রথার আবির্ভাব হইল। তাঁহারা সুন্দরী মহিলা দেখিলেই তাঁহাকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন। সুতরাং সকলেই নিজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের অবরুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।"[৪০]

অবরোধপ্রথা ভারতীয় সমাজ জীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায় বললে কিছু অন্যায় হবে না। এই প্রথা জাতির জীবনে মহা অভিশাপ বহন করে এনেছে। সে অভিশাপের করাল কবল থেকে আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারিনি। "অবরোধ প্রথাকে ভারতবাসীর অভিশাপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই প্রথার দ্বারাই এদেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা এবং তাঁহাদের বিদ্যাচর্চা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া অবশেষে বিলুপ্ত প্রায় হয়। বিদ্যার অভাবে তাঁহারা সহধর্ম্মিণী হইলেও প্রকৃত পক্ষে জীবনের সঙ্গিনী হইতে পারিলেন না। তাঁহারা পদভ্রষ্ট হইয়া গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন। কারণ যে মাতা নিজেই শিক্ষালাভ করেন নাই, তিনি কি প্রকারে সন্তানকে সুশাসন করিবেন? তিনি তাহার শুশ্রূষার ভার লইতে সক্ষম। কিন্তু মাতার গুরুদায়িত্ব সন্তান শাসনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। পরের

ইচ্ছা দমন করিয়া তাহা নিজের ইচ্ছায় পরিণত করার নাম শাসন। শাসন করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বজায় থাকেনা, তাহাও কিঞ্চিত পরিমাণে দমন করিতে হয়, নতুবা শাসন অত্যাচারে পরিণত হয়।"[৪১] অশিক্ষিতা মাতা কতটা নিজের ইচ্ছাকে দমন করবেন, সেটার পরিমাপ করা তার পক্ষে কষ্টকর।

প্রাচীনকালে নারী আমাদের দেশে শক্তিরূপিণী, জ্ঞানরূপিণী, প্রেমরূপিণী লক্ষ্মীরূপে পূজিতা হতেন। নারী একাধারে কন্যা, প্রেমিকা, জননী ও সেবিকারূপে জগতের পুরুষ জাতির লালন পালন করেন । পিতা জন্মদাতা হলেও সন্তানের উপর মাতার প্রভাবই অধিক। মাতা উত্তমরূপে শিক্ষিতা না হলে সন্তানকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন না। জননীর শিক্ষার উপরেই সন্তানের ভালমন্দ, শিক্ষা-অশিক্ষা অধিকাংশ নির্ভর করে। শিশুর মঙ্গলের জন্য জননীর চরিত্রবতী ও সুশিক্ষিতা হওয়া একান্ত আবশ্যক। জননী সন্তানের আদর্শ স্থানীয়া, অতর্কিতভাবে সন্তান জননীর দোষগুণ গ্রহণ করে। "অপটু কুম্ভকারের হস্তে যেমত হাঁড়িটী, পুতুলটী, বিকৃতরূপে গঠিত হয় এবং উহা একবার বিকৃত হইলে হাঁড়িটী, পুতুলটী আর সুন্দর করিতে পারা যায় না, সেইরূপ অশিক্ষিতা চরিত্রহীনা জননীর দোষে শিশুর কোমল হৃদয় বিকৃতভাবে একবার গঠিত এবং নানাপ্রকার কু-শিক্ষা শিশুর অন্তঃকরণে একবার বদ্ধমূল হইলে ইহজীবনে আর সেই সন্তান সৎ স্বভাবান্বিত এবং কৃতী হইতে পারে না। জননীর চরিত্র শিশুদিগের শিক্ষণীয় গ্রন্থ।"[৪২] শাস্ত্রসমূহে স্ত্রীলোক শক্তিরূপে বর্ণিত হয়েছে । পুরুষ কার্যকরী যন্ত্রবিশেষ, কিন্তু স্ত্রীলোক তাহার চালনীশক্তি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অবরোধ প্রথা ছিল না। ঋগ্বেদ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কোথাও অবরোধ প্রথার উল্লেখ নাই । বরং তৎকালে নারী স্বাধীন ছিলেন এবং বিদ্যাচর্চ্চা করতেন । বহু বেদমন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন নারী। তাঁরা হলেন লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, সূর্যা, বাক্ ও ইন্দ্রাণী। "ঋগ্বেদে অবরোধ প্রথার উল্লেখ নাই। তৎকালে নারী স্বাধীন ছিলেন ও বিদাচর্চ্চা করিতেন। সমস্ত সংসারের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল, এমনকি, তাঁহার অবিবাহিত দেবর ও ননন্দৃগণ তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি সকলকে শাসন করিতেন।"[৪৩] তৎকালে বর্তমান সময়ের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষাকে এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হত না। বিশ্ববারা নাম্নী এক নারী

বৈদিক গীত রচনা করতেন। ঋগ্বেদে অবিবাহিতা নারীরও উল্লেখ আছে। অনেক অবিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে থেকে বার্দ্ধক্য আবস্থায় উপনীত হতেন। বিবাহ দিতেই হবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৎকালীন স্ত্রী-লোকেরা যজ্ঞে যোগদান করতেন এবং সর্বেতিভাবে সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করতেন। তাঁরা শিক্ষিতা ছিলেন বলেই তাঁদের প্রভাব ছিল।

অবরোধ প্রথার কু-ফল ভারতীয় সমাজের মহিলাগণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অজ্ঞানতা তাদের জীবনে উন্নতির সব পথ রুদ্ধ করেছিল। নারী তার অজ্ঞানতার জন্য স্বামীর সকল কার্য্যে অংশগ্রহণ বা মতামত প্রকাশ করতেও ছিলেন অক্ষম। সেদিক থেকে পাশ্চাত্যনারী তাঁর জ্ঞানলব্ধ ব্যবহারিক বহুদর্শিতার ফলে সমাজজীবনে পুরুষের অনেক কার্য্যেই অংশগ্রহণে ও মতামত প্রকাশে ছিলেন সক্ষম। আমরা পুস্তক পাঠ করে যে পুঁথিগত জ্ঞানলাভ করি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তার মূল্য সামান্যই। ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবহেতু বাস্তবকার্য্যে আমরা ভীত হয়ে পড়ি। "ইহার ফল এই যে, কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতেও আমাদের সাহস হয় না, আমরা নিজের চক্ষেও ঘৃণার্হ এবং পুরুষের চক্ষেও ঘৃণার্হ।"[৪৪]

রামায়ণ, মহাভারত নামক মহাকাব্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের যে সামাজিক চিত্র লক্ষিত হয় তাতে অবরোধ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি বৌদ্ধযুগেও তার প্রভাব ছিল না। 'নাগানন্দ' এবং 'রত্নাবলী' নাটকে তৎকালীন সমাজের যে বর্ণনা আছে তাতে মহিলারা অনায়াসেই স্বামীর বন্ধুদের সহিত কথোপকথন করতে পারতেন। সুতরাং মুসলমান আমলেই যে তৎকালীন অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায় এবং এরজন্য নবাব ও তাঁর উচ্চতম কর্মচারীগণই প্রধানতঃ দায়ী বলে মনে করি।

নারী উপযুক্ত সৎশিক্ষা পেলে সর্ববিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা লাভ করতে পারেন। অযথা তাদের চরিত্র নষ্ট হবার দোহাই দিয়ে অশিক্ষার অন্ধকারে অন্দরমহলে বদ্ধ রাখা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। নারী শক্তিরূপিণী। নারী শক্তির বিকাশ উপযুক্ত ভাবে হলে নারী সর্বক্ষেত্রেই তার প্রতিভার সম্যক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। যাঁরা নারী প্রতিভার বিকাশ দেখতে অনিচ্ছুক, তাঁরা বহু যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত রাখতেই আগ্রহী। তাঁরা বলেন, "স্ত্রীলোককে যদি স্বাধীনতা

দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সহজেই কুপথে যাইবে। অতএব তাহাদিগকে কোন রকম অসৎকার্য্যের সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা তাহাদিগকে অন্দর মহলে আবদ্ধ রাখা উচিত।"[৪৫] তাদের এই যুক্তি কদাচ সমর্থনযোগ্য নয়। স্রোতের জলে পোকা পড়ে না বলে একটা প্রবাদ আছে। সুশিক্ষিতা মহিলাগণ কুপথে যায় একথা স্বীকার করা কষ্টকর। বরং মহিলাগণ স্বাধীনভাবে সকলের সাথে মিশতে পারলে তাদের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, একথা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন। যাঁরা ইংলন্ডের সমাজ দেখেছেন, এমন অনেক ভারতবাসী একথার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। বরং দেখা গেছে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখলেই বিপথে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাশ্চাত্যের মহিলারা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন, তাই বলে তারা সকলেই বিপথগামী একথা বলা যায় না, আবার অনেকে এমন অভিযোগ করে থাকেন যে, স্ত্রীলোক যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা স্বামীর অমর্য্যাদা এবং পরিবারের অন্যদের প্রতি অশালীন আচরণ করবেন, তার ফল হয়ত ভয়াবহ হতে পারে। শিক্ষিতা এবং স্বাধীন নারীর মধ্যে সৌখিনতা এবং গৃহকর্ম বিমুখতা, আলস্য, স্বার্থপরতা, পতি এবং গুরুজনদের সেবার প্রতি অনীহা দেখা দিতে পারে। এসব যুক্তিও সর্বক্ষেত্রে খাটে না, কেননা অশিক্ষিত ও অবরুদ্ধ স্ত্রীর মধ্যেও এই দোষগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। "সুশিক্ষিতা স্ত্রী তাহার কর্ত্তব্য ভালরূপে বুঝিতে পারেন ও মিথ্যা সাজসজ্জায় সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা কখনও স্বামীকে অবজ্ঞা করেন না, কিন্তু তাহার কথানুসারে চলেন।"[৪৬] ভারতীয় নারী অবরুদ্ধতার জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা এবং সামাজিক নানাবিধ কুসংস্কার তাদের জীবনবোধকে চতুর্দ্দিক হতে অক্টোপাশের মত বেষ্টন করে ফেলেছিল। সেই অন্ধকার প্রাচীর ভেদ করে বের হবার কোন উপায় তখন তাদের ছিলনা।

পাশ্চাত্য নারীকে আমাদের ভারতীয় নারীর মত অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হত না। তাদের সর্বত্রই গমনাগমনের সুযোগ আছে, এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের ফলে তাঁরা অনেক বেশী স্বাধীন এবং শিক্ষালাভের ও জ্ঞানচর্চ্চার সমস্তরকম সুযোগ লাভ করে থাকেন।

মিশর একটি প্রাচীন সভ্য দেশ। প্রাচীনকালে মিশরের নারীজাতির অবস্থাও

অনেক উন্নত ছিল। প্রাচীন মিশরীয় নারীর জ্ঞানস্পৃহা ও শাসনক্ষমতার খ্যাতি সেকালের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জগতের ইতিহাসে প্রথম রাজ্ঞীর সম্মান লাভ করেন মিশরের হাত্‌শেপ্‌সুট নাম্নী মহিলা। তাঁর শাসনকালে মিশরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে হাইপেসিয়া নাম্নী মহিলা দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে তিনি এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন, যা শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হত। তাঁর বাসভবনে তৎকালীন বহু শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভের জন্য আগমন করতেন। জ্ঞানীগুণী বহু ব্যক্তি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে মতামত নিতেন। লোকে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সেই মিশরেও নারীজাতির গৌরব ম্লান হতে হতে অতি হীনাবস্থায় পৌঁছেছিল।

প্রাচীনকালে চীনদেশে রমণীর সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। প্রাচীন জাপানেও নারীজাতির অবস্থা হীন ছিলনা। কয়েকজন মহিলা রাজ্যশাসনে দক্ষতার পরিচয় দেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে নারীজাতির অবস্থা কোথাও তেমন হীন ছিলনা। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে মুসলমান আধিপত্যের ফলেই নারীর শোচনীয় দুর্দ্দশা শুরু হতে থাকে। যে আরবদেশ মুসলমান ধর্মের জন্মস্থান, সেখানে মহম্মদের জন্মের পূর্বে আরবগণ নারীজাতির উপর পশুর মত আচরণ করত। মহম্মদের আবির্ভাবের পর তিনি বহু মহিলাকে আরবদের পাশব অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। মোস্‌লেম জগতে নারীজাতির আদর আছে, কিন্তু তা তেমন উচ্চশ্রেণীয় নয়। মুসলমান সভ্যতা যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, তখন তারা নারিগণকে যে উচ্চ-অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তা জগতের যে কোন্ জাতির নারীর পক্ষেই ছিল গৌরবের বিষয়। এ প্রসঙ্গে রাজিয়া বেগম, নুরজাহান, জাহানারা, জেবউন্নিসা প্রভৃতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সম্রাট মহিষী ও সম্রাট কন্যাগণের নাম করা যায়। অবরোধে আবদ্ধ থেকেও তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে সব দেশের নারিগণের মধ্যেই একটা সজীবতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন কালে পৃথিবীর সর্বত্রই নারীজাতির অবস্থা উন্নত ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে নারীর অবস্থা প্রায় সকল দেশেই হীন থেকে হীনতর হতে থাকে। কিন্তু এখন সকল দেশের চিন্তাবিদ্‌গণ উপলব্ধি করছেন যে, নারীজাতিকে

পশ্চাতে রেখে দেশ তথা সমাজ কখনই উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। সমাজের পঙ্গুত্ব দূর করতে হলে নারীজাতির জাগরণ সর্বাগ্রে দরকার। জাপানের নারিগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশও দ্রুতবেগে উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে। চীনেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। তারাও অনুভব করছেন যে, নারীজাতির উন্নতি না হলে পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব। মুস্‌লিম দেশগুলিতেও সজীবতা, সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আর আমরা ভারতবাসী উপলব্ধি করতে শুরু করছি যে আর কালনিদ্রায় শয়ন করে থাকা চলবে না। দেশ তথা জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বাগ্রে অবরোধ প্রথা মোচন এবং উন্নত নারীশিক্ষার প্রসারসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তা না হলে বৈদেশিক শক্তির লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার মহিলাদের সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে কম। . . . . এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখছি। আর এরা যেমন স্বাধীন, সকলকার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়াদেশে মেয়েছেলের পথ চলবার জো নাই। আর এদের কত দয়া। যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে, লেকচার দিবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে সব বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলিতে পারিনা। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ মুক্ত হয় না। বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন, এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে। ..... যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহা কৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী। বিদ্বান, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।.... আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫ বৎসর ৩০ বৎসর কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন, বাজার, হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর সব কাজ করেন, অথচ কি পবিত্র। যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত্র গরীবদের উপকারে

ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ বাবাজী? মনু বলেছেন, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ - ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যাচর্চ্চা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।"[৪৭]

বন্দিনী বামাগণের অবরুদ্ধজীবনের শুরুয়াৎ হয়ত এইভাবেই ঘটেছিল। আস্তে আস্তে সামাজিক পাহাড় প্রমাণ নানা বাধা দ্বারা বামাগণের ললাটে দুর্ভাগ্যের কালোছায়া ঘনীভূত হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে স্তূপিকৃত দুর্ভাগ্যের করাল কবলে তারা ক্রমশঃই হীন থেকে হীনতর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। ইংরাজ রাজত্বকালে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে উদারনৈতিক ভাবধারার স্পর্শে পাশ্চাত্যের উন্নত ভাবাদর্শের জোয়ার এসে ভারতীয় সমাজেও প্রবেশ করে, এবং সেই জোয়ারে ভারতীয় কিছু উদারপন্থী নব্য যুবকগণের চেষ্টা ও যত্নে ভারতীয় মহিলাদের বিশেষকরে বাঙ্গালী মহিলাদের জীবনে মুক্তির আলোক প্রবেশ করে সমাজজীবনের কুসংস্কারের বদ্ধ অর্গল খুলে যায় । বামাগণ মুক্তির স্বাদ পেতে থাকেন এবং নিজেদের অসহনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিজেরাও সচেষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন । তবে যত সহজে বলা গেল তত সহজে এই মুক্তি আসেনি। অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে এই পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করতে তাদের দীর্ঘসময় লেগেছিল, এবং যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, মহিলাগণও ততই মরিয়া হয়ে উঠছিলেন ।

পুত্র এবং কন্যা উভয়েই যাতে সমানভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে, এ বিষয়ে পিতামাতার সমান দায়িত্ব। শুধু পুত্র সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে তুললেই চলবে না । কন্যাসন্তানকেও সমানভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে । রমণিগণের শিক্ষার উপরেই ভবিষ্যৎ সন্তানের জীবন নির্ভর করে। মাতাই সন্তানের লালন পালন ও তাদের মনোরাজ্যে নানা সদগুণের সংস্থাপন করেন। সুতরাং মাতা নিজেই যদি অশিক্ষিত হন, তবে কি প্রকারে তিনি সন্তানকে সুশিক্ষা দিবেন। স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য এই নয় যে সকলক্ষেত্রে পুরুষের সমান পারদর্শিতা লাভ করতে হবে। বরং রমণিগণের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—"সন্তান লালন পালন, উহার মনোক্ষেত্রে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সত্যানুরাগের বীজ বপন, এবং উহাকে

সচ্চরিত্র ও সুশীলতার উপদেশ দান, স্বামীর মনস্তুষ্টি ও শারীরিক কুশল সম্পাদনোপযোগী অনুষ্ঠানে অবিচলিত চিত্তে যত্নবতী থাকা, ও তাহার ধন মান সম্পত্তি অক্ষয়াবস্থায় রাখিবার জন্য সদা সচেষ্ট হওয়া, ও পিতামাতা, শ্বশুর শাশুড়ী এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গের প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ ভক্তি শ্রদ্ধা ও যত্নকরা, গার্হস্থ্য সমুদায় বিষয়ের সুনিয়ম ও সৌকর্য্যসাধন ও পরিবারস্থ সকলের কুশল ও প্রীতি সম্বর্দ্ধনা, এবং উপরিউক্ত কার্য্যসমূহে পারদর্শী হইবার জন্য আপনার বুদ্ধি বিবেচনা ও অপরাপর মানসিক শক্তির উপযুক্ত চালনা মার্জ্জনা ও উৎকর্ষ করা, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নানা বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জন ও সেই জ্ঞান কার্য্যে বিন্যস্ত করা, এবং সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সুশীলতা ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আপনাকে ভূষিত করা ইত্যাদি, স্ত্রীজাতির প্রকৃত কার্য্য ।"[৪৮] তবে প্রয়োজনে অর্থ উপার্জ্জনে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। সেইজন্যও মহিলাদের সুশিক্ষা লাভ করার চেষ্টা শৈশব থেকেই করা দরকার। প্রয়োজনে শিক্ষাকে সর্বক্ষেত্রেই নিয়োগ করা চলতে পারে। শিক্ষা মানুষকে আত্মনির্ভরতা দান করে, সাহসী করে তোলে এবং জীবনসংগ্রামে পথ চলার সহায়তা করে।

আমাদের দেশীয় বামাগণের শৈশবে কিছু শিক্ষার সুযোগ ঘটলেও ৮/১০ বৎসর বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরালয়ে যাবার ফলে তাদের শিক্ষা ঐখানেই সমাপ্ত হয়। যে অল্প কিছু মহিলা বিয়ের পরেও স্বামীর ইচ্ছা ও চেষ্টায় কিছু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান তাদের সংখ্যা নগণ্য। তখন কলকাতায় দুটি বালিকা নরম্যাল-স্কুল স্থাপিত হলেও তাতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অত্যল্প, কারণ যারা সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত ছিলেন না তারা এই দুই নরম্যাল স্কুলে বিবাহিতা কন্যা প্রেরণ করতে সম্মত ছিলেন না। সুতরাং সাধারণতঃ বিবাহিতা কন্যাগণ জ্ঞানলাভের চর্চ্চা হতে বিরত থাকতেন।

দীর্ঘকাল ধরে আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নের সহিত যদি কোন বিষয় মনোযোগ সহকারে আয়ত্ব করা যায়, তবে সেই শিক্ষা দ্বারা কিছু ফললাভ সম্ভব। নতুবা মহিলাগণ 'অল্প জলে কৈ মাছ ছর ছর করে' অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেন। ফলস্বরূপ অল্পশিক্ষিত বামাকুল নিজেদের সম্বন্ধে এতই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, যার পরিণামে গৃহকার্য্যে ঔদাসীন্য ও তদ্‌গৌরবে তাঁরা অশিক্ষিতা আত্মীয় রমণিগণের

প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতেও কুন্ঠিতা হতেন না।

বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে । প্রকৃত শিক্ষালাভের ফল কখনই ভয়ঙ্কর হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে অল্প বিদ্যার বিপরীত ফলই ফলিতেছিল। আমাদের দেশে যে কেবলমাত্র মহিলাগণই তখন অল্প বিদ্যালাভ করতেন তা নয়, পুরুষেরাও সামান্য বিদ্যা অর্জনের সুযোগ পেতেন । আমাদের সমাজ পুরুষশাসিত সমাজ। পুরুষশাসিত সমাজে সেই পুরুষেরাও যেখানে অধিক বিদ্যালাভে বঞ্চিত ছিলেন সেখানে রমণিগণ যারা পুরুষের দ্বারা চালিত হতেন সেই পুরুষেরাই যদি উৎকৃষ্ট মনের অধিকারী না হয় তবে তারা রমণীদেরকে কিরূপে সঠিক পথের দিক নির্দেশ করবেন ? অথচ বামাগণ সুশিক্ষিতা না হলে পুরুষদিগেরও উন্নতি সম্ভব নয়। "বামাগণের সুশিক্ষার উপর পুরুষদিগের উন্নতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতার কোমল হৃদয় হইতে এবং স্নেহপূর্ণ মধুর বচনদ্বারা পুত্রের সুশিক্ষা যতদূর সম্পাদিত হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। মাতা সুশীলা ধার্ম্মিক ও জ্ঞানযুক্তা হইলে পুত্র কন্যার সচ্চরিত্রতার পক্ষে যেমন সুবিধা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বামীর চরিত্র দোষ সংশোধনার্থ প্রিয়ভাষিণী ও কোমল স্বভাবা স্ত্রীর যত্ন যেরূপ সফল হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না।"[৪৯]

ইউরোপীয় পুরুষগণ সুরাপান করলেও মাতাল হয়ে গৃহে ফেরেন না, কারণ তাদের স্ত্রীগণের তিরস্কারের ভয়ে তারা সামান্যই সুরাপান করেন । আর আমাদের দেশের যুবকগণের সুরাপান বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা জবাবদিহির প্রশ্ন না থাকায় তারা মাতাল হয়ে গৃহে ফিরতে সঙ্কোচ করে না । ইউরোপীয় পুরুষেরা পত্নীকে মান্য ও শ্রদ্ধা করে, সেইজন্য তারা এমন আচরণ কখনও করেন না যাতে পত্নী মনে দুঃখ বা বেদনা অনুভব করেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা পত্নীকে শ্রদ্ধা বা মান্য করা দূরে থাকুক, তাদের মনোকষ্টের প্রতি কিছুমাত্রও সহানুভূতি নেই। একমাত্র স্ত্রীজাতিই প্রেমভালবাসা দ্বারা পুরুষের হৃদয় জয় করতে পারেন এবং পুরুষের অনেক চরিত্রদোষও সংশোধিত করতে সমর্থ হন । সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা ঠিকমত হলে পুরুষজাতির অশেষ মঙ্গল । শিক্ষিতা ও সদ্‌গুণসম্পন্না মাতা কোমল হৃদয়ের দ্বারা সন্তানের চরিত্র সুপথে পরিচালিত করতে পারেন ।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও বাস্তবে একাজ সম্পন্ন করা

বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল তখনকার সমাজে । শিক্ষয়িত্রী জোগাড় করা ছিল সমস্যা । 'জেনানা' মিশনের শিক্ষয়িত্রী চলবে না, ইংলিশ মিশন চলবে না, আমেরিকান, স্কটলন্ডীয় কোন মিশনের শিক্ষয়িত্রীই চলবে না, কেননা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মান্তরিত করা এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারে সাহার্য্য করা । তাছাড়া এইসব মিশনের শিক্ষয়িত্রীরা নীচ বংশোদ্ভবা । তাঁরা ভদ্রবংশীয় রমণিগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন । উত্তম শিক্ষয়িত্রী যদি বা কখনও পাওয়া যায়, তাদের বেতন দিবার ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না । আবার যাদের সে ক্ষমতা আছে, তাদের শিক্ষা দিবার মন নেই । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের পুরুষগণের সাধারণতঃ অর্থ উপার্জনের দিকেই বেশী লক্ষ্য থাকে, আর সম্ভ্রান্ত ধনিগণ এই ক্ষুদ্র বিষয়ে মন দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না । অন্তঃপুরবাসী বিবাহিতা রমণিগণের বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে সময় নষ্ট করার মত ইচ্ছা বা মানসিকতা তাদের একেবারেই নেই । তবে দু-চার জন শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, তাঁরাও সামাজিক নানা বাধার দরুণ সুষ্ঠু কোন সমাধান খুঁজে পান না । অথচ মনেপ্রাণে অনেকেই অনুভব করতে শুরু করছেন যে স্ত্রীজাতির উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে সামাজিক উন্নতি সম্ভবপর নয় । শিক্ষিত পুরুষগণ যদি আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সহকারে কালোপযোগী স্ত্রীশিক্ষার দিকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তবে কোন বাধাই আর বাধা বলে মনে হবে না । সতীদাহের মত হিন্দুসমাজের সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুর প্রথাও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক এবং তাঁর দুইজন সহকর্মী বটরওয়ার্থ বেলী আর একজন সার্ চার্লস্ মেটকাফ একত্র হয়ে আইন পাশ করে তবে তা বন্ধ করেছিলেন, তখনও তো হিন্দু সমাজ ভয়ঙ্কর উত্তাল হয়েই উঠেছিল । কিন্তু ভারতীয় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতার দ্বারাই বেন্টিঙ্ক তা বাস্তবে কার্য্যকর করতে পেরেছিলেন শতবাধা তৃণবৎ উপেক্ষা করে । সুতরাং সব কথার শেষ কথাই হল, আন্তরিকতা থাকলে কোন বাধাই আর বাধা বলে মনে হয় না । 'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।' চাই উদ্যম আর প্রবল মানসিক জোর ।

পাশ্চাত্য ভাবধারার স্পর্শে ভারতীয় সমাজের নারীজাতির অবরুদ্ধ জীবনের দ্বার কিছুটা উন্মোচিত হলেও বহুবাধা অতিক্রম করে সেই পিচ্ছিল পথে মহিলাগণকে বের করে আনতে আমাদের সমাজ হিতৈষিগণকেও কম বেগ পেতে

হয়নি ।

আমাদের দেশের নারীশক্তিকে বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী, জননী মহাশক্তির অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । সেই মহাশক্তির অংশ সম্ভূতা রমণিগণ উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পেলে এমন কোন কর্ম নেই যা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে না পারেন। লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, আত্রেয়ী প্রভৃতি প্রাচীন বিদুষী রমণী উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পেয়েছিলেন বলেই বিদ্যায় বৃহস্পতির মত পান্ডিত্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বিংশশতকের প্রারম্ভেও অন্তঃপুরে আবদ্ধ নারীজাতির অবস্থা ছিল পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায়। যে হিন্দুজাতি একদিন বল, বীর্য্য ও সাহসে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল, অতীতের সে গৌরব হারিয়ে সে জাতি আজ পরাধীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার প্রধান কারণ নারীজাতির অবহেলা ও তাঁকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা । পুরুষের ন্যায় নারীও মানবী । তারও বাহিরের মুক্ত বায়ু সেবন ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করার অধিকার আছে । কিন্তু দেশাচারের কূটচক্রে আজ তার কি করুণ ও অসহনীয় অবস্থা । নারীকে রন্ধনশালা ও অন্দরমহলের রুদ্ধ কুটীরে বদ্ধ করে রেখে পুরুষজাতি কখনই নিজেদের মঙ্গল সাধন করতে পারেন না । যে দেশের পুরুষজাতির এত সন্দেহ, অবিশ্বাস নারীদের প্রতি, সেই জাতির কি কখনও বীরদর্পে অপরের অত্যাচারের প্রতিবাদ করার বা স্বরাজের দাবী করার অধিকার আছে ? যে জাতি একবার চোখ মেলে নিজের দেশের নারীজাতির অবর্ণনীয় অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করে না, তারা কিভাবে অপরের অত্যাচারের অভিযোগ করে ? সকলের অগ্রে নিজ দেশের মহিলাগণকে স্বাধীনতা দাও, শিক্ষার অধিকার দাও, পুরুষের পাশে দন্ডায়মান হয়ে সর্বকর্মের অধিকার দাও, তবে তো তোমরা পুরুষেরা অপরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করতে পার ? যতদিন নারীজাতির মুক্তি না হয়, ততদিন পর্যন্ত দেশ কখনও স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠে না । যেজাতি নিজের দেশের মহিলাদের প্রতি এতই নিষ্ঠুর আচরণ করে, সে কি করে অপরের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে সাহস পায় ? সর্বাগ্রে ভারতসন্তানগণের এক ও একমাত্র কর্তব্য কর্ম বলে মনে হয়, তা হল ভারত-মহিলাগণকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এনে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা, নতুবা উন্নতির আশা, স্বাধীনতার আশা নিরাশামাত্র। এই

ছিল সেকালের অনেক অন্তঃপুরচারিণী রমণীর মনের ভাব ।

নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেলে না পারে এমন কোন কর্ম নেই । চাই উপযুক্ত শিক্ষা। এই নারীজাতির উন্নতির উপরেই দেশের উন্নতি, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উন্নতি নির্ভর করে। মাতা সুশিক্ষিতা না হলে কিভাবে দেশকে সুসন্তান উপহার দেবে। মাতার শিক্ষার উপরেই ভবিষ্যৎ সন্তানের উন্নতি নির্ভর করে। যে মাতা নিজেই অশিক্ষার কালো করাল আবর্তে নিমজ্জিত, সে তো সন্তানকে শিক্ষার আলো দেখাতে সক্ষম হবে না। একদা নেপোলিয়নকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইংলন্ড কিভাবে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল ?' সেই বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী বীর সংক্ষেপে উত্তর করেছিলেন, "ইংলন্ডের জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ সুমাতা।"[৫০]

পুরুষ নিজের খুশিমত যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম । পুরুষ ইচ্ছা করলে একের অধিক দার পরিগ্রহ করতে পারেন । কিন্তু একটি ৮/৯ বছরের বালিকা যদি একবার সীমন্তের সিন্দুর মুছে ফেলেন , তাকে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে হয় সামাজিক নানা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করে । এটা কি কোন সভ্য সমাজের বিধি হওয়া উচিত ? নারী এবং পুরুষ উভয়েই বিধাতার সৃষ্টি। নারীর জন্য এক নিয়ম, আর পুরুষের জন্য অন্য নিয়ম কেন?

নারী হ্রী, শ্রী, ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। নারী কল্যাণময়ী রূপে সংসারের সকল কর্তব্য সমাপন করে গৃহকে শান্তির স্বর্গে পরিণত করেন, সংসারে সেই নারীকেই যদি অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করে ধরাতল সিক্ত ও আর্দ্র করতে হয় তবে সে গৃহে কখনই লক্ষ্মীর স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ।

রমণী গৃহের শোভা । গৃহকে তিনিই স্বর্গের অমরাবতী করে তুলতে সক্ষম, আবার তিনিই গৃহকে নরকের দ্বারে নিয়ে যেতে পারেন । গৃহই হল রমণীর কর্মক্ষেত্র। রমণীর শিল্পপ্রতিভার বিকাশক্ষেত্র গৃহ। শিক্ষিতা রুচিশীলা কল্যাণময়ী রমণীর যাদুস্পর্শে গৃহ স্বর্গের নন্দন কানন তুল্য হয়ে উঠে। গৃহ থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ। দেশের উন্নতি অবনতি সবই নারীর হস্তে । জাতিগঠনে দেশ গঠনে নারীর ভূমিকাই অধিক। "বিধাতা-নির্দিষ্ট রমণীর হস্তে ন্যস্ত গৃহধর্ম্মপালন, অতি কঠিন, অতি মহৎ ও অসীম শক্তি সাপেক্ষ। যে গৃহ সমাজের মূল, যে গৃহ হইতে সমাজ সৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয় ও উন্নতি সাধনের উপকরণ লাভ করে, সে গৃহের ভার রমণীর

হস্তে। সামাজিক উন্নতি, সমাজরক্ষা, সমাজ সংস্কার এ সকল যতই বাহিরের কাজ হউক না কেন, এ সকল কার্য্যের মূল অন্তঃপুরে। পুরুষগণ সামাজিক উন্নতি লইয়া মত্ত থাকিয়া কিছুই করিতে পারেন না, যদি গৃহের উন্নতি আগে না সাধিত হয়। গৃহ সংস্কার হইলে তবে সমাজ সংস্কার।"[৫১]

নারী জাতির শিক্ষা ব্যতীত নারীজাতির উন্নতি কখনই সম্ভবপর নয়। চলতে গেলে যেমন দুটি পদ সমানতালে না চললে চলা সম্ভব নয়, এক পদ দ্বারা খুঁড়িয়ে চললে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা কঠিন, তাতে মুখ থুবড়ে যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে পড়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা। নারী ও পুরুষ সমাজ দেহের দুটি পদ। নারী চলছে না, পুরুষ চলছে, অর্থাৎ সমাজের এক অংশ প্রস্তরবৎ স্থবির হয়ে আছে। পুরুষের পক্ষে সমাজের সব বোঝা বহন করে চলতে হচ্ছে বলে তার গতিও মন্থর হয়ে গেছে। সমাজ উপলব্ধি করছে যে নারীকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে অশিক্ষার আলোকে প্রস্তরবৎ ফেলে রাখলে পুরুষের বোঝা বাড়বে বই কমবে না। দেশের নারীশক্তিকে চালনা করতে হবে। নারী হল পুরুষের চালিকা শক্তি। শক্তির অবমাননা করে তাকে দূরে রাখলে পুরুষের পক্ষে জগৎসংসারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। "ধরণীর ক্রোড়ে পুরুষে বাঁচিয়া থাকে নারীরই করুণায়। নারী না থাকিলে পুরুষ জগতের আলো হয়ত দেখিতে পাইত না। পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবার পর, নারী মাতা হইয়া পুরুষকে কি সস্নেহে পালন করেন। নিজের বক্ষের সুধা দিয়া কৃতঘ্ন পুরুষকে কিভাবে জগতের মাঝে অভ্যর্থনা করেন, তাহা পুরুষ মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে জানে। পুরুষের দেহে যখন বসন্তের বাতাস আসিয়া লাগে, কিশোর যখন নবযৌবনের বনে ফুল কুড়াইতে যায়, তখন সে ফুলের সন্ধান কিশোরকে নারীই বলিয়া দেয়। নারীই তাহার হাতে সাজি তুলিয়া দিয়া, নয়নে প্রেমের অঞ্জন মাখাইয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফুলবনে ছুটিয়া চলিয়া যায়। পুরুষের সাজি যখন ভরিয়া উঠে, পুরুষ যখন প্রেমের বনে পরিচিত অতিথি হইয়া যায়, তখন সে নারীর কথা ভুলিয়া যায় —ভাবে সে আপনিই এই ফুল কুড়াইবার অধিকার পাইয়াছে, নারীর দান দানই নহে।"[৫২]

যে নারী নিজেকে উজাড় করে দিয়ে পুরুষের জীবনতরী পরিপূর্ণভাবে সুন্দররূপে সার্থক করে তোলে, সেই পুরুষই কিনা নিজ নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ

রাখার জন্য নারীকে রন্ধনশালায় বদ্ধ রাখতেই অধিক আগ্রহী। কিন্তু নারীশক্তির জাগরণ ভিন্ন দেশের পুরুষ শক্তির উন্নতি অসম্ভব। পুরুষের পার্শ্বে নারী দন্ডায়মান না হলে কোন দিনই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। নারী মাতৃরূপিণী, মহামহিমময়ী, প্রেমস্বরূপা, শক্তি দ্বারা তিনি জগৎসংসারকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন, আবার এই নারীই রুক্ষ উগ্রমূর্তি ধারণ করে ধংস সাধন করতে পারেন। মহিষাসুর নামক প্রবল পরাক্রান্ত বীর দানবকে পরাভূত করতে মা-দুর্গাকে উগ্রমূর্তি ধারণ করে সংহার করতে হয়েছিল। নারী মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, দক্ষমুন্ডচ্ছেদ, রাবণবধ, লঙ্কাদগ্ধ, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর হয়েছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে নারীকে রত্নরূপে অভিষিক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রত্নের মধ্যে নারী সর্বপেক্ষা মূল্যবান রত্ন। নারীকে প্রাচীনশাস্ত্রে অবলা বলা হলেও নারী শক্তিমতী লক্ষ্মী, মহাশক্তির অংশ সম্ভূতা। উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পেলে পুরুষের পাশাপাশি সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম। সংসারক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি দেশশাসনে, কি ধর্ম্মরক্ষায় আপন আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখতে কোন কার্য্যেই নারী পশ্চাৎপদ হন না, দানেও নারী বরণীয়া।

নারী গর্ভধারণ করেন শুধু জীবনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্যই নয়, পতিপুত্রের মঙ্গলের জন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করে তাদের পালন ও সেবা করেন। যে গৃহে নারীর অভাব সে গৃহ লক্ষ্মী ছাড়া মনে হয়। পুরুষের সাহচর্য্যে নারী অসাধ্য সাধন করতে পারেন। আর পুরুষের সাহচর্য্যের অভাবে নারী অবলা। সত্যধর্মপথে অবিচলিত থেকে নারী নিজের উন্নতির পথ যেমন সুগম করতে পারেন, তেমনি জগৎকেও ধন্য করতে পারেন। সৎ শিক্ষায় নারীর বুদ্ধিক্ষেত্র উর্ব্বরা হয়। সুতরাং এই নারী জাতির শিক্ষার জন্য পুরুষের যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নারীকে কার্য্যক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহার্য্যকরা, তবেই দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল নতুবা দেশ তথা জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। কবির ভাষায় — "না জাগিলে সব ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"[৫৩] Tennyson - বলেছেন—

"The woman's cause is man's,

The rise or sink

Together, dwarfed or Godlike,

Bond or free,

If she be small, slight natured, miserable, How shall men grow ?" [৫৪]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে " জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে । সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার । সেই জন্যই আমার স্ত্রী মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ ।" [৫৫]

নারীজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র হল গৃহ । সুশিক্ষিতা রমণিগণই গৃহের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সক্ষম । সুশিক্ষাই মহিলাগণকে কর্মপটু করে তোলে । স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করলেই যে মহিলাগণ কর্মবিমুখ হবেন , এমন কারণ নেই । সুশিক্ষিতা মাতাই মহিলাগণকে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গৃহকর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন । যে মাতা নিজেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, অশিক্ষা, অজ্ঞতাবশতঃ তিনি সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন না, তেমনি স্বামীর বিভিন্ন কার্য্যেও পরামর্শ দেওয়া বা কর্মসহায়তা করা তারপক্ষে সম্ভব নয় । সঠিক শিক্ষা পেলে নারী প্রকৃত সহধর্মিণী, প্রকৃত সঙ্গিনী, প্রকৃত প্রেমিকা, প্রকৃত মাতা হতে পারেন । এর জন্য চাই বীর জননী । বীর জননী হতে হলে নারী নিজেকে অবলা মনে করলে চলবে না, তাকে সবলা হতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মজ্ঞানী হতে হবে । নারী শুধু পুরুষের বিলাসের উপকরণ নয় । সেও মানুষ, তারও মন আছে, স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কর্ম করার শক্তি আছে । পুরুষ ও নারী জীবনপথে একই সঙ্গে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মদ্বারা প্রথমে নিজের মনোলোক গঠন করে নিজের উন্নতি যেমন করতে পারেন, তেমনি জগতের মঙ্গল আনয়নেও সক্ষম হন । তবেই তো জীবন সার্থক, জন্ম সার্থক । নতুবা জন্মগ্রহণ করলাম, মরলাম, নিজের এবং জগতের কোন কাজেই এলাম না । সেটা জীবন নয় । মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম । একে সার্থক করে তুলতে চাই সর্বাগ্রে শিক্ষা । শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যায় । নারী তার জীবনকে তুচ্ছ করে পুরুষের জন্মকে সার্থক করে তোলে। নারী শুধু স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নয়, সে নিজে পূর্ণাঙ্গিনী । শক্তিরূপিনী, প্রেমরূপিনী, জননীরূপিনী নারীর বোধন করে বলতে হয় : -

আয় মা জাতির কর্ম্মভূমে

মাভৈঃ বলে আয়
গৃহের মাঝে পায়ের নুপুর
আর কি শোভা পায় ?
দেখ্‌না কত বরষ ধরে —
রইলি বসে অন্তঃপুরে
জাতির ঝরা অশ্রু —
পাহাড় ভেসে যায়।
মায়ের পরাণ এমন বেদন বুঝল নাক হায় ।
কক্ষে যাদের মানুষ ফলে, বক্ষে পীযূষ ঝরে,
এমন শ্মশান নীরব হ'য়ে দেখতে তারা পারে ।"[৫৬]

এস মা, জাতিগঠনের কাজে তোমারি হস্ত প্রসারিত কর । এই দুর্দিনে পুরুষের প্রতি অভিমান করে অশিক্ষার আলোকে আর গৃহকোনে নিজেকে আবদ্ধ রেখ না।

মানুষ সমাজ গঠন করছে, নারী সেই সমাজে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে। পুরুষ একা এই ধরণীতলকে রমণীর সাহায্য ছাড়া রমণীয় করে তুলতে পারেনা। পুরুষেরও যেমন রমণীর সাহায্য চাই, রমণীরও পুরুষের সাহায্য ছাড়া চলে না। দুজনার প্রাণের স্পন্দনই প্রকৃত স্পন্দন । কিন্তু বর্তমান অবস্থায় রমণীকে রম্যভাবে রাখবার ছুতা করে পুরুষ সংসার তরণীর হাল ধরে বসেছে, নিজের অভাব মিটানই সমস্ত প্রকৃতির অভাব মিটান বলে মনে করছে। এই অসম্পূর্ণ যুগে যখন রমণীর দাবী আসরের কেহ শুনছে না, পুরুষের কথাই সংসারের প্রধান কথা হয়ে দাড়িয়েছে, তখন পুরুষ তার নিজের মঙ্গলও বুঝতে পারছে না । যে পুরুষ শক্তি দেশের কর্ণধার বলে নিজেদের মনে করেন, তাদের মধ্যেও শিক্ষার আলো সামান্য প্রবেশ করছে । যে দেশের "শতকরা ৬.৬ জন পুরুষ লিখিতে পড়িতে জানে ; ৯৩.৪ জন পুরুষ এই বিশাল ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরক্ষর । লিখিতে পড়িতে জানে এরূপ নারীর সংখ্যা নিতান্ত কম । শতকরা মাত্র ১.৬ জন নারী লিখিতে পড়িতে পারে — আর ৯৮.৪ জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর । . . . . . এই গরীব দেশের সমগ্র অর্থ যাইতেছে সৈন্যরক্ষার্থ ও রাজপুরুষদিগের উচ্চ বেতনে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করিবার

অর্থ কোথায় ? তবুও পুরুষদের শিক্ষার জন্য কতক পরিমাণে চেষ্টা হইতেছে ; কিন্তু নারী জাতির শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় ।এই বঙ্গদেশে বালকদের জন্য প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৩৫৭০৪, কিন্তু বালিকাদের জন্য স্কুলের সংখ্যা ১০২৬৯ মাত্র । প্রাইমারী স্কুলে বালকের সংখ্যা ১১২৭১১১ আর বালিকার সংখ্যা মাত্র ৩২৯৭৫৪।"[৫৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যে পুরুষজাতি নারীজাতির চালনী শক্তি বলে অভিহিত, সমাজে তারাও অশিক্ষিত নারীজাতির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের শিক্ষারও প্রয়োজন। এক অন্ধ, অপর অন্ধকে কেমন করে পথ দেখাবে? ব্যাপকহারে নারী পুরুষ উভয়ের শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন । বেশীর ভাগ অংশের ধারণা নারীর জ্ঞানলাভের গভীরতা পুরুষের তুলনায় নগণ্য, একথা সত্যি নয় । সুযোগ পেলে নারী পুরুষের সমান কিম্বা ততোধিক জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন । পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকা দরকার । "বাস্তবিক আমরা যদি দেশের উন্নতি চাই, উচ্চভাব ও আকাঙ্ক্ষা দেশে বদ্ধমূল করিতে চাই, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও সন্তান পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি উচ্চ আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, স্বদেশ প্রেম যা দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের ভাব, যদি দেশে জাগ্রত করিতে চাই তবে নারী জাতিকে উচ্চ শিক্ষা দিতেই হইবে । পুরুষ ও নারী উভয়কে সমান ভাবে উচ্চশিক্ষা দিতে হইবে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা সকলের মধ্যেই বিস্তার করিতে হইবে । নতুবা দেশের কল্যাণ হইবে না। "[৫৮]

নবম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেছিলেন, "কেবল পুরুষজাতিকে জাগরিত করিলে চলিবে না; নারীজাতি, যাঁহারা আমাদের মাতা, ভগিনী, দুহিতা ও সহধর্ম্মিণী স্বরূপা, তাহাদিগকেও জাগরিত করিতে হইবে ।.....যে সমাজ তাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ নারীজাতিকে বাণীর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহার আর অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? যে পর্য্যন্ত আমরা 'মহীয়সী মহিলার মহনীয় মহিমা' হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমাদের জাগরণের আশা দুরাশা ।"[৫৯] তবে একথা সত্য যে আমাদের সমাজ পুরুষ শাসিত সমাজ । পুরুষ শারীরিক শক্তির জোরেই হোক বা অন্য কোন ভাবে হোক, নারীর উপর প্রধান্য বিস্তার করে, নারীকে অবদমিত

করে, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নারীকে পুরুষ অপেক্ষা হীন অবস্থায় রেখেছে। পুরুষ নিজের পক্ষে যুক্তি রেখেছে—সামাজিক নানা কু-প্রবৃত্তি, সবল বৈদেশিক দুবৃর্ত্তদের অত্যাচার এবং ধর্মরক্ষার জন্যই নানা বাধা নিষেধ নারীর উপর আরোপ করেছে। নারী যুগের পর যুগ তা নির্বিবাদে সহ্য করে এসেছে। তার প্রতিকারের বা সেইসব বাধা অতিক্রম করে মুক্ত হবার তাগিদ কখনও নিজেরা অনুভব করেনি। নারী তাদের এই বন্ধনের জন্য পুরুষজাতিকেই দায়ী করেছে। নিজেরা সে বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কখনই করেনি। ভিরু দুর্বল গলায় যাচঞা করে কিছু লাভ করা যায় না, তারজন্য চাই জোরাল দাবী। স্বাধীনতা বা মুক্তি কখনও যাচঞা করে আদায় করা যায় না। স্বার্থান্ধ সবল যে সে কখনই দুর্বলের উপর তার আধিপত্য ত্যাগ করতে স্বেচ্ছায় সম্মত হয় না। নারীকে নিজের মঙ্গল চিন্তা নিজেদেরই করতে হবে। পুরুষ তার সাহায্যকারী হবে অবশ্যই, কিন্তু মুক্তিকারী নয়। নিজে না জাগলে অপরে তার নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারে না। নারীজাতিকে শক্তি সঞ্চয় করে সবলের কাছ থেকে বলপূর্বক তার দাবী আদায় করে নিতে হবে। একটা প্রবাদ আছে যে 'না কাঁদলে মাও শিশুকে দুগ্ধদানে বিরত থাকেন।' নারীকে নিজের মুক্তি নিজেকেই ছিনিয়ে নিতে হবে। নারী যদি নিজেই পুরুষের বিলাসের দ্রব্য হয়ে, মন জুগিয়ে তাদের পদানত হয়ে থাকতে চায় তবে কে তাকে উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হবে? অবরুদ্ধ জীবন ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য চাই সকলের আগে শিক্ষা। শিক্ষাই নারীকে সাহসী, স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, প্রতিবাদী, সবলা করে তুলবে।

নারী নিজেই পুরুষের অত্যাচার, যথেচ্ছাচার সহ্য করে করে নিজেকে হীন, উপেক্ষিতা, পঙ্গু করে তুলেছে। কেবল পুরুষের দোষ দিলেই চর্লবে না, নারী নিজেই নিজের অবরুদ্ধ জীবনের জন্য দায়ী। নারী ভীরু; ভীরুতা তার সর্ব লাঞ্ছনা অপমানের কারণ। নিজের রক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে। পুরুষ হবে সাহায্যকারী। নারীকে তার স্বাধীন সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে হবে। মুক্ত হবার তার বাসনা না জাগলে সে কখনই সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজে মুক্তির স্বাদ পাবে না।

পুরুষেরও চাই সমান শিক্ষা। শিক্ষার আলোকে সেও বুঝতে পারবে যুগ যুগ সঞ্চিত অবহেলা ও অনাদরে নারী শক্তিকে তারা ভুলুণ্ঠিত করে নিজেদের

সর্বনাশ ডেকে এনেছে। পুরুষজাতিকে এখন ভাবতে হবে—শুধু আপন সুখ নয়, তাদের নিজেদেরও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করতে হলে নারীকে সঙ্গে নিতে হবে, আপন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। "সেইজন্যই আজ নারীজীবনে এতখানি সংকীর্ণতা, আর পুরুষের চরিত্র পঙ্কিলতায় পূর্ণ। পুরুষ যতদিন না তার এই নীচ আদর্শকে পরিবর্ত্তন করছে, ততদিন তার জীবনপথে উঠবার আশা সুদুরপরাহত। পুরুষ জীবন যখন নারী জীবন হতে অবিচ্ছিন্ন, তখন নারীর সংকীর্ণতা পুরুষকে পঙ্কে টানিয়া আনিবেই। তাই নারীকে গড়িতে হইবে জীবনের সহযাত্রীরূপে।"[৬০]

নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ ছাড়া সমাজের পঙ্গুত্ব কখনই ঘুচবে না। উত্তম মাতা চাই, তবেই উত্তম সন্তান দেশ পাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশেই বহু মনীষী আছেন যাঁরা জীবনে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন, তাঁদের বাল্যজীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানে মাতা-পিতার প্রভাব কতখানি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উন্নত ও মহিমান্বিত করেছে। পিতা অপেক্ষা মাতার শিক্ষার প্রভাবই সন্তানের জীবন গঠনে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। স্কুল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা শৈশবকালে গৃহ পরিবেশে মাতার শিক্ষা দ্বারাই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালিত হয়। এখানে এমন কয়েকজনের নাম করছি যাদের স্মৃতিতে এখনও মায়ের প্রভাব বিদ্যমান। টমাস এল্‌ভা এডিসন বলেন —"মা আমার বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না; কিন্তু তার প্রভাব আমার উপর আজীবন ছিল। ছেলে বেলায় তাঁর কাছে শিক্ষায় যা ভাল গুণগুলি লাভ করেছি, তা আমি জীবনে ভুলতে পারবোনা। তিনি যদি আমায় না বুঝাতেন, আমার উপর যদি তাঁর বিশ্বাস না থাকত, তবে আজ আর আমি আবিষ্কারক হতে পারতেম না। আমি বড় অসামাজিক, অমনোযোগী ছেলে ছিলাম। মা যদি আমার অন্যরকম হতেন, তবে বোধহয় আমার জীবনও অন্যরকম হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা, মিষ্টি ব্যবহার ও স্নেহ আমায় বরাবর সোজাপথে চলবার ক্ষমতা দিত। মা-ই আমায় মানুষ করে গিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি আমার জীবনের আশীর্ব্বাদ।...

বিখ্যাত রাজনীতিক হ্যালডেন বলেছেন, — "আমার পিতা ও মাতার মত পিতা মাতা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। আমার জীবনে ও কার্য্যে তাঁদের প্রভাব

যে কত, তা বলা যায় না। বাবা আমার মারা গেছেন, কিন্তু মা এখনও আমার সঙ্গে আছেন। কি উজ্জ্বল আদর্শ — আমার জীবন গঠনে সকল সাহায্যই যে মা আমার করেছেন।......"

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জও বাল্যেই পিতৃহীন হন। লয়েড জর্জ্জ বলেন — "ছেলেপেলে নিয়ে মার আমার মহা কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু মা কখনও সে কষ্টের কথা মুখে বলতেন না। অনেকদিন পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, এই পিতৃহীন সন্তানদের নিয়ে মার কি কষ্টেই না দিন গেছে। রুটি আমাদের ঘরে তৈরী হোত, টাটকা মাংস আমরা ক্কচিৎ খেতে পেতাম। মনে হয়, রবিবার সকাল বেলায় আধটুকরা করে ডিমই ছিল আমাদের খাবার মস্ত বড় বিলাসিতা। . . . ." জন বার্ণস বলেন—"মা ও স্ত্রী এরাই আমার সবচেয়ে বন্ধু। আমার চরিত্র ও জীবনের কার্য্য সবই তাঁদের প্রভাবে চলেছে। . . . ." স্যার লরেন্স এলমা টেডমা বলেন, — "মাকে আমি কত ভালবাসতেম। ছেলেবেলায় কি কষ্টেই যে মা আমাদের মানুষ করেছেন, তা আমি বলে উঠতে পারিনা। এমন ধৈর্য্য - এমন সরল হাসিমুখ ও বুকভরা স্নেহ। মার জন্য কোনদিন কোন অভাব বোধ করি নাই। . . ." প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হাস্‌কেন বলেন, — "বাবার প্রথম সন্তান আমি - আমি জানি কি দুঃখে, কি কষ্টে তাঁর দিন গেছে। পরে অবশ্য তিনি সুখের মুখ দেখেছিলেন, ... কিন্তু অভাবের দিনের সেই প্রাণ ভরা স্নেহের আস্বাদ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।.." বৃটিশ উইকলীর সম্পাদক ডাক্তার রবার্টসন্ শিকোল বলেন —"আমার অতি শিশুকালেই মা মারা যান। তাঁর কথা আমার সামান্যই মনে আছে ; আমার বাবা ছিলেন সত্যিই বইয়ের পোকা। সামান্য আয় থেকে তিনি প্রায় সতের হাজার টাকার পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর প্রভাব আমার জীবনে প্রতি চিন্তায় ও প্রতি কার্য্যে অনুভব করি।"[৬১]

অধিকাংশ বড়লোকের জীবন চরিত আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা মাতৃদুগ্ধের সহিত মাতার মহত্ব ও সদ্‌গুণগুলি লাভ করে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিলেন। কোন জাতির পক্ষেই নারীজাতির উন্নতি ছাড়া সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করা কঠিন। জর্জ ওয়াশিংটন শৈশবেই পিতাকে হারান। তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বৎসর। তাঁর শিক্ষা, যশ, কীর্ত্তি, সৌভাগ্য সবই

মাতার স্নেহ যত্নে লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতা শৈশব সুলভ আমোদ আহ্লাদে বাধা দিতেন না; কিন্তু গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সংযম ও আত্ম সম্বরণের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিছুই অতিরিক্ত করতে দিতেন না। তিনি পুত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিলেও গুরুজন সুলভ কর্ত্তৃত্ব কখনই ছাড়েননি। তিঁনি বলতেন — আমি তোমার মাতা, আমি তোমাকে পদচালনা করতে শিখিয়েছি, মাতৃস্নেহ দিয়ে বড় করেছি, তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করেছি, তোমার এখন যতই যশ কীর্ত্তি বৃদ্ধি হোক না কেন, ঈশ্বরের পরেই তোমার শ্রদ্ধাভক্তি আমার প্রতি প্রযোজ্য। ওয়াশিংটন তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত মায়ের কথা রক্ষা করে চলতেন।

আমাদের ভারতীয় মায়েদেরও ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, দয়া, প্রেম ভালবাসা পাশ্চাত্য নারীর তুলনায় কম নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর মাতা ভগবতী দেবীর স্নেহ ভালবাসা, দয়া ও ত্যাগের মহিমায় আকৃষ্ট হয়েই নিজের জীবনে ত্যাগের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ ও সেবার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মাতাও ত্যাগ ও উদারতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি — স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যুগান্তরের মামলায় কারাগার বরণ করলে তিনি বলেছিলেন —"দেশের কল্যাণের জন্য আমার পুত্র কারাগারে গিয়াছে, ইহা ত গৌরবেরই কথা।"[৬২] এইরূপ তেজস্বিনী মাতার গর্ভে জন্মেছিলেন বলেই স্বামী বিবেকানন্দ জগৎ বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের মাতার হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁর পিতামাতার ধর্ম নিয়ে মত বিরোধ দেখা দিলেও, তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মে যে প্রবল অনুরাগ জন্মেছিল, তা তিনি মাতার নিকট থেকেই পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর, কেশব সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনেও মাতার প্রভাব বিদ্যমান।

মাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাঁর কর্তব্য সঠিকরূপে পালন করতে গিয়ে কখনও তাঁকে কঠিন, কখনও কোমল হতে হয়।

দেশ তথা জাতির উন্নতির মূল মন্ত্রই হল নারী জাতির শিক্ষা। রমণীকুলের অজ্ঞতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও দুর্বলতা এটা কেবল নারীর অগৌরবই বহন করে না,

এতে সমগ্র জাতির হীনতা, দুর্বলতা প্রকাশ পায় । সুতরাং নারিগণকে শিক্ষিতা করতেই হবে । জাপানের সমৃদ্ধির বিষয় বলতে গিয়ে জনৈক ইংরাজ লেখক লিখেছেন — *"The family life of a country and the position occupied by women are probably the best tests of its civilisation. In comparing nation with nation we have no doubt in asserting that one of the most important forces in the progress of society is the education which the mothers convey to their children, and no nation can ever be great unless women rise to a high plane of thought and life, and kindle and foster similar ideas in the minds of the young"*[৬৩]

ভগবানের কৃপায় ভারতরমণীর ঘোর অমনিশা কেটে গিয়ে উষার আলো দেখা দিয়েছে । নারী তার ভিতরের ঐশ্বরিক শক্তিকে অনুভব করতে পেরেছে । যাঁরা নারীজাতির উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ ছিলেন, তাদের ভীতিও তাই । আর কোন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা তাদের গতিরোধ করা যাবে না । "নারীর আত্মা নেই ।" "পতিই নারীর দেবতা । পতির সেবা ভিন্ন নারীর অন্য পূজা অর্চ্চনা নাই," পুরুষের জন্ম দেবতার জন্য, দেশের জন্য, নারীর জন্ম পুরুষেরই জন্য ।"[৬৪] এই আপ্ত বাক্য দ্বারা নারীর মন ভুলানোর দিন শেষ । নারী নিজের শক্তিকে খুঁজে পেয়েছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে সেবা এবং আত্মবিনাশ অতি মহৎ বলে পরিকীর্তিত হয়েছে । এই দুই মহৎ ভাব সাধন করে নারীপ্রকৃতি প্রগাঢ় ধর্মভাব লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু অপরপক্ষে পুরুষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । নারীর পক্ষে নৈতিক নিয়মসকল কঠোর, পুরুষের জন্য শিথিল । কিন্তু যে সমাজে পুরুষের নৈতিক চরিত্র শিথিল, সেখানে নারীকেও পতিত হতে হয় । একের উত্থানে উভয়ের উত্থান, একের পতনে উভয়ের পতন অনিবার্য্য।

নারীশক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করতে হলে নারীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে তাঁকে আসতে হবে মুক্তাঙ্গনে । শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সুস্থতা বিষয়ে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের পুরুষগণও নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন । নারিগণের শুভাশুভ যেদেশে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, সে দেশের পুরুষগণই যদি নিজেদেব স্বাস্থ্য

সম্বন্ধে এত অবহেলা করেন তবে কি ভাবে নারিগণের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে তাঁরা যত্নবান হবেন। পুরুষদের বাইরে পরিশ্রম করতে হয় বলে কেবল তারাই শরীরের প্রতি মনোযোগী হবেন, এমত ভাবা ঠিক নয়। নারী ও পুরুষ উভয়ের শরীর এক নিয়মে বাঁধা। পুরুষদের শরীর চালনার অভাবে শরীর নষ্ট হলে নারীরও সেই একই কারণে শরীরের ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের রমণিগণ পুরুষের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম করেন অনেক কম। বিশেষ করে নগর-বাসিনী ধনী ঘরের রমণীদের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম একেবারেই নেই। তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ থেকে সূচিকর্ম, পুস্তকপাঠ বা গল্প করে আলস্যে কালযাপন করেন। ফলে অনায়াসেই রুগ্না হয়ে পড়েন। তুলনায় গ্রাম্য মহিলাগণকে অনেক বেশী শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, সাঁতার কাটা, কলসী করে পুকুর থেকে জল তোলা, গৃহকর্মের অবসরে বৃক্ষাদি রোপণ ও জল সিঞ্চন কাজে অতিবাহিত করতে হয়। গ্রাম্য রমণিগণ অন্তঃপুর মধ্যে তেমন আবদ্ধ থাকেন না, তাই তাঁদের শারীরিক ক্ষতি তেমন হয় না।

ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলাগণকে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে হয় না। তাঁরা নানাবিধ স্বাস্থ্যকর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। তাঁরা অনেকে অবসর সময়ে অশ্বারোহণ করে থাকেন, আর যারা অশ্বারোহণে অসমর্থ, তাঁরা কেউ বা নৌকারোহণ, আবার কেউ বা পদব্রজে ভ্রমণ করে থাকেন। ভারতীয় রমণিগণের তুলনায় তাঁরা অনেক বলশালিনী। সুস্থতাবশতঃ তাঁরা যেমন অধিকদিন জীবিত থাকেন, তেমনি আবার সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানের জন্মদানেও সক্ষম। ঠিক অনুরূপভাবে অসুস্থতা ও রুগ্নতার কারণে ভারতীয় মহিলাগণ সল্পায়ু হন, এবং অসুস্থ ও রুগ্ন সন্তান প্রসব করেন। সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভ করতে হলে যেমন পুরুষগণের শারীরিক অঙ্গচালনা একান্ত প্রয়োজন, তেমনি রমণিগণেরও তদ্রূপ অঙ্গ চালনা অপরিহার্য্য। "পল্লীগ্রাম বাসিনীগণ এইরূপ করেন বলিয়া তাঁহারা নগরবাসিনী দিগের অপেক্ষা অধিক বলবতী, ও সুস্থশরীরা হয়েন। নগরবাসিনীগণ কাচ-নির্ম্মিত গৃহমধ্যে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় ম্লান হইয়া যান, কিন্তু পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা বনলতার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।"[৬৫] সুতরাং তৎকালীন সমাজে মহিলাদের না ছিল শিক্ষার অবাধ সুযোগ, না ছিল শরীর সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টা। সবই তাঁরা ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে

থাকতেন । অপরে সবই করে দেবে । কোন ব্যাপারেই মহিলাগণ নিজেরা কিছু আয়ত্ব করবার চেষ্টা বা তাগিদ অনুভব করতেন না । মূলে নানা কারণ থাকলেও নগরবাসিনী ধনী মহিলাগণের মধ্যে যেমন অলসতা তেমনি বিলাসিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

শুধু মহিলাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চ্চার কথাই বলি কেন, আমাদের ভারতীয় পুরুষগণও তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন নন । তার জন্য আমাদের ভারতীয় মাতাগণও কম দায়ী নন । শৈশবকাল মাতার ক্রোড়েই অতিবাহিত হয়। মাতা নিজের দুর্বলতাবশতঃ শিশুকে শরীর চালনা করার কোন সুযোগ দেন না। অথচ এই শৈশবকালই হল শিশুর অধিক শিক্ষালাভের সময় । শিশুকে ছুটাছুটি লাফালাফি করতে দেখলেই মাতা চঞ্চল হয়ে তাকে সে কাজে বাধা দেন । কৈশোর ও যৌবন কালে নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীর চর্চ্চার অভাবে যুবক অচিরেই বৃদ্ধ হয়ে সকল কাজে বিরক্তি বোধ করতে থাকেন এবং শ্রমাভাবে শরীর রোগগ্রস্থ ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন । কিন্তু ইউরোপীয় যুবকগণ অনেক বেশী বলশালী ও শারীরিক কার্য্যক্ষম । তথাকার স্কুল কলেজগুলিতে পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে । নৌকাবাহন, অশ্বারোহণ প্রভৃতি বলপ্রদ কার্য্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখেন বলে তথাকার যুবকদিগকে সাতিশয় বলিষ্ঠ দেখা যায় । বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াতে তারা চমৎকার মানসিক প্রফুল্লতা ও উৎকর্ষতা লাভ করতেন। কিন্তু ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে শরীর চর্চ্চার কোন সুযোগ নাই ।

শরীরের প্রতি আমাদের দেশীয় যুবক যুবতীগণের মোটেই খেয়াল নেই। তারা শারীরিক হীনতাবশতঃ মানসিক শ্রমেও ক্লান্ত হয়ে সকল প্রকার কর্মক্ষমতা হারিয়ে অচিরেই হীনবীর্য্য হয়ে পড়েন ।

আমরা কোন বিষয় হলেই ইউরোপের সহিত তুলনা করে দেখাই, সেটা মোটেই দূষনীয় নয়। আমাদের তুলনায় ইউরোপের সব কিছু ভাল, আর আমরা তুলনায় নিকৃষ্ট, তা নহে। ভারতীয় জ্ঞান, সভ্যতা বা শিক্ষা কোনটাতেই আমরা হীনবীর্য্য নই । কিন্তু কার্য্যগতিতে কোন কোন বিষয় এখন আমরা অবহেলা করতে শিখেছি। ফলস্বরূপ আমরা অনেক ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়েছি, তবে একথা সত্য যে, যা ভাল, তা সব সময়েই ভাল । যে দেশেরই যা ভাল, তা গ্রহণ করতে কোন

বাধা নেই। তবে আমরা ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙ্গালী যুবকগণ শরীর চর্চ্চার অভাবে শারীরিক পরিশ্রমে কাতর হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি। শারীরিক দুর্বলতার জন্য ভীরুতা আমাদের গ্রাস করেছে। আমরা সাহস হারিয়ে ফেলেছি। এইজন্য কোন বিপদ দেখলে পলায়নকেই শ্রেয় মনে করি। ইউরোপে ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, ইতর, ভদ্র সকলেই সমভাবে শরীরচর্চ্চা করে থাকেন। এইজন্য তাঁরা অধিক শারীরিক শ্রম করতে সক্ষম। তাঁদের বলবীর্য্য অধিক বলে সাহসী। "যাঁহারা আমাদের সমাজের প্রধান অঙ্গস্বরূপ, তাহারা যদি এইরূপ হীনবীর্য্য ও সংসারে বীতস্পৃহ হইতে থাকেন, তাহা হইলে আর কাহার নিকট সমাজের উন্নতি সাধন আশা করা যাইবে।"[৬৬]

দেশের পুরুষশক্তি যেখানে হীনবীর্য্য, সে দেশের মহিলাগণের অবস্থা যে আরো করুণ হবে তা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং শারীরিক কর্মপটুতা কি পুরুষ, কি নারী উভয়েরই অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। শারীরিক দুর্বলতার জন্য হীনবীর্য্যতা জাতিকে দুর্বল করে তুলবে।

বঙ্গমহিলাগণের উন্নতির বিষয়ে চিন্তা করতে হলে আমাদের আরো একটি বিষয়ে ভাবতে হবে, তা হল পারিবরিক জীবনে মহিলাগণের পরিবারভুক্ত সকলের সহিত অবাধে কথাবার্তা বলা, পরিবারস্থ সকলে মিলে যে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা, খাওয়া দাওয়া, হাসি গল্প, কোথাও যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সকলে মিলিতভাবে করলে গৃহের আনন্দ ও সজীবতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

তৎকালীন সমাজে মহিলাদের যে কতরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত — তার একটু বিবরণ এখানে দিচ্ছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করে বলেছিলেন —"হা অবলাগণ! তোমারা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[৬৭] বিংশশতকের শেষ দশকে উপনীত হয়েও যখন ভাবি ভারতীয় অবলাগণের কথা তখন লজ্জায় মাথা আপনি অবনত হয়ে আসে। একটি ৮/১০ বছরের বালিকা বিয়ের পর শ্বশুরালয়ে গিয়ে কিভাবে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হত। শ্বশুরালয়ে তারজন্য অপেক্ষা করত অনাদর, অবহেলা ও নির্যাতন। যে বালিকা শিশু পিত্রালয়ে বাবা-মা, দাদা, দিদি, কাকা, জ্যাঠার আদরে প্রতিপালিত হয়েছেন, বধূ হয়ে শ্বশুরালয়ে এসেই তাকে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে বন্দীদশায় পড়তে

হত। শাশুড়ীমাতা ঠাকুরাণীর নানা হুকুম ও পরিবারের অন্যদের নিকট হতে সহানুভূতির পরিবর্তে লাঞ্ছনাই তার প্রাপ্য ছিল। কবিবর ভারতচন্দ্র বধূদিগের বর্ণনার বিবরণ দিয়েছেন নিম্নরূপ ঃ -

"ঘরে গিয়া আর কি দেখিব ছার,
মিছার সংসার ।
শাশুড়ী-সাপিনী, ননদী বাঘিনী,
সতিনী বিষের ভার ।"[৬৮]

ভারতচন্দ্রের বর্ণনার অনেকাংশ এই বিংশশতকের শেষ দশকেও কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় । ঐ সময় মহিলাগণের লাঞ্ছনার সম্বন্ধে আরো জঘন্যতম উক্তি শোনা যায়। মহিলাগণ "ভোজনে দ্বিগুণ, কামে অষ্টগুণ" ইত্যাদি সব অপ্রকৃত ভাষা মহিলাদের সম্বন্ধে প্রাচীনাগণ ব্যবহার করতেন । মনে হয় যেন কুলবধূকে পোষ মানাবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করেছিলেন যে, বালিকাদের যত অল্প বয়সে বিয়ে হবে কন্যাদানের ফল ততই বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীরা বালিকাবধূর উপর আরো আরোপ করেন যে বধূ যত কথা কম বলে ও অবগুণ্ঠনবতী হয় ততই মঙ্গল। এমনকি বিবাহের যাত্রাকালে মাতার প্রশ্নের উত্তরে পুত্র বলতেন, 'তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' বধূ হল ঘরের লক্ষ্মী, তা নয়, দাসী আনতে যাচ্ছি । ঠিক দাসীর মতই বধূর সঙ্গে আচরণ করা হত।

সমাজে তখন পরিবারস্থ সকলে মিলে একসঙ্গে কোন বিষয় আলাপ আলোচনা, কথাবার্তা বা হাসিগল্প করা ছিল গর্হিত অন্যায় কাজ । এমনকি দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে কথা বলাও ছিল লজ্জার ব্যাপার। রাত্রে শোবার সময়ই বধূ তার স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে সুযোগ পেতেন। গৃহের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে তাকে সবসময় থাকতে হত। কন্যা পিত্রালয়ে যেরূপ আদরে পিতা মাতা, ভাই-ভগিনী ও অপর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কাটাতেন, শ্বশুরালয়ে স্বামীর পিতামাতা ও ভাই-ভগিনিগণের সঙ্গে আনন্দে কাটাবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পারিবারিক কঠোরতায় তা সম্ভব ছিল না।

সুশিক্ষিত যুবকগণকে এইজন্য বলতে শোনা গেছে যে "আমাদের পারিবারিক সুখ নিতান্ত অল্প ।তাঁহারা বলেন যে সংসার তাপে সন্তপ্ত হইয়া কোথায়

পরিবারের মধ্যে যাইয়া হৃদয় মন শীতল করিব, না তাহা একেবারে ক্লেশে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে। পিতা-মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও ভার্য্যার সহিত একত্রে বসিয়া যদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে না পারিলাম, যাহাদিগকে জগতে শান্তি সলিল সিঞ্চন করিবার জন্যই ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত যদি সর্ব্বদা মধুরালাপ করিতে না পারিলাম তবে পৃথিবীর মধ্যে নির্ম্মল সুখ আর কোথায় পাইব।"[৬৯]

শিক্ষিত যুবকগণের মনঃকষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণের মধ্যেও একটা বিদ্রোহের আভাস দেখা যাচ্ছিল। মহিলাগণও পারিবারিক এইসকল আচার আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকেন। পরিবার বা সমাজ নারী হৃদয়ের পরিব্রতা, কোমলতা, কমনীয়তা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলির যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন নাই। তারা শুধু নারীর মধ্যে শঠতা, চারিত্রিক অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করতেপারেন নি। বিবাহের পর বধূ শ্বশুরালয়ের ভালমন্দ, মান-অপমান, ধন-সম্পত্তি ও সুখদুঃখের সাথী, যাকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষ সংসার সাগর অতিক্রম করবেন, তার সঙ্গে দিনের বেলা কোন আলাপ আলোচনা বা কথাবলা ছিল গর্হিত অপরাধ, নিদারুণ লজ্জার বিষয়। "আমরা নারীজাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতেছি, পরস্পর কথোপকথনে ও একত্র মিলনে যে কেবল পুরুষদিগেরই উপকার হইবে এমত নহে। ইহাই আমাদের মহিলাবর্গের উন্নতির একমাত্র উপায়।"[৭০] সুতরাং মহিলাগণকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাদের শিক্ষা দেওয়া যেমন বিশেষ প্রয়োজন, তদ্রূপ গৃহমধ্যে তাদের আরো অধিক স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। পারিবারিক জীবনে মহিলাদের পরিবারস্থ সকলের সহিত এবং সমবয়স্ক স্বামীর বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথন মেলামেশার সুযোগ না দিলে মহিলাগণ বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ হতে বঞ্চিত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারেন। শিক্ষার অভাবে মহিলাগণ সুখশান্তিবিহীন হয়ে গৃহমধ্যে মনোকষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকলে কিভাবে নারী তার গৃহ, সংসার, সন্তান ও পরিজন বর্গের সেবা করবেন। "যখন দশবৎসর যাইতে না যাইতেই বালিকাদিগকে বিদ্যালয় হইতে অপসৃত করা হয়, তখন নিজ পরিবারস্থ সুশিক্ষিত পুরুষের সাহায্য বিনা স্ত্রীলোকেরা কিরূপে সম্যকরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। দশমবর্ষে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, অবগুণ্ঠিত বধূ শ্বশুররালয়ে যদি শ্বশুর, ভাসুর, দেবর প্রভৃতি গুরুজনের

নিকট শিক্ষালাভ করিতে না পারে, তবে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার অন্য উত্তম উপায় আর কি হইতে পারে? এইজন্যই আমরা বলি যে, যদি অবলাগণের প্রকৃত উন্নতি সাধনে কাহারও আন্তরিক বাসনা থাকে তবে স্ত্রীলোকদিগকে পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিত স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ না করিলে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কাহারও প্রকৃত উন্নতির আশা নাই।"[৭১]

তবে মহিলাগণের স্মরণ রাখা দরকার যে স্বেচ্ছাচারিতাকেই তারা যেন স্বাধীনতা বলে মনে না করেন। আমরা পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে ভাবিত হয়ে ইংরাজ মহিলাগণের অনুকরণে যেন প্রবৃত্ত না হই। ইংলন্ড আর ভারতবর্ষ এক নয়। ভারতীয় সভ্যতা, আচার-আচরণ, মানসিকতা, জলবায়ু, খাদ্য, পোষাক কোনটাই ইংলন্ডের সঙ্গে ভারতের তুলনীয় নয়। বঙ্গরমণিগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক নানা বাধানিষেধ নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মহিলাগণের উন্নতি কতটা হয়েছে তা বলা শক্ত। ইংরাজ মহিলগণ স্বাধীনা, তাঁরা যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করতে পারেন, স্বাধীন ভাবে সকল কার্য্যই তাঁরা করতে সক্ষম। উপযুক্ত শিক্ষা অর্জন করা সত্ত্বেও তারা কিন্তু পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেন নি। পরাধীন হয়ে পরের অন্নে প্রতিপালিত হওয়ার যাতনা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করতে থাকেন। ইংলন্ডীয় পুরুষগণ পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা অনুভব করলেও তাঁদের রমণীদের রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন কাজে অংশগ্রহণের অধিকার তখনও দেন নাই। বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী হওয়া সত্ত্বেও ইংলন্ডীয় রমণিগণ রাজ্যসংক্রান্ত কাজে অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে দারুণ অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে মানসিক ক্লেশে কষ্ট পান। তাদের পুরুষগণও যতদূর সম্ভব মহিলাদের তাদের অধীনে রাখার চেষ্টা করছেন। শিক্ষিত জ্ঞানবতী মহিলাগণের নিকট এটা অসহনীয় যন্ত্রণা। "এ প্রকারে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভাপেক্ষা অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া থাকা সুখের বিষয়। যে ব্যক্তি অধীনতাকে ভয়ানক ক্লেশ মনে করিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, তাহার পক্ষে অধীনতা যারপরনাই ক্লেশপ্রদ। অনেকের সংস্কার আছে যে, ইংরাজ মহিলারা সুখী, আমরা নিতান্ত দুঃখী।"[৭২] বঙ্গমহিলাগণের এরূপ ভাবা নিতান্তই অন্যায়। আমরা ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় স্বাধীনতা চাই না। স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার নয়। নিজের ইচ্ছামত পুরুষের হাত ধরে যখন তখন

যেখানে সেখানে যাওয়া ও পরপুরুষের সহিত রঙ্গালাপ করা মোটেই শোভনীয় নয়। স্ত্রীলোক হবেন লজ্জাশীলা, তাদের প্রধান গুণ হবে নম্রতা। দেশের জলবায়ু অনুসারে বঙ্গীয় রমণিগণ অন্য ধাঁচে বর্দ্ধিত হয়েছেন। তাঁরা ইচ্ছা করলেই ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীদের মত বীরবেশে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর কথা ভাবতে পারেন না। তাতে রমণীদের পক্ষে বীরত্বের বদলে সর্বনাশই ডেকে আনবে। বঙ্গ মহিলাদের অনেক অভাব আছে, তারা উচ্চতর শিক্ষা, উন্নত পোষাক পরিচ্ছদ লাভ করুন, অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধন হোক, পারিবারিক স্বাধীনতা লাভ করুক, সামাজিক কু-প্রথা বিশেষ করে বাল্য বিবাহরোধ, পুরুষের একাধিক বিবাহ বন্ধ ইত্যাদি যা মহিলাদের জীবন বিষাক্ত করে তুলেছিল, এগুলি বন্ধ হলেই বঙ্গমহিলাগণের অনেক কল্যাণ হবে। কেননা "অবগুণ্ঠন মোচনপূর্ব্বক পুরুষের সমকক্ষ হইয়া আহার বিহার করা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। আপনাকে আপনি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে শিক্ষা করাই প্রকৃত স্বাধীনতা ও শিক্ষা।"[৭৩] "নারী কি চিরকাল পুরুষের দয়ার পাত্রী হইয়া নিতান্ত পরভাগ্যোপজীবিনীর ন্যায় অতি দীনহীন কাঙালিনী বেশে সংসারে মরুতে বিচরণ করিবে?"[৭৪] জগতের সমস্ত সমাজেই নারীজাতি স্বাবলম্বিনী, নারী স্বাধীনতা রত্নের অধিকারিণী, তাঁরা যদি সতীত্বের আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে পুরুষের যাবতীয় কার্য্যে সহায়িকা হতে পারেন, তবে এই অধঃপতিত হিন্দু সমাজের নারীরাই বা পারবে না কেন? চাই দেশাচারের কঠিন নির্ভার ছিন্ন ভিন্ন করা — জগতের দিকে তীব্র দৃষ্টি রেখে নিজের সমাজকে গঠন করা। তা না হলে এ জাতির আরও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

আমরা অনেক সময় ইউরোপ আমেরিকার সহিত ভারতীয় রমণিগণের অবস্থার তুলনা করলেও আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা, সভ্যতাকে কোন অংশে নীচু করে দেখতে চাই না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের সামাজিক রীতিনীতি বদল হয়। কালের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। সব দেশ যখন তাদের নারীজাতিকে শিক্ষিত করে সঙ্গে নিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, তখন আমরা কেন পশ্চাৎপদ হব? ভারতীয় জ্ঞানভান্ডার কোন জাতির তুলনায় কম নয়। অবস্থার বিপাকে আমরা আমাদের নারীজাতির শিক্ষাকে রুদ্ধ করে দিয়ে উন্নতির পথ রুদ্ধ করেছি। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির

পুনরুজ্জীবন ঘটানোই বর্তমান সময়ে কাম্য। "বিলাত হইতে কর্জ্জ করা সভ্যতা ও আদর্শের পক্ষপাতী আমরা নই। নারী সমাজের অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে প্রাচীন ভারতের আদর্শ নিতান্ত কম নহে — অবশ্য সময়োপযোগী অদল বদল করিতেই হইবে। তবে যাহা আমাদের উপযোগী তাহা আমদের নিকট না থাকিলে পশ্চিম হইতে গ্রহণ করিতে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত হইব না।"[৭৫]—লেখিকার এই মন্তব্য কালের সুদীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও কত না প্রাসঙ্গিক !

কর্মজীবন ঃ

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনিবার্যতায় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর সাহচর্যেই সংসারের পূর্ণতা। একা কি পুরুষ, কি নারী কারোর পক্ষেই সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে সুন্দর রাখা, সজীব রাখা, ঐশ্বর্যমন্ডিত করা সম্ভব নয়। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে পুরুষের প্রকৃতি বহির্মুখী, আর নারীর প্রকৃতি অন্তর্মুখী। এই জগতকে নারী তার অন্তরের মাধুর্য, প্রেম, ভালবাসা, সেবা দ্বারা নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে, সেই অনাদি অনন্ত কাল থেকে আজও রক্ষা করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। দেবী দুর্গার ঈশ্বরীয় সমগ্ররূপ নারীর মধ্যেই কল্পনা করা হয়েছে। তিনি একাধারে জগন্মাতা, কন্যা, আবার তিনিই কল্যাণ রূপিনী। আবার রুষ্টা হলে তিনিই সংহার মূর্তি ধারণ করেন। অথচ এই নারী শক্তি আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে অনাদরে অবহেলায়, লাঞ্ছনার শিকার হয়ে এসেছে। বহু যুগব্যাপী বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়েও নারী তার কল্যাণময়ী রূপটি আজও অক্ষুন্ন রেখেছে।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের উন্নত ও জীবনমুখী সভ্যতার স্পর্শে বহুযুগব্যাপী অবসাদের ক্লান্তি কাটিয়ে আজ সুযোগ বুঝে নারী প্রকাশ্যে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সভ্যতার নূতন আলোর স্পর্শ পেয়ে নারীর মনে তার লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করার চেষ্টা জেগেছে।

প্রথম কথা নারী— সেও মানুষ। সুতরাং মানুষের যে অধিকার থাকা উচিত, নারীর বেলায়ও সেই অধিকার থাকা উচিত। অবশ্য আমাদের একথা

স্বীকার করা উচিত যে, নর ও নারীর কর্মক্ষেত্র সকল ক্ষেত্রে এক নয় । নারীশক্তি আমাদের দেশে অবহেলিত ।শক্তির অবহেলা করে জাতি অধঃপতনের অতলগর্ভে নিমজ্জিত প্রায়। পুরুষ ও রমণীর একজনকে পশ্চাতে রেখে অপরের উন্নতি আকাশকুসুম মাত্র । জাতিকে শক্তিমান করে তুলতে হলে নর ও নারী উভয়কেই সমান শক্তির অংশীদার হতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের বিভিন্নতা হবেই। এই অধিকার ও কর্তব্য কতখানি তা কোন অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট করে দেয়া যায় না।

তবে একথা স্বীকার করা যায় যে নারীর আদর্শ কর্মক্ষেত্র হল গৃহ । সংসার ধর্ম পালন করা নারীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । অর্থনৈতিক কারণেই হোক, অথবা সমাজ ব্যবস্থার নিয়মেই হোক, নাবীরও স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অপরের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু অধিক শ্রেয় । যে স্ত্রীর নিজের অন্ন সংস্থানের ক্ষমতা নেই, সেরূপ স্ত্রীর স্বামী অত্যাচারী হলেও বেঁচে থাকার জন্য তাকে স্বামীর শত নির্য্যাতন ও অত্যাচার সইতে হয় । জগৎ জুড়ে যে এখন স্ত্রীস্বাধীনতার হাওয়া বইছে একে স্থায়ী ভাবে কার্য্যে পরিণত করতে হলে প্রথমেই দরকার স্ত্রীজাতির আর্থিক স্বাবলম্বন । অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হল - বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকা। এমনকি পিতার সম্পত্তিতে পর্যন্ত কন্যার কোন অধিকার ছিল না। কন্যা সন্তানের আর্থিক স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই বা থাকতে পারে না । এ পর্যন্ত বাঙ্গালী মেয়েরা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মেনে নিয়েই পুরুষের ছায়ামাত্র হয়ে সর্ব প্রকারে পুরুষের অধীনতা মেনে নিয়েছিল । আজ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে বাঙ্গালী নারীর মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে — সে আকাঙ্ক্ষা হল পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র নিজের শক্তিতে নিজের স্থান করে নেবার আকাঙ্ক্ষা। সে চেষ্টাকে ফলবতী করতে হলে চাই আর্থিক স্বাবলম্বন ।

শত শত বালবিধবা সামান্য একমুষ্টি অন্নের জন্য, আর দুখানি সাদা কাপড়ের জন্য জীবনভর পরের গলগ্রহ হয়ে শত নির্য্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছে। নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করতে পারলে তাদের শাস্তির পরিমাণ অনেক লাঘব হতো।

রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গুস্বামীর অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা নেই, সেক্ষেত্রে মহিলাগণ অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা বা সুযোগ পেলে অপরের গলগ্রহ হয়ে না থেকে স্বামীর সংসার প্রতিপালন করে নিজে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন। সেইজন্য পাঠ সাঙ্গ হলে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে নিজের পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের পথ দেখাতে পারলে পিতামাতার চিন্তার কারণ কম হয়। কন্যাকে শিক্ষা দেবার সময়ে যাতে তার স্বাধীন জীবিকা অর্জনের একটা উপায় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন।

তবে আশার কথা এই যে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে নারীর ভাগ্যাকাশে ঘনবাদলের দুর্য্যোগ কেটে যাবার ফলে নূতন সূর্যোদয়ে কিছুটা স্বাধীনতা পেয়ে মহিলাগণ বর্ণ-পরিচয় শিক্ষার সুযোগ পায়, তার ফলে কিছু কর্মের সুযোগ আসে। সেই সুযোগ তাদের নিজেদেরই করে নিতে হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের কিছু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকের দৃষ্টি পড়ে আমদের দেশের অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি। তারা বঙ্গদেশের সমাজের কতকগুলি কুট প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন — যেমন, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, অবরোধ প্রথা ও অশিক্ষা। একে একে এই দুর্জয় বাধা অতিক্রম করে কিছু মহিলা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে তাদের ভগ্নীগণকে উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু একাজ করতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

যদিও নারীর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র গৃহ — একথা অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু গৃহের বাইরেও যে বিশাল কর্মজগৎ রয়েছে, যেখানে কেবলমাত্র একা পুরুষের পক্ষে সকল কায্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা অসম্ভব। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২/১৩ জন। পূর্ণ শিক্ষিতের সংখ্যা আরো কম এবং শিক্ষিত শ্রেণী মধ্যবিত্তেরই অন্তর্ভূক্ত। এই উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিতের চিন্তাধারা হল - নারীর কর্মক্ষেত্র গৃহ, সন্তান পালন এবং গৃহকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা যেখানে এই, যেখানে অশিক্ষিত জনসমাজে নারীকে একমাত্র গৃহরক্ষিকা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে না পারলে বিস্মিত হবার কিছু নাই।

'গৃহ'ই নারীর আদর্শ কর্মক্ষেত্র এই ধরনের যুক্তি যে কতটা ভ্রান্ত তা আধুনিক যুগের শিক্ষিত নরনারীর চিন্তা করা খুবই প্রয়োজন। এ সম্পর্কে 'মন্দিরা' পত্রিকা

বলেছিলেন — নারীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ এবং বাহিরের কর্মক্ষেত্র গ্রহণ করতে হলেও নারীর প্রধান ক্ষেত্র 'গৃহ' -একথা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেবার কোন কারণ নেই। এই যে কর্ম বিভাগ তা বর্তমান সময়েও শুধু মুষ্টিমেয় ধনী ও মধ্যবিত্ত নারীর জন্য — মধ্যবিত্তের সীমানার বাইরে যে বিরাট নারীশক্তি জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারা এ নীতির বশীভূত নয় ।[৭৬]

কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে চিন্তা করার ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক'একশত বৎসর ধরে মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীর জীবনে এটা প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে এবং সমগ্র নারী জাতির জন্য বিধান হিসাবে এ টা প্রচার করা অত্যন্ত অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে । শুধু গৃহকেই একমাত্র কর্মক্ষেত্রে বলে গ্রহণ করলে অবস্থা আরো জটিল হয়। সমাজে বহু নারী আছেন যারা পুরুষের সঙ্গে সমস্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজে সমানভাবে অংশ নেন — কৃষিক্ষেত্রে কাজ করেন, বীজ বপন, শস্য সংগ্রহ ও বিক্রয় পর্যন্ত করে থাকেন । সমাজের আরো বহু নরনারী আছেন যারা কলকারখানায় সমান দক্ষতায় পুরুষের সঙ্গে কাজ করেন। কলকারখানাগুলিতে প্রায় অর্দ্ধেক নারী কর্মী । এইসব নারীর গৃহ আছে, সন্তান আছে । এইসব নারীবা যদি গৃহকেই একমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে মনে করতেন তবে দেশের অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হত ।

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ঘরে দেখা যায় যে একজন মাত্র উপার্জ্জনশীল পুরুষকে ১০/১২ জনের ভরণপোষণের দায় বহন করতে হয়, যা হয়ত দুজনার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে জীবন যাত্রার মান কমে যেতে বাধ্য । তাই দেখা যায় যে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার নীরব সহিষ্ণুতায় সন্তান, স্বামী ও পরিবারের আত্মীয় স্বজন নিয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করেন । অনেকে আবার এমন ধারণা পোষণ করেন যে নারীর উপার্জ্জনের পয়সায় সংসার প্রতিপালন করা খুবই লজ্জার ব্যাপার । নারী উপার্জ্জনক্ষম হলে পুরুষের প্রাধান্য নষ্ট হতে পারে । মধ্যবিত্ত গৃহে নারীর উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য এইভাবে মধ্যবিত্ত নারীকে অক্ষম করে রাখার দুঃখময় পরিণাম চিন্তার মধ্যে আনতে কষ্ট হয় । পুরুষ এবং পরিবারের অন্যদের এই দৃষ্টিভঙ্গি বড় অদূরদর্শী। কারণ নারী স্বাবলম্বিনী হলে যে বস্তু পুরুষ সাহায্যকারিণী হিসাবে নারীর কাছ থেকে লাভ করতে পারেন তার সন্ধান পুরুষের জানা নেই । তাই তুচ্ছ বস্তু হারাবার ভয় প্রবল হয়ে উঠছে। যদি নরনারী উভয়েই কিছু সময়

কর্ম ব্যাপদেশে গৃহের বাইরে থাকেন তবে গৃহ পরিবেশ আকর্ষক হওয়া স্বাভাবিক, এবং কেবল গৃহমুখী চিত্তই গৃহকে মনোহর করতে পারে—বাধ্যতামূলক নীতি নয়। অপরদিকে দিবারাত্র গৃহবন্দিনীর কাছে গৃহ কারাগার মনে হওয়াই স্বাভাবিক এবং তা যদি না হয় তবে বুঝতে হবে যে তিনি বহুকালের বন্দী জীবনে ক্ষীণবল ও ভীরু হয়ে বহির্জগতের মুক্ত রুক্ষ বাতাস, আলো তাঁর ভীতির কারণ হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা, সাহস ও সহযোগিতার দ্বারা মনকে ভয়মুক্ত করে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়াই একমাত্র পথ। এই পথে নিজের জীবন অপেক্ষাকৃত বরণীয় হয়ে উঠবে।

এতদিন শিক্ষার অভাবে এবং সামাজিক নানা বাধানিষেদের জন্য মহিলাগণ যে লাঞ্ছনার স্বীকার হতেন, আজ তা থেকে যদিও তারা অনেক মুক্ত, তথাপি সর্বক্ষেত্রে তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। তবে আজ আর নারী গৃহবন্দী জীবনযাপনের কথা ভাবতে পারেন না। বাইরের মুক্ত বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে ভিতরের দুষিত বায়ুকে অনেকটা স্বাভাবিক করতে পেরেছে। নারী জাগরণ শুরু হয়েছে।

আমাদের দেশের মেয়েরা ধীরগতি হলেও বেথুন স্কুল স্থাপনের পর নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষা লাভের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে আত্মনির্ভরত্ব ও আত্মসচেতনতা দেখা দেয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু মহাশয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর কুড়িবৎসর যাবৎ কোন মহিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসার অধিকার ছিল না। চন্দ্রমুখী বসু নামে একজন খ্রীষ্টান মহিলা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স দিবার আবেদন করলেও তাঁকে পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়নি।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ সমাবর্তন উৎসব সভায় তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর হবহাউস সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং চন্দ্রমুখী দেবী পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ছেলেদের জন্য যে প্রশ্নপত্র তৈরী হয়েছিল তা তাকে দেয়া হলে তিনি তার উত্তরপত্র তৈরী করে জয়যুক্ত হন। তারপর হবহাউস সাহেবের চেষ্টায় মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

শ্রীমতী সরলা দাস (মিসেস পি. কে. রায়) ও কাদম্বিনী বসু (মিসেস

দ্বারিক গাঙ্গুলী) ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করে অনুমতি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয়া কাদম্বিনী বসুকে বেথুন স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করে। ১ নম্বরের জন্য তিঁনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ভারতে কাদম্বিনী বসুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার প্রথম অধিকার প্রাপ্তা ছাত্রী।

১৮৮০ সালে কাদম্বিনী বসু ও দেরাদুন নিবাসী চন্দ্রমুখী বসু ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা দেন। চন্দ্রমুখী বসু পূর্বে যে টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন তার ফলে এনট্রান্স পরীক্ষা না দিয়াই এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন। এঁরা দুজনেই ১৮৮৩ সালে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। ভারতে তারাই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটের সন্মান লাভ করেন। ১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ সমাবর্তন সভায় এই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটদ্বয়কে উপাধিদান কালে ভাইস-চান্সেলার রেনল্ড সাহেব উচ্চ প্রশংসা করেন।

১৮৮৬ সালে কবি স্বর্গীয়া কামিনী সেন (পরে রায়) বেথুন ফিমেল স্কুল থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ.পাশ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট। ইনি প্রথম অনার্স প্রাপ্তা মহিলা। সংস্কৃত শাস্ত্রে অনার্সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগীর ও শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সোম বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (দেবী চৌধুরাণী) বেথুন কলেজ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী ইন্দিরা ঠাকুর (পরে মিসেস পি. চৌধুরী) ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ভারতে মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম ফরাসী ভাষায় অনার্স নিয়ে পাশ করেন।

১৮৯৪ সালে সরলাবালা রক্ষিত সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণী অনার্স নিয়েপাশ করেন। শ্রীমতী স্নেহলতা মজুমদার ১৮৯৯ সালে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে পাশ করেন। বেথুন কলেজ থেকে ১৮৯৩ সনে তিনজন মহিলা বি. এ. পাশ করাতে ভাইস-চান্সেলার জর্জ পিগট সাহেব তাঁদের উচ্চ প্রশংসা করেন।

১৯০০ সালে স্বর্গীয়া লিলিয়ান পালিত (দানবীর স্যার তারকনাথ পালিতের কন্যা) ফরাসী ভাষায় অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করেন ।

১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু ফ্রি চার্চ মিশনারী থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাশ করেন । তিনি ইংরাজীতে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । ভারতে প্রথম এম. এ. পাশ মহিলা তিনিই । বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মেয়েদের এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার অধিকার ছিল না সেইসময় তিনি ১৮৭৭ সালে ছেলেদের প্রশ্নপত্রে যে টেষ্ট পরীক্ষা দেন সেটাই তার এনট্রান্স পরীক্ষার ফলরূপে গণ্য হয় । অনেক আন্দোলনের পর তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দেবার অধিকার পান। তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় বেথুন কলেজে । তিনি সেখানে ১৮৮৬ সালে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৮৮৮ সালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষার পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০১ সালে অসুস্থতার কারণে অবসর নিতে বাধ্য হন ।

১৮৯১ সালে শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সোম ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করেন । পরে ১৮৯৪ সালে নির্ম্মলাবালা দর্শনে দ্বিতীয় ভাগে পুনরায় এম. এ. পাশ করেন । নির্ম্মলা বালা ভারতে প্রথম ডবল এম. এ. পাশ মহিলা । নির্ম্মলাবালা প্রথম বিবাহিতা নারী যিনি বি. এ. ও এম. এ. পাশ করেন । ৫টি গ্রন্থের লেখিকা ছিলেন । সহিত্য সাধনাতেই অধিক মনোযোগী ছিলেন তিনি ।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শতশত মহিলা গ্রাজুয়েট প্রতি বৎসর পাশ করে বের হচ্ছেন । এখনকার দিনে এ-এক সাধারণ ব্যাপার । কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নানা বাধার মধ্যে তখনকার মহিলারা যেভাবে উচ্চ শিক্ষার পথ দেখিয়েছেন তার ইতিহাস যখন পাঠ করি তখন সত্যই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে ।

চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের তখন একমাত্র বিদ্যাপীঠ ছিল কলিকাতা মেডিকেল কলেজ । মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার এখানেও ছিল না । তবে যে কোন ব্যক্তি বি. এ. পাশ করে ডাক্তারী পড়তে চাইলে বিনা আপত্তিতে তাকে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হত । কাদম্বিনী ১৮৮৪ সালে ভর্তি হয়ে ৫ বৎসর ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও তাঁকে এম. বি. ডিগ্রী দেয়া হয়নি। তিনি ১৮৯২ সালে ইংলন্ড যান। পরের বছর এল. আর . সি. পি. (এডিনবরা)এল. আর. সি. এস. (গ্লাসগো) এবং ডি. এফ. পি. এস. (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন ।

কিছুদিন ডাফরীন হাসপাতালে কাজ করার পর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে (১৮৯০) তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন । ট্রান্সভাল অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম সভাপতি হন । ১৯০৭ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের একজন উৎসাহী সদস্যা কর্মী ও ১৯২২ সালে বিহার ও উড়িষ্যার নারী শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত কমিশনের অন্যতমা সদস্যা ছিলেন ।

রমণিগণ ডাক্তারী পাশ করে দেশের ও সমাজের অনেক মঙ্গলসাধন করেছেন। কাদম্বিনীকে এম. বি. উপাধি দেওয়া না হলেও স্বর্গীয়া বিধুমুখী বসু এবং শ্রীমতি ভার্জিনা মেরী মিত্র (মিসেস পি. সি. নন্দী) যথাক্রমে ১৮৯০ সালে এবং ১৮৯৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ করে বঙ্গনারীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন । বিধুমুখীর ভগ্নী বিন্দুবাসিনী বসুও এম. বি. পাশ করেছিলেন।

আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারকগণ কিছু উচ্চবর্ণের মেয়েদের উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে তার প্রভাব তেমন পড়েনি । তবে তাদের চেষ্টার ফলে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে জাগরণের প্রবল চেতনা দেখা দিয়েছিল । মহিলাদের মধ্যে জাগরণের এই উদ্যম চেষ্টাকেই উনিশ শতকের নারী জাগরণ বলা হয় । উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবরোধ প্রথা বা পর্দাপ্রথা ভাঙ্গতে শুরু করে এবং মেয়েরা আরো ব্যাপকহারে শিক্ষালাভের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মমেয়েদের নিয়ে ১৮৬৫ সালে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । এমনকি একজন ইংরাজ মহিলাকে শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয়, কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টাতেই এই প্রথম বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা শুরু হয়।

'বামাহিতৈষী সভা' ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । এটিও কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন । তবে এটি 'ব্রাহ্মিকা সমাজে'র মত ধর্মীয় সভা ছিল না । এতে উচ্চ হিন্দুঘরের মেয়েরা যোগ দিতেন । ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা অবাধ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকেন। উপাসনাকালে মহিলাগণ চিকের ভিতরে বসবেন, কি বাইরে বসবেন তা নিয়েও বিরোধ দেখা দেয় । অবশেষে বিরোধের মীমাংসা হয় — মেয়েরা উপাসনা ঘরে চিকের বাইরে আলাদাভাবে

বসবেন। এইভাবে মহিলাগণ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে ক্রমশঃই অগ্রসর হতে থাকেন। ১৮৮০ সালে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পরিচালনার জন্য একজন মহিলা আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন । ইনি নীলরতন সরকার মহাশয়ের শ্বশ্রূমাতা ও গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী মনোরমা দেবী। শিক্ষার সুযোগ পেয়ে মহিলাগণ দেশের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাগণ ক্রমশঃই অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেন ।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় বিরোধ দেখা দেয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' ও 'সাধারণ' এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদল নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের তরফ থেকে 'আর্যনারী সমাজ' স্থাপন করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আনন্দমোহন বসুর সহধর্মিণী সুবর্ণপ্রভা বসুর নেতৃত্বে 'বঙ্গমহিলা সমাজ' গঠন করেন। কেশবচন্দ্রের সহধর্মিণী জগন্মোহিনী দেবী পরবর্তীকালে আর্য্যনারী সমাজের নেতৃত্ব দেন । এইসব সমিতিগুলি মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা যেমন করেন, তেমনি জ্ঞান, নীতি ও ধর্মভাব জাগ্রত করার মানসে নানাধবনের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আলাপ আলোচনা, উপদেশ ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করেন । মহিলাদের কিছু হাতের কাজ শিক্ষা দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য এইসব সমিতির মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে মহিলাদের শিক্ষা দিতেন । মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং স্বদেশ প্রীতি জাগ্রত করার জন্য ১৮৭৯ সালে একটি শিল্প মেলার আয়োজন করা হয় । মনে হয় এটাই প্রথম বাঙ্গালী মেয়েদের চেষ্টায় শিল্পমেলা । এইসব শিল্প মেলাতে মহিলাদের হস্তনির্মিত সূচিশিল্প, আসন, জুতা, থলে, পশম ও সূতি বস্ত্রের উপর নানা কারুকার্য, কৃষ্ণনগরের পুতুল, ঢাকার স্বর্ণকারদের রূপা ও সোনার গহনা, ভারতীয় চিত্রকরদের পটচিত্র, বেনারসী শাড়ী, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, ভাস্করীয় প্রতিমা ও নানাধরণের আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল । চরকা, ফুলের তোড়া ইত্যাদিও প্রদর্শনীর শোভা বৃদ্ধি করত ।

মহিলা ও পুরুষ শিল্পীদের উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রদর্শনীগুলিতে হাতের কাজ ছাড়াও নানাবিধ ফল, ফুল, চারাগাছ, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদদ্রব্য এবং কৃষি ও শিল্পে ব্যবহৃত নানাধরনের যন্ত্রাদি — যেমন

তাঁত, লাঙ্গল, চরকা প্রভৃতি প্রদর্শনীতে বিক্রির জন্য স্থান পেত । তেমনি শারীরিক কসরত —অশ্বচালনা, পাইকখেলা, কুস্তি প্রভৃতির খেলাও প্রদর্শনীতে দেখান হত । এগুলি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন হত । এভাবে কিছু মহিলার অর্থউপায়ের একটা পথ তৈরী হয়েছিল ।

তৎকালীন শিক্ষিত মহিলাগণ সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে অনাথ, দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টায় সচেষ্ট হন । এদের চেষ্টায় এই সময় বিভিন্ন সভা-সমিতি স্থাপিত হয় । সমাজের বুকে ফোঁড়াস্বরূপ বালবিধবাদের দুঃখ তাদের মনকে নাড়া দিয়েছিল। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটান এবং বঙ্গমহিলাগণকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টায় বহু শিক্ষিত মহিলা সচেষ্ট হয়েছিলেন ।

'বামাহিতৈষিনী সভা' ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের দলাদলির ফলে তৎকালীন শিক্ষিত মহিলাগণের একাংশ আদর্শ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইউরোপীয়দের অনুকরণ না করে ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে চলার পক্ষপাতী ছিলেন । আবার কিছু মহিলা ইউরোপীয় অনুকরণকেই প্রধান্য দেবার পক্ষপাতী ছিলেন । এর ফলস্বরূপ 'আর্য্যনারী সমাজ' ও 'বঙ্গমহিলা সমাজ' গঠিত হয় । ১৮৭৯ সালের মে মাসে কেশবচন্দ্রের অনুগামীগণ 'আর্য্যনারী সমাজ' গঠন করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন ।

'আর্য্যনারী সমাজে'র উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ - বাংলার নারী সমাজের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করা, প্রাচীন ও আর্য্যবংশীয় হিন্দুমহিলাদের বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার অনুসারে নারী সমাজের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন, ধর্মভাবের উপর ভিত্তি করে সমাজ সংস্কার, নারীর শরীর, মন ও আত্মার সংশোধন করা, সকলক্ষেত্রে পুরুষের অনুকরণ না করা, বিজাতীয় রীতির পরিবর্তে জাতীয় কল্যাণকর বিষয় সমূহের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া, নারীজাতির উন্নতির জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে নারীস্বভাবকে প্রস্ফুটিত করা ঐ সভার নিয়মগুলির অন্যতম । এককথায় সামাজিক ও গৃহকর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছিল এর মূল লক্ষ্য । কাজের সুবিধার জন্য ঐ সভা কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে একটি অধ্যক্ষসভা

তৈরী করে। এদের নামের তালিকার মধ্যে সৌদামিনী গুপ্ত, রাজলক্ষ্মী সেন, রাধারাণী লাহিড়ী, গোলাপ দেবী ও কুমুদিনী বসু উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জগন্মোহিনী দেবী ও মোহিনী দেবী সমিতির কর্মচারী পদে অধিষ্ঠিত হন।[৭৭]

'বঙ্গমহিলা সমাজ'ও বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো, নীতিবোধ ও ধর্মীয়ভাব জাগ্রত করার জন্য গঠিত হয়েছিল। এইজন্য বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সৎসঙ্গ করা, উপদেশ দান, নারী প্রগতি ও নারী শিক্ষা নিয়ে আলেচনা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা এই সভার কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭৮]

'বঙ্গমহিলা সমাজে'র কয়েকটি বাৎসরিক অধিবেশনের বিবরণ আমরা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র পাতায় পাই। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে দশম বাৎসরিক উৎসবের পর আর এই সভার কোন অধিবেশনের উল্লেখ নাই। ১৮৯০ সনের আগষ্ট মাসে মোহিনীমোহন বসু মহাশয়ের বাড়ীতে একটি সভা হয়। সেখানে অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু 'বঙ্গমহিলা সমাজে'র নাম সেখানে পাওয়া যায় না। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নারী সমাজের পক্ষ থেকে একটি অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রবাবু সেখানে 'মহাসমিতি' (কংগ্রেস) সম্বন্ধে নারীজাতির কর্তব্য বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।[৭৯]

১৮৯৫ এর আগষ্ট মাসে কিছু ব্রাহ্মমহিলার চেষ্টায় 'ভারতমহিলা' সমাজ গঠিত হয়। এই সমিতি একটি সেলাই এর স্কুল স্থাপন করে দরিদ্র ও অসহায় বালবিধবাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। অসহায় মহিলাদের জীবিকা অর্জনের জন্য স্বাবলম্বী করে তোলাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। প্রতি মাসেই দুটি সভা করে মহিলাদের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা হত।[৮০]

সারাদিন পরিশ্রম করেও যেসব মহিলারা পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে না, সেই সব মহিলাদের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা এই সমিতি গ্রহণ করে। কাদম্বিনী লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে অসহায় বিধবাদের জন্য এই সমিতি একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করে।[৮১]

মহিলাদের শিক্ষা ও তাদের স্বনির্ভর করে তোলার কাজে তখন বহু মহিলা অগ্রণী হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখী সমিতি' একটি শিল্প মেলার আয়োজন করে। মেলায় প্রদর্শিত মহিলাদের হাতের কাজ খুবই জনপ্রিয়

হয়েছিল। অনাথা, বিধবা ও দরিদ্র কুমারী কন্যাদের শিক্ষা দিয়ে পরে তাদের দ্বারাই অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। বহু প্রতিষ্ঠান মহিলাদের কাজে সহায়তা ও উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন কুটির শিল্প নির্মাণে উৎসাহিত করেন। এইসব শিল্পমেলার মাধ্যমে একদিকে যেমন মহিলাদের মধ্যে কর্মের উদ্দীপনা দেখা দেয়, অন্য দিকে জাতীয় স্বাধীনতা চেতনা জাগরিত হয়। বিভিন্ন চৈত্রমেলা বা শিল্পমেলার মধ্য দিয়েই ভারতবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অনুরাগের জন্ম হয় এবং স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্যস্থাপন ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার তাগিদ দৃঢ়তর হয়। ধীরে ধীরে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে মহিলাদের শিল্প কর্মের প্রতি অনুরাগী করে তোলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা যায় যে ১৯০১ সালে ভারত সরকার সিমলা অধিবেশনে স্থির করেন যে, আমাদের দেশে মহিলাদের জন্য কুটীরে নির্মিত শিল্প সামগ্রীর কেন্দ্র খোলা হোক। "১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শিল্প সমিতির তত্ত্বাবধানে ৯ নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে মহিলা শিল্পাশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আবশ্যক বুঝিলে কুমারীদিগকেও আশ্রয় দেওয়া হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অনাথা বিধবাদিগেরই আশ্রয় স্থান।...... শিল্প সমিতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, বিধবাশ্রম স্থাপন। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষাদান।"[৮২]

এই শিল্প বিদ্যালয়ে দৈনিক ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত শিক্ষাদানের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যাতে পুরমহিলাগণ গৃহকর্মের দায়িত্ব সমাধা করে অবসর সময়টুকু শিল্প শিক্ষা করতে পারেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য এই শিল্প বিদ্যালয় উন্মুক্ত ছিল। এখানে নিম্নলিখিত শিল্পগুলি শিক্ষা দেওয়া হত ঃ -

১। ক) বস্ত্রবয়ন ও সূতাকাটা, খ) কাটা কাপড় ও পোষাক, গ) কলের মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি, ঘ) লেস। ২। ক) রেখাচিত্র ও তৈলচিত্র, খ) খোদাই ও গঠন কার্য্য, গ) সঙ্গীত যন্ত্র আলাপন, ঘ) নানাবিধ কারুকার্য্য। ৩। ক) রন্ধন, খ) শুশ্রূষা, গ) স্বাস্থ্যরক্ষা, ঘ) সহজ চিকিৎসা। নিম্নলিখিত মহিলাগণ শিল্পাশ্রমের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার, শ্রীমতী মহারাণী মৌরভঞ্জ, শ্রীমতী মহারাণী অধিরাণী বর্দ্ধমান, লেডি হ্যামিল্টন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, শ্রীমতী যদুমতি দেবী, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী,

মিসেস এন, এন, ব্যানার্জ্জী, মিসেস চ্যাপমান, মিসেস হোমউড, মিসেস কে. পি. গুপ্ত, মিসেস শিশির মল্লিক, মিসেস পিক, মিসেস আর. সি. দত্ত, মিসেস জে. এন. দত্ত, মিসেস এন. দাস, কুমারী কুমুদিনী মিত্র, মিসেস এস. পি. সিংহ, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী - সম্পাদিকা ।[৮৩]

এই আশ্রমে তখন ত্রিশটি কন্যা বাস করতেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হিন্দুবিধবা এবং এদের ব্যয়ভার সমিতিই বহন করতেন। দৈনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৫০ টি। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের জন্য বহু আবেদন পাওয়া গেলেও অধিক ব্যয়ভার বহন এবং বিধবা নিবাসে স্থানাভাবের জন্য অধিক ছাত্রী গ্রহণ একরূপ অসম্ভব ছিল। প্রতিমাসে প্রায় হাজার টাকা এই আশ্রম ও স্কুলের জন্য ব্যয় হত । তার মধ্যে সরকার চারশ টাকা দান করতেন। বাকী ছয় শত টাকা জন সাধারণের নিকট থেকে চাঁদার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হত। সুতরাং তখনকার শিক্ষিত মহিলাগণ অনাথ ও দুঃস্থ বিধবাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন । এইভাবে বহু মহিলা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াবার চেষ্টা করেছেন ।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক সভাসমিতি গঠিত হতে থাকে। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষা, নারীকে স্বনির্ভর করে তোলা। যাতে নারী তার প্রাপ্য অধিকার নিজ ক্ষমতায় অর্জন করতে পারে।

বিংশশতকের প্রারম্ভে নারী শিক্ষার মলয় বাতাস আরো প্রবল বেগে বইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবী ব্যাপী নারী আন্দোলনের বান উঠেছিল। ভারতীয় নারীসমাজও পিছিয়ে ছিল না। বঙ্গনারীর বদ্ধ অর্গলও খুলে যায়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল অন্দর মহলের বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করা, ছেলেদের সমান শিক্ষালাভ, মহিলাদের জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম করা, দৈনিক জীবনে যাতে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয় তার জন্য চেষ্টা করা, অপর সকলের সমকক্ষ কাজ করলে সমান বেতন লাভ করা, সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান স্থান অধিকার করা।

শিক্ষালাভের ফলে মহিলাগণ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। বহু শিক্ষিত মহিলা বিনা পারিশ্রমিকে সেবামূলক কর্মে যোগ দেন, আবার বহু মহিলা কর্মের বিনিময়ে পারিশ্রমিক লাভ করতেন। যিনি যেভাবে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন, তিনি সেইভাবে কর্ম গ্রহণ করছেন। কেউ সমাজসেবা, কেউ শিক্ষাবিস্তার, কেউ

রাজনীতি, কেউ সাহিত্যচর্চ্চা, কেউ বা ধর্মীয়পথে নারী মঙ্গলের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। কেউ বা পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে জনমত গঠন করে মহিলা সমাজকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে তাঁরা নিরলস চেষ্টা চালান।

মহিলাগণ যে কোন কাজেই অযোগ্য নন—সময় ও সুযোগ পেলে তাঁরা সুচারুরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করতে পারেন, কর্ম পেলে নিষ্কর্মা হয়ে অলস জীবনযাপন করেন না। সোনারূপার গহনায় পালিসের কাজের মত সূক্ষ্ম কাজও মহিলাগণ করতে পারেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাই অক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয়ের বক্তব্যে। তাঁর সোনার গহনার দোকান ছিল। একা গহনা তৈরী ও পালিসের কাজ করে উঠতে খুবই অসুবিধা দেখা দেওয়ায় স্ত্রীকে পালিসের কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। স্ত্রী তখনকার সামাজিক পরিবেশে লোকনিন্দার ভয়ে প্রথমে রাজী না হলেও পরে সম্মত হন। "শেষে কিন্তু আমার দরখাস্তটি মঞ্জুর হল। . . . . . প্রথম দুই একদিন যাই হোক — পরে স্ত্রীর হাতে বেশ কাজ হতে লাগল। আমি ত একটা ভাল পালিস হতে না হতে তাড়াতাড়ি আর একটা ধরে শেষ করতেম—কিন্তু আমার স্ত্রী তা করতেন না। আস্তে আস্তে এক একটা ধরে সুন্দর রূপে পালিস করতেন।"[৮৪]

পরে অবশ্য তিনি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপূজার আগে বা অন্য সময় যখন কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পেত গ্রাম থেকে নিজের আত্মীয়া অন্য মহিলাদেরও আনিয়ে তাদের সাহায্য নিতেন। "আমাদের কাজের যতটুকু যা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে—এই নারী সাহায্য না নিয়ে করতে হলে একে এর চেয়ে অনেক নীচে পড়ে থাকতে হত। এই জন্যই আজ মাতৃমন্দির খুলে নারীকে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রের সহায়িকা করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার চেষ্টা ভগবান সফল করুন।"[৮৫]

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা লাভের ফলে মহিলাগণ বিভিন্ন পেশায় দেশের বিভিন্নস্থানে কর্ম উপলক্ষে গমন করেন। সরলাদেবী চৌধুরাণী স্বভাবসুলভ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুদূর মহীশূরে গিয়ে মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বরোদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কাজে যোগ দেন। এইকাজে তিনি ৪৫০ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী

অন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন । তাঁর চেষ্টার ফলে 'ভারত-স্ত্রীমহামন্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয় ও সারা ভারতে তার শাখা বিস্তার লাভ করে । ১৯৩০ সনে তিনি কলিকাতায় 'ভারত-স্ত্রী-শিক্ষালয়' স্থাপন করেন ।

কামিনী রায় বেথুন কলেজ থেকে প্রথম ভারতীয় অনার্স গ্রাজুয়েট হন এবং শিক্ষয়িত্রীরূপে ঐ কলেজেই কর্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করে সন্মানিত করেন ১৯২৯ সালে। তাঁর বোন যামিনী সেন লেডি ডাক্তার হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

হেমন্ত কুমারী দেবী (চৌধুরী) ১৮৮০ সালে বেথুন স্কুলের বোর্ডিং এ ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেন। স্কুলে তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন হেমলতা সরকার, সরলা দেবী, যামিনী সেন, প্রিয়ংবদা দেবী, স্বর্ণপ্রভা বড়ুয়া সহ অনেকে। স্বামীর কর্মস্থল শিলং এ তিনি মহিলাদের উন্নতির জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, বহুবিধ কুটির শিল্প এবং মহিলা হাসপাতাল স্থাপন করে বহু মহিলা চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ১৩০৭ থেকে ১৩১১ পর্যন্ত 'অন্তঃপুর' পত্রিকাখানি পরিচালনা করেন এবং প্রৌঢ়া অবস্থায় পাঞ্জাবের পাতিয়ালা ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৫০্ টাকায় লেডি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে কাজে যোগ দেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দেরাদুনে ছিলেন। তিনি দেরাদুন মিউনিসিপালিটির কমিশনারের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

হেমলতা দেবী ছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা। তিনি বিবাহের পর স্বামীর কর্মস্থল নেপালে বসবাস করতেন। তিনি অপর দুইজন ব্রাহ্ম-মহিলার সাহায্যে দার্জিলিঙে 'মহারাণী গালর্স হাইস্কুল' স্থাপন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনিই প্রথম নির্বাচিত মহিলা সদস্য।

কুমুদিনী খাস্তগীর বেথুন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন। বেথুন স্কুলেই কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত বেথুন স্কুলে এবং ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৪ সালে কিছু দিন মহীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলে ছিলেন। ১৯০২ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বেথুন কলেজের অধ্যক্ষার পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ঢাকা বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদে কাজ করে ১৯১৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বিবাহের পর কুমুদিনী দাস হন।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও কর্মপ্রেরণা দুই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজনীতি, সামাজিক বহু সংস্কার মুখী কর্ম, সংসার জীবনে অবহেলিত বহু বালবিধবা ও দুঃস্থ নিরাশ্রয় মহিলাদের শিক্ষাদিয়ে সমাজজীবনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন। একদিকে শিক্ষা, অপরদিকে বিভিন্ন কর্মের প্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে মহিলাগণ জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বহু মহিলা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন।

প্রীতিলতা ওয়াদেকর ঢাকা বোর্ডের আই - এ পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিষ্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন এবং চট্টগ্রামের নন্দনকানন স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার পদটি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং প্রথম মহিলা শহীদের গৌরব অর্জন করেন।

বনলতা দেবীর শিক্ষা বাড়ীতে। 'সুমতি সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। পরবর্তী কালে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পিতা সমাজ সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'বিধবাআশ্রম' ও বালিকা বিদ্যালয়ের দেখাশুনাও তিনি করতেন। ১৮৯৭ সালে 'অন্তঃপুর' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছেন।

জাগরণের উন্মাদনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে মহিলাগণ আপন প্রতিভাকে বিকশিত করে যার যেদিকে যতটুকু সুযোগ ঘটেছে তাকে কাজে লাগিয়ে কর্মজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৯২৬ সনের মার্চ মাসে ফরিদপুর ও বরিশাল জিলার সরকারী ইন্‌সপেকট্রেস মিস লীলাবতী ঘোষ মহাশয়ের সভানেত্রীত্বে প্রথমে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান মহিলা নিয়ে 'মাদারীপুর সমিতি' গঠিত হয়। মাসে একবার এই সমিতির অধিবেশন হত। এতে মহিলাদের সাধারণশিক্ষা, শিশুশিক্ষা ও মাতৃমঙ্গল বিষয়ে কর্তব্য নিদ্ধারণ করা হত। 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'সঞ্জীবনী', 'প্রবাসী', 'বসুমতী' ও 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বালিকা ও মহিলাগণের জীবন সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করা ও আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। এই সভার সভ্যাগণ অবসর সময়ে সুতা কেটে কাপড় প্রস্তুত করতেন। এছাড়া পারিবারিক ব্যবহারের জন্য বড়ি, আচার, চাটনী, মোরব্বা প্রভৃতিও প্রস্তুত করতেন। এই সমিতি কেন্দ্র সমিতি থেকে

২০্ টাকা পুরস্কার পান। "মাদারীপুর মহকুমাস্থ পালং শান্তি কুটীর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিল্প প্রদর্শনীতে সভ্যাগণ নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা রাজবালা দেবী ও শ্রীযুক্তা কুমুদিনী ঘোষ কাঁথা প্রস্তুত জন্য এবং শ্রীযুক্তা সুধাময়ী রায় জরির কাজ, মোজা বোনা ও দর্জ্জির কাজ প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইর জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন।"[৮৬]

টালা মহিলাসমিতির উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ১৯২৬ সনের ২রা মার্চ সমিতির সভ্যা শ্রীমতী সরযূবালা চৌধুরীর বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় খোলা হয়। প্রথমে ৬টি মেয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ হলেও ১ মাসের মধ্যে ছাত্রীসংখা ২০তে দাড়ায়। 'বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা'র 'মহিলা সমিতি সংবাদ' থেকে আমরা নিম্নলিখিত মহিলা সমিতিগুলির কর্মকান্ডের সংবাদ অবগত হই। শ্রীমতী সরযূবালা আপন গৃহের একটি ঘর বিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীমতী মন্দাকিনী ঘোষের সাহায্যে প্রত্যহ ৪ ঘন্টা করে বিনা পারিশ্রমিকে মেয়েদের শিক্ষাদান করছিলেন। পরবর্তীকালে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং জায়গার অভাবে কলিকাতা কর্পোরেশন বিদ্যালয়টির ভার গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'মাড়গ্রাম মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির সভ্যাসংখ্যা ৩৭ জন, সকলেই মুসলমান। প্রতি মাসেই একবার করে এই সমিতির অধিবেশন হত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুমঙ্গল বিষয়ক আলোচনা, পুস্তক এবং মাসিকপত্র পাঠ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে এই সমিতিতে হত। সভ্যারা সকলেই চরকায় সূতা কাটতেন। কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে প্রেরিত শিক্ষয়িত্রী ৪ মাস কাল এখানে থেকে সভ্যাদিগকে সেলাই, ছাঁট কাট ইত্যাদি শিল্পশিক্ষা দিয়েছেন। সমিতিতে মোজা, রুমাল, টুপী, খাঞ্জিপোষ, কম্ফর্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হত এবং ঐ সকল বিক্রয় করে অনেক মহিলা কিছু কিছু উপায় করতেন।

১৯২৬ সালের ১৭ই আগষ্ট মাত্র ১৭ জন সভ্যা নিয়ে 'হুগলি মহিলা সমিতি'র উদ্বোধন হয়। সব মহিলা সমিতিগুলি একই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিলে। নারীশিক্ষা, নারীর বন্ধনমুক্তি, নারীর আর্থিক অভাব দূর করার জন্য নানারূপ শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করা ও বিক্রয় করে কিছু অর্থের সংস্থান লাভ করা ছিল এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বামী পরিত্যক্তা, স্বামীহীনা ও অনাথা কুমারী রমণিগণ উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হয়ে চোখের জলে দিন যাপন করতেন । এই অসহায় রমণীদিগকে স্বাবলম্বিনী করে তোলার জন্য 'সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি' নামে কলকাতায় একটি সুবৃহৎ শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্তের বহুমুখী প্রতিভা ও জন কল্যাণকর কাজের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে এম. বি. ই. উপাধি দেন। 'সরোজ নলিনী মহিলা সমিতি' ও শিক্ষামন্দির তাঁরই নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান। 'বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা'র সৌজন্যে জানতে পারি যে এই বিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্রী উত্তীর্ণা হতেন তাঁদের সকলেই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের বিদ্যা আয়ত্ত করতেন । মাত্র দুই বৎসর মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করলে যে কোন সাধারণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক নিজের শক্তিতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হতেন। এই বিদ্যালয়ে বহুপ্রকার অর্থকরী শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লেখাপড়াও শিক্ষা দেয়া হত। ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকাগণকে এই স্কুলে ভর্তিকরা হত না। সুতরাং বয়ঃকনিষ্ঠের সহিত একযোগে পাঠ করার লজ্জা থেকে বয়স্কা মহিলারা নিস্তার পেতেন। বিধবা, বিবাহিতা অথবা কুমারী যে কোন মহিলা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এখানে শিক্ষালাভ করতে পারতেন ।এখানে বিবিধ কুটির শিল্পও শিক্ষা দেওয়া হত। যে কোন একটি শিল্প মনোযোগ সহকারে দুই বৎসর শিক্ষা করলেই একজন মহিলা গৃহকর্মের অবসরে দৈনিক আট আনা থেকে একটাকা উপার্জন করতে পারতেন । বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলাতে মহিলা সমিতি স্থাপিত হবার ফলে বঙ্গীয় নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল ।

'বঙ্গলক্ষ্মী'র ১৪শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬ সংখ্যাতে নিম্নলিখিত সমিতিগুলির বিবরণ জানতে পারি — কাঁচড়াপাড়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে স্থানীয় হাইন্ডমার্স ইনষ্টিটিউটে মহিলাদের একটি সভা হয় । এই সভায় কেন্দ্রিয় সমিতির প্রধান প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীর লাল সরকার বি. এ. ও মহিলাকর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ সহযোগে মহিলা সমিতির কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । সভায় প্রায় তিনশত মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন । কেন্দ্রীয় সমিতির প্রচারকগণ বিভিন্ন শাখা সমিতিগুলি পর্যবেক্ষণ করে মহিলাদের

উৎসাহ্ দান করতেন। ১৩৪৬ সনে মানিকতলা মহিলা সমিতির উদ্যোগে মানিক তলা মহিলা রেড-ক্রশ সোসাইটির গৃহে মহিলাদের একটি সভায় কেন্দ্রিয় সমিতির প্রচারক পন্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং মিসেস ঘোষ 'জাতি গঠনে মহিলাদের স্থান' সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের পর পন্ডিত কামাখ্যাচরণ মহাশয় ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ সহযোগে মহিলা সমিতির কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা রাখেন ।এই সভায় প্রায় দুই শতাধিক মহিলা যোগদান করেছিলেন ।

বঙ্গদেশের বাইরেও মহিলাদের হস্তনির্মিত দ্রব্যের প্রদর্শনী হত ।বিহারের আরা জেলায় একটি মহিলা শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীর লাল সরকার সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের কতিপয় শিল্প দ্রব্য তথায় নিয়ে যান। মাননীয়া লেডী ষ্টুয়ার্ট সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের স্টলটি বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিদর্শন করেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত সরকারের কাছে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী শ্রবণ করে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন ।তিনি মন্তব্য করেন যে এইরূপ সমিতি প্রকৃতই প্রশংসার্হ ।

বিভিন্ন কাজে মহিলাগণকে সক্রিয় করার চেষ্টাতেই বঙ্গদেশের নানা স্থানে মহিলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা হত। 'জয়শ্রী পত্রিকা'র সৌজন্যেও আমরা তৎকালীন বিভিন্ন মহিলা সম্মেলনের সংবাদ পাই। ১৩৩৮ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নিম্নলিখিত মহিলা সম্মেলনের বিবরণ জানা যায়। বিষ্ণুপুর থেকে কুড়িমাইল দূরে কুতুলপুর গ্রামে বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্তা সুষমারাণী পালিত সভানেত্রীর আসন পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার একটি মোট কথা—স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকা এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক ।

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সভানেত্রীত্বে ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল ধুবড়ী মহিলা সমিতির অধিবেশন গৌরীপুর ময়দানে আয়োজিত হয়েছিল ।প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী সভায় যোগদান করেছিলেন। এমনকি মুসলমান মহিলারাও এতে যোগ দিয়েছিলেন। পর্দা ত্যাগ করে বাইরে আসা ধুবড়ীর মুসলমান মেয়েদের

পক্ষে এই প্রথম। উক্ত সভায় যে সকল রাজবন্দী এখনও কারাগারে আছেন, তাদের মুক্তি এবং দীনেশ ও রামকৃষ্ণের ফাঁসির মুকুব দাবী করে প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়েছিল।

ফরিদপুর জেলা মহিলা সম্মেলনে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা সম্মেলন কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। একটি প্রদর্শনী ও চরকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলন শ্রীহট্ট শহরে অনুষ্ঠিত হয় । শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন । একটি শিল্প প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল ।

শিক্ষালাভের ফলে মহিলাদের মধ্যে নারী ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটে । মহিলাগণ গৃহবন্দী জীবনে আর আবদ্ধ না থেকে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা ও কর্মের আহ্বানে গমন করেন। আধুনিক মহিলাগণ গন্ডীবদ্ধ জীবনের বাইরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। আধুনিক বাঙ্গালী ভদ্র মেয়ে ডাক্তার বা শিক্ষয়িত্রী হয়েই তাঁদের বাইরের কাজ শেষ করেনা। অনেকে ব্যাঙ্কে, জীবনবীমা অফিসে, পোষ্ট অফিসে, রেলস্টেশনে চাকরী করছেন, কেউ খবরের কাগজ, কেউ দোকান বাজার, কেউ ঔষধের কারখানা, কেউ কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালনা করছেন । আইনচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা সবই মেয়েরা করছেন। রাজনৈতিক কাজে মেয়েরা যে কতখানি সাহায্য করছেন তা ত সকলেই দেখতে পাচ্ছেন । তবে সেটা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নয়, কেবলমাত্র দেশহিতেরই জন্য।

এতদিন মেয়েরা অকারণ ভয় পেতেন যে বাইরে কর্মজগতে প্রবেশের ফলে তাঁদের শালীনতা ও ভদ্রতাহানি হতে পারে, আর তাছাড়া অক্ষমতার ভয়ও ছিল। বাইরের কর্মজগতে প্রবেশ করতে হলে যে ধরনের মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধির দরকার তা হয়ত তাঁদের নেই । কিন্তু মেয়েরা পুরুষের কর্মজগতে প্রবেশ করে অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, অক্ষমতা, শালীনতা বা ভদ্রতা কোনটাই ব্যাঘাত

সৃষ্টি করেনা। বর্তমান যুগের মহিলাদের কেবলমাত্র গৃহকার্য নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা উচিত নয়। ঘরে বাইরে বঙ্গমহিলাগণ যাতে সমান মহীয়সী হয়ে উঠতে পারেন সেই চেষ্টাই করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজকালকার দিনে যে নারী কেবল একান্ত ভাবেই গৃহিনী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ।"[৮৭]

পুরুষের একচেটিয়া অধিকারের রাজ্যে প্রবেশ করে নারী কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজয়িনী ও যশস্বিনী হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বহু ক্ষেত্রেই আছে। শিক্ষার অভাবে সমাজের বাধার ফলে গৃহবন্দিনী হয়ে অলস, কর্মহীন জীবন এতদিন যাপন করলেও এখন মহিলাগণ শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই গতিশীল হয়ে উঠছেন। শুধু বঙ্গদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্নস্থানে নারী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে নারী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা' তাঁদের কাগজে বহু মহিলার কৃতিত্বের সংবাদ প্রদান করেছেন। কুমারী শৈলবালা দাসের বিদ্যাবত্তার পরিচয় 'বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা' তাদের কাগজে একাধিকবার প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভার সভ্যারূপে নির্বাচিতা হয়েছেন। এঁর নির্বাচনের বিশেষত্ব এই যে, তিন তিনজন পুরুষ প্রার্থীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইনি জয়লাভ করেছেন। কুমারী শৈলবালা পাটনার একজন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্ণমেন্ট নির্বাচিত ম্যুনিসিপাল কাউন্সিলার, বে-সরকারী জেল পরিদর্শক এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো।[৮৮] ঘরের বাইরে পা দিতে না দিতেই মহিলারা তাদের কর্মক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করছেন।

এতদিন নারী গৃহমধ্যে বন্দিনী থেকে বহুদিনের প্রচলিত ধারা বহন করে চলছিল। কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে যে আর চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকার কথা মহিলাগণ ভাবতে পারছেন না। বাইরের কর্তব্যে সমানভাবে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। তাই বলে গৃহের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করলে চলবে না। গৃহের মর্য্যাদা রক্ষার ভার নারীর উপর। শুধু পুরুষ একা জগতের সামনে, দেশের, জাতির গৌরব তুলে ধরতে পারে না যদি না নারী তার সহায়ক হয়। সুতরাং নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির মধ্য দিয়েই দেশের প্রাচীন গৌরব জগতের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাগণ বাইরের

কর্মজগতের বিভিন্ন বিভাগে কর্মগ্রহণ শুরু করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মহিলাদের কর্মকৃতিত্বের সংবাদ বের হতে থাকে। শ্রীমতী প্রতিমা বাঙলার এড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্নী। তৎকালীন বাংলা সরকার তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের স্ত্রী কয়েদী বিভাগের বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন। শ্রীমতি প্রতিমা দেবী গোখলে মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ও ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (মহিলা বিভাগের) অধ্যক্ষ সভার সভ্যা নিযুক্ত হন। ইনি অন্যান্য অনেক গুণেও গুণবতী। বিশেষতঃ সঙ্গীত ও সূচি শিল্পে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী।[৮৯]

পোষ্ট গ্রাজুয়েট গবেষণা বিভাগেও নারী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারী শকুন্তলা রাও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পালিতা কন্যা। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ও ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করেন। তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর একে মাসিক একশত টাকার একটি পোষ্ট গ্রাজুয়েট গবেষণা বৃত্তি দেন। ইনি কারমাইকেল অধ্যাপক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডাক্তার ভান্ডার করের অধীনে 'প্রাচীন ভারতে নারী' বিষয়ক গবেষণা করেছিলেন।[৯০]

কর্মজগতে প্রবেশ করে নারী তার সীমিত সুযোগের মধ্যেও আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি কুমিল্লা গবর্ণমেন্ট উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বার বৎসর সরকারী চাকুরী করবার পর ১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে সরকারী কাজে ইস্তফা দেন। চাকুরী ছাড়বার সময়ে তিনি প্রভিনসিয়াল গ্রেডে ছিলেন এবং তাঁর মাহিনা ছিল ২৫০ টাকা। তিনি কুমিল্লার 'অভয় আশ্রমে' যোগ দিয়ে ঐ আশ্রমের কর্তৃত্বাধীনে কুমিল্লায় 'কন্যা শিক্ষালয়' নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহিলাদের জন্য উচ্চ জাতীয় বিদ্যালয় তখন বাংলায় এই একটিই। 'কন্যা শিক্ষালয়ের বোডিং থেকে তৎকালীন ইংরাজ সরকার তাঁকে নূতন বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করেন। তিনি বহু বৎসর যোগ্যতার সহিত কুমিল্লা মহিলা সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছিলেন।[৯১]

শিলং নিবাসিনী শ্রীযুক্তা প্রতিভা চৌধুরী বিলাত থেকে কুমারী মন্তেসরি

প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করেন। তৎপরে সপ্তদশ আন্তর্জাতিক মন্তেসরি শিক্ষা সমাপণ করে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন।[১২]

বিভিন্ন সূত্র ও সংবাদপত্র মারফৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু কৃতি মহিলার সংবাদ পাওয়া যায়। কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ—অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক (বরিশাল) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষের কন্যা ! ইনি ১৯২৮ সনে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ঈশান বৃত্তি লাভ করেন । তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ঈশান বৃত্তি লাভ করেছিলেন ।[১৩] তিনি বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বরিশাল শহরের ছাত্রী ও তরুণীদের নিয়ে 'শক্তিবাহিনী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্যের সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কাজ আরম্ভ করে শক্তিবাহিনী'কে সেখানে নিয়ে আসেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউসনের নূতন চালু কলেজ বিভাগে অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেন। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে জালিয়াতি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৪ সালে মুক্তি পাবার পরেও তাঁকে নিজ গৃহে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৩৮ সালে বরিশাল বি. এম. কলেজে অধ্যপনা শুরু করেন। ১৯৪২ এর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ ও গৃহে অন্তরীণ হন। ১৯৫০ সালে আসানসোলের মণিমালা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষাপদে কাজে যোগ দেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত হুগলি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

কুমারী লীলা রায় স্বর্গীয় প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ডায়োসেসন কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।[১৪] পরবর্তীকালে লীলা রায় স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩১ সালে 'জয়শ্রী পত্রিকা'র সম্পাদনার কাজে অংশ নেন । বাংলার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশ নেন এবং 'প্রজা সোস্যালিষ্ট' দলের সভানেত্রীরূপে দেশের সেবা করেন ।

'বাঙ্গালী' মহিলাদের কৃতিত্বের খবরে আমরা বিশেষ পুলকিত। 'জয়শ্রী পত্রিকা' জানাচ্ছে—কুমারী সুষমা মুখার্জ্জী নামে একটি মেয়ে দমদম উড়োজাহাজ

ঘাঁটিতে এরো প্লেন চালনা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পাবার জন্য পরীক্ষা দিবেন। ইহার পর তিনি এরোপ্লেন যোগে পৃথিবী পরিক্রমণে বের হবেন। . . . . বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এরোপ্লেন চালনা শিখিতেছেন। প্রায় বছর দুই আগে একজন ভারতীয় মহিলা এরোপ্লেন চালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আমরা শ্রীমতী সুষমা দেবীর এই উদ্যমে অন্তরের সহিত উৎসাহ দান করি। তখনকার বাংলার মেয়েদের এই নব প্রয়াস ও আত্মবিকাশের বিচিত্র অভিযান সত্যই আশা ও আনন্দের কথা।[৯৫] পত্রিকাটি আরো জানিয়েছে — ডাঃ কুমারী মৈত্রেয়ী এম. বি. চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের হাউজ সার্জ্জন। জর্ম্মনীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করে তিনি কয়েকদিন হল কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। ইনি শিশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করেছিলেন। কবিরাজী চিকিৎসাতেও মহিলাগণ আত্মনিয়োগ করেন। নদীয়ার অন্তর্গত শান্তিপুরে শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। এমনকি তিনি ঔষধের কারখানা পর্যন্ত খুলেছিলেন। বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্বের সুভাস চতুর্দ্দিক থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। স্বর্গীয় কমলানাথ দাশগুপ্ত বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী মৃণাল দাশগুপ্ত ১৯৩২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ . পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি রিসার্চের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসিক ৭৫্ টাকা হিসাবে বৃত্তি পেতেন এবং ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত তাতে নিযুক্ত থাকেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিত মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তখন পর্যন্ত আর কোন মহিলা এই পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি।[৯৬]

কুমারী কমলা বসু ফরিদপুরের পরলোক গত খ্রীষ্টান মিশনারি মথুরানাথ বসু মহাশয়ের কন্যা। ইনি বেথুন কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন। তিনি প্রথমে বাংলাদেশে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সন্তোষ জনক কাজ করার জন্য সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে সম্মানপত্র লাভ করেন। কিছু দিন আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশেও শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে কুমারী বসু দিল্লী মর্ডান হাইস্কুলের অধ্যক্ষাপদে অধিষ্ঠিতা হন। ইনি দিল্লীর বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও যুক্ত ছিলেন। কুমারীকে ভারত সরকার গত মহাযুদ্ধের সময়

যুদ্ধ সম্পর্কিত বহু জনমঙ্গলমূলক কাজ করার জন্য একটি পদক দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন।[৯৭]

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই কৃতী মহিলাগণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। 'প্রবাসী পত্রিকা' কয়েকজন কৃতী মহিলার সংবাদ দেন । কুমারী বাণী চট্টোপাধ্যায় ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উদ্ভিদ বিদ্যায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে 'সারদা প্রসাদ পুরস্কার' লাভ করেছিলেন । শ্রীমতি বাণী এই পরীক্ষায় সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে পারদর্শিতা অনুসারে একাদশ স্থান অধিকার করেন ।[৯৮]

নারী জাগরণের জোয়ার বইতে শুরু করেছিল। ব্যাপক হারে না হলেও নারীব বন্ধন মুক্তির চেষ্টা ও আগ্রহ নারী সমাজ উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। শিক্ষার ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব আরো দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বহু নারী সামনের দরজায় এসে দাড়িয়েছিলেন । বন্দী জীবনের কষ্ট থেকে মুক্তির আশা তাদের মধ্যে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে দেখা যায়। কুমারী সুজাতা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. উপাধি লাভ করে তিনি স্যার মাইকেল স্যাডলারের শিক্ষাধীনে দুই বৎসর বিলাতের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে দেশে ফিরে এসে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার জন্য একটি স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাপ্রসূত প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তা অনুমোদিত হওয়ায় শ্রীমতী সুষমা লীড্সের মাষ্টার অব এডুকেশন (M.Ed.) উপাধি লাভ করেন। এ সম্পর্কে প্রবাসী পত্রিকার মন্তব্য— "শিক্ষাদান বিদ্যায় তাহার বিশেষ পারদর্শিতা সূচিত হইতেছে ।"[৯৯]

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে ক্রমশঃই সাহস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 'প্রবাসী পত্রিকা' আরো জানাচ্ছে — বেথুন কলেজের মহিলা অধ্যক্ষা শ্রীমতী রাজকুমারী দাসের নেতৃত্বে একটি মহিলা ডেপুটেশন মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাত করেন । তাঁরা নিবেদন করেন যে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা হোক । তাঁরা বলেন যে ১০ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে একত্রে শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করা হোক । তাঁরা আরও প্রার্থনা করেন যে, মেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করা প্রয়োজন । মন্ত্রী মহাশয়

মামুলি প্রথা অনুযায়ী বলেন, "এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগ যাহা হয় করিবেন।" তৎপরে ডেপুটেশন প্রার্থনা করেন যে, মিউনিসিপ্যালিটিতে তাঁহাদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হউক। উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাংলার সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা সমান নহে। ঐজন্য প্রার্থিত প্রকারের কোন নিয়ম হইতে পারে না। তবে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে নারীদিগকে ভোটাধিকার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।[১০০] 'প্রবাসী' আরো মন্তব্য করেন — কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশা অধিকারী সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ইনি অন্যান্য পরীক্ষাতেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় পরলোকগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা বসুও ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।[১০১] বাংলাদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে বহু মহিলার শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্যের সংবাদ বের হতে থাকে। শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দত্ত সিলেটের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই ইনি বিবাহিতা হয়েছিলেন এবং গৃহছাত্রীরূপে বাড়ীতেই অধ্যয়ন করে বি. এ. পরীক্ষা দেন। শ্রীমতী সুবর্ণলতা পুরকায়স্থ ইনি কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের জননেতা স্বর্গীয় কামিনী কুমার দাস মহাশয়ের দুহিতা। ইনি ডায়োসিসান কলেজ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বিবাহের পরই তাঁর ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। কুমিল্লার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা কুমারী রেণু দাসগুপ্ত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে ইনি চিরদিনই গৃহছাত্রী। কোনদিনই স্কুলে বা কলেজে অধ্যয়ন করেননি।[১০২]

কুমারী উমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে দুটি পদক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. সি. পড়বার জন্য বৃত্তি এবং এক্সপেরিমেন্টাল সাইকলজি পড়বার জন্য বিশেষ বৃত্তি পেয়েছিলেন।[১০৩]

শ্রীমতী হিরণপ্রভা দাসগুপ্তার জন্মস্থান রংপুর-এর কাকিনা গ্রামে। পিতার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হওয়ায় ইনি বাড়িতেই শিক্ষা আরম্ভ করেন। এভাবে

গৃহছাত্রীরূপে বাড়ীতে অধ্যয়ন করে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রমান্বয়ে প্রবেশিকা ও আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আই. এ. পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিংশ স্থান অধিকার করেন। পরে বিবাহের পরও তিঁনি পাঠ পরিত্যাগ না করে বেথুন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ করেছিলেন।[১০৪]

বিদেশেও বাঙ্গালী মহিলাগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করছিলেন। শ্রীযুক্তা শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ শিল্পী ও কবি শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। এই মহিলা বিদেশে নানা বিষয়ে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বাঙ্গালী নারী সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। সাময়িক পত্রিকাতেও তাঁর অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি নিউইয়র্ক, লন্ডন ও এডিনবরার সাহিত্য পরিষদের সভ্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রদেশের গল্প নির্বাচন সমিতির তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্যা ও বিচারকছিলেন। এককালে তিনি টেকসাস্ প্রদেশের ফোর্টওয়ার্থ স্কুলের অন্যতম পরীক্ষকও ছিলেন। 'জয়শ্রী' বলেছে—"বাঙ্গালী মহিলার বিদেশে এই কৃতিত্বে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।"[১০৫]

ইউরোপে অপর একটি বাঙ্গালী বালিকার কৃতিত্বের খবরেও বাঙ্গালি গর্ববোধ করতে পারে। ইনি কলিকাতা ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার নন্দী মহাশয়ের কন্যা। গত ১৯৩১ সালের প্যারিস ইন্টার ন্যাশনাল কলোনিয়াল একজিবিশন উপলক্ষে যখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর কন্যা কুমারী অমলা (অপরাজিতা দেবী) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় একজিবিশনের উৎসব বিভাগীয় বিরাট মন্ডপে বিভিন্ন দেশের যে সব নৃত্যকলা প্রদর্শিত হয়েছিল তাতে কুমারী অমলা 'প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা' দেখিয়ে ইউরোপীয় দর্শকগণকে মুগ্ধ করেছিলেন।

বিদেশে বঙ্গনারীর কৃতিত্বের খ্যাতি আরো শোনা যায়। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা সেই সংবাদ দিয়ে লিখেছেন—ইতিপূর্বে বাঙলা ভাষায় কথা সাহিত্য রচনা করে ও উৎকৃষ্ট কথাসাহিত্য রচয়িত্রী বলে শ্রীমতী সীতা দেবী ও শান্তাদেবী যুরোপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বর্তমানে শ্রীমতী সুনীতি দেবীর গল্পের আদরও বিদেশে হচ্ছিল। ঐ সময় 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় সুনীতি দেবীর 'পাষাণী' নামে লেখা গল্পের আদর ইউরোপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'বঙ্গবাণী'র জার্ম্মানি পাঠকেরা অনুমতি নিয়ে

জার্মানি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন এবং উহা বিদেশীয় 'সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছিল। গল্পটির কাব্যশিল্পের প্রশংসা করে জার্মানি প্রকাশক যা লিখেছেন তার একটি ছত্র এই —

" Your touching story is of great psychological delicacy and you succeed in a masterly manner in gradually revealing the highly surprising truth that underlies the whole "[১০৬]

মহিলাগণ জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ান, আবার সাহিত্য ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হন । ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণকামিনী দাসীর ৩২ পৃষ্ঠার কবিতার বই 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশ পায়। সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতি বৃদ্ধি পায়। ১৯১০ সাল পর্যন্ত মহিলারচিত বই এর সংখ্যা ৪৪১৮। উনিশশতকের শেষার্ধে বহু শক্তিমতী মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮- ১৯২৪), মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯৩০), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), কুসুমকুমারী দেবী (দাশ), (১৮৭৫ - ১৯৪৮), অনুরূপা দেবী (১৮৮২ - ১৯৫৮), অম্বুজা সুন্দরী দাসগুপ্তা (১৮৭০ - ১৯৪৬), মৃণালিনী সেন (১৮৭৯ - ১৯৭২), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭ - ১৯৩৯), সরোজ কুমারী দেবী (১৮৭৫ - ১৯২৬), প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১ - ১৯৩৫), প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৫২ - ?), শরৎকুমারী দেবী (১৮৬১ - ১৯৪১), সৌদামিনী দেবী (? -১৮৭৪), রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯ - ?), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭ - ?) ও আরো অনেকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ।

১৮৫৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে বহুমহিলা বি. এ. এম. এ. পাশ করেন এবং পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন । ১৮৬৯ সালে তরু দত্ত ও অরু দত্ত পিতামাতার সহিত ইউরোপ যান এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজীতে একশতটি ফরাসী কবিতা অনুবাদ করেন ।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা কেবল শুরু হয়েছে, তেমন প্রসার লাভ করেনি, সেই সময় অজস্র বাধানিষেধ ও বহুবিধ সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে শুধু প্রবন্ধ, গল্প

লিখেই মহিলাগণ ক্ষান্ত থাকেননি, সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার ভারও নিজেদের স্কন্ধে নিয়েছেন সেটা ঐসময়ের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। উনবিংশ শতকে মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রপত্রিকার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় দুঃসাধ্য। আমরা এ পর্যন্ত বারোখানির সন্ধান পেয়েছি। ঐ পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উল্লিখিত হল।

বাংলাদেশে মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র হল বঙ্গমহিলা।

'বঙ্গমহিলা' : এখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র। সম্পাদিকা ডবলিউ, সি. ব্যানার্জ্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়।

'অনাথিনী' : মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা। এখানি মাসিক পত্রিকা। ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসে (ইংরাজী জুলাই ১৮৭৫) থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় ধুলিয়ান থেকে প্রকাশ পায়।

'জয়শ্রী' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৮ সংখ্যায় আমরা দেখতে পাই যে ১২৮০ সালে শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী সম্পাদিত 'বিনোদনী' প্রথম মহিলা পরিচালিত পত্রিকা। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ নসীপুরে অবস্থান কালে নবীনচন্দ্র 'ভুবনমোহিনী দেবী' এই ছদ্মনামে 'বিনোদিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সুতরাং 'বিনোদিনী' মহিলা সম্পাদিত একথা বলা যাবে না। নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে একথা স্বীকার করেছেন।

এছাড়া উনবিংশ শতকে আরো কয়েকখানি পত্রিকা মহিলাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। যা 'জয়শ্রী' পত্রিকার নজর এড়িয়ে গেছে।

'হিন্দুললনা' নামে পাক্ষিক পত্রিকাখানি ১২৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮) বারাকপুর নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানি দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা। তবে পত্রিকাখানি সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

'ভারতী' এই পত্রিকাখানি ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে (ইংরাজীর জুলাই ১৮৭৭) প্রথমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় দীর্ঘ সাত বৎসর চলার পর ১২৯১ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। ৮ম বর্ষ হতে ৫০শ বর্ষ পর্যন্ত এই পত্রিকাখানির সম্পাদনার কাজ করেন স্বর্ণকুমারীদেবী ও

তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী । কিন্তু ১২৯১ বঙ্গাব্দে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকার পরিচালন কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র ভার গ্রহণ করে অকালমৃত্যুর হাত থেকে একে রক্ষা করেন । কিরূপ যোগ্যতার সহিত পত্রিকাখানি সম্পাদনা করেছেন, ঐ সময়কার 'ভারতী'র প্রতি পাতায় তার প্রমাণ উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত হয়েছে । মাসিক পত্রিকা পরিচালনায় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যে একজন উপযুক্ত পুরুষ সম্পাদক অপেক্ষা কোন অংশেই অযোগ্য ছিলেন না, — 'ভারতী' সম্পাদিকার আসনে তিনি একাধিকবার অধিষ্ঠিতা থেকে তার প্রমাণ দেখিয়েছেন ।

১২৯২ বঙ্গাব্দে (এপ্রিল ১৮৮৫) 'বালক' নামে একখানি মাসিকপত্রিকা শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল । দুই বৎসর বাদে 'বালক' 'ভারতী'র সহিত মিলিত হয় ।

ইতিমধ্যে মহিলাদের সম্পাদনায় আরো কয়েকখানি সাময়িক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । তবে এগুলি আর্থিক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক দীর্ঘদিন চলেনি ।

কুমারী কামিনী শীলের সম্পাদনায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের মার্চ মাসে (জানুয়ারী ১৮৮১) 'খৃষ্টীয় মহিলা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । এতে কেবল স্ত্রীলোকগণই লিখতেন । বহু সুশিক্ষিতা মহিলাই এতে নানাবিধ গদ্য-পদ্য প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন ।

'বঙ্গবাসিনী' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । বঙ্গমহিলাগণই এর সম্পাদনা করতেন । ১২৯০ বঙ্গাব্দের শেষভাগে (ইংরাজীর ১৮৮৩) কলকাতার টালা অঞ্চল থেকেপ্রকাশিত হত । স্ত্রীলোকের হিতোদ্দেশ্যেই এর প্রকাশ ঘটেছিল । সম্ভবতঃ এর পরমায়ু নানা কারণে দীর্ঘ হবার সুযোগ পায়নি ।

'সোহাগিনী' নামে আর একখানি পত্রিকা ১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে (এপ্রিল ১৮৮৪) কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

'বিরহিনী' ১২৯৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (ইংরাজী অক্টোবর ১৮৮৮) সুশীলবালা দেবীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এই মাসিকখানি প্রকাশিত হয় । এটা প্রধানতঃ গল্পের কাগজ । ১৩০৪ বঙ্গাব্দে তৎকালীন প্রসিদ্ধ মহিলা সম্পাদিত মাসিক

পত্রিকা 'অন্তঃপুর' শ্রীমতী বনলতা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। ১৩০৪ থেকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত যোগ্যতার সহিত বনলতা দেবী এর সম্পাদনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩০৭ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরানী 'অন্তঃপুরে'র সম্পাদিকা ছিলেন। এর পর পত্রিকাখানির ভার গ্রহণ করেন শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র। ১৩১১ বঙ্গাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় 'অন্তঃপুর' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে কাগজখানিকে তিনি বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'পরিচারিকা'র জন্ম ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। শ্রীমতী মোহিনীদেবী এর সম্পাদিকা হন। মোহিনীদেবীর অকাল মৃত্যু হলে ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'পরিচারিকা'র ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী সুচারু দেবী। 'পুণ্য' এই মাসিকখানির জন্ম ১৩০৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে (ইংরাজী অক্টোবর ১৮৯৭)। এর সম্পাদিকা ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। তাঁর সম্পাদনায় ৩য় বর্ষ পর্যন্ত পত্রিকাখানি চলেছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে 'ভারতমহিলা' নামে একখানি মাসিকপত্রিকা বিশিষ্টভাবে মহিলাদেরই জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতমহিলা'র সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র (বসু) সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' নামক সুন্দর একখানি মাসিক পত্রিকার উদয় দেখা যায়। 'সুপ্রভাত' কুমারী কুমুদিনী মিত্রের তত্ত্বাবধানে নয় বৎসর কাল জীবিত ছিল। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'মাহিষ্যমহিলা' শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর 'মাহিষ্যমহিলা' জীবিত ছিল।

'জাহ্নবী' পত্রিকাখানি ১৩১৪-১৩১৬ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সম্পাদনায় চলেছিল। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে শ্রীমতী নিরপমা দেবী বিলুপ্ত 'পরিচারিকা'র নব পর্য্যায় প্রকাশ করেন। ১৩২৩ থেকে ১৩৩১ পর্যন্ত নিরুপমা দেবী বেশ সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি পরিচালনা করেছিলেন। শ্রীমতী ফুল্লনলিনীর সম্পাদনায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'নব্যভারত' পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়।

'মাতৃমন্দির' পত্রিকাখানির আগমন ঘটে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সুরবালা দত্ত এই সচিত্র মাসিকখানির সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীমতী সুশীলা নন্দীও 'মাতৃমন্দিরে'র সম্পাদনার দায়িত্বে কিছুদিন ছিলেন। ১৩৩২ থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাখানি

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও লতিকা বসুর সম্পাদনায় চলছিল। তারপর ১৩৩৫ থেকে শ্রীমতী হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে পারিচালিত হচ্ছিল। আরো বহু পত্রপত্রিকা মহিলাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যত্র তার আলোচনা আছে বলে এখানে তাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কর্মক্ষেত্রে সংগ্রামী নারীজীবনের ইত্তিবৃত্তের উল্লেখ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যে পুরুষজাতি বহুযুগ ধরে নারীর উপর নির্যাতন চালিয়েছে, সেই পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নারী স্বাধীনতা আদায় করা যাবে না। সমাজে নারীর স্থান সম্মানজনক নয় বলে কেবলমাত্র পুরুষদের দায়ী করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চিরকাল ছিল ও ভবিষ্যতেও থাকবে। নারীর নিজের দুর্বলতাই তার বর্তমান অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী। এই দুর্বলতা তাদের নিজেদেরই দূর করতে হবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার মহিলারা অল্প চেষ্টাতেই লাভ করেছেন। নারীর পক্ষ সমর্থনকারী বহু পুরুষ আছেন, তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অধিকার আদায় করতে হয়। দাবী করে অধিকার লাভ করা যায় না। নারী নিজেই এতদিন নিজের যোগ্যতা ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন কাজে নারী যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করবেন, সমাজে, রাষ্ট্রে ও পরিবারে তার স্থান ততই সুনির্দিষ্ট হবে। শুধু পুরুষের উপর অভিযোগ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে কেউ তাদের অধিকার দান করবেন না। সুতরাং মাভৈঃ বলে সামনে এগিয়ে এস। প্রতিজ্ঞা থাকলে তা বাস্তবে পরিণত হতে অসুবিধা দেখা দেয় না।

সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

সাহিত্যে নারীর অনুপ্রবেশ কখন এবং কোন্ সময় থেকে তার সঠিক দিনক্ষণ নির্দ্ধারণ করা না গেলেও একথা স্পষ্ট বলা যায় যে মুসলমান আমলে রচিত সাহিত্যের মধ্যেও এমন বহু মহিলা আছেন যাদের রচিত পদাবলী বা ছড়াগান, রূপকথা, উপকথা হয়ত আজও বিদ্যমান। সেইসব সাহিত্যের মধ্যে কোনটি হিন্দুনারীর বা কোনটি মুসলমান নারীর রচিত তা বলা যাবে না। কেননা তখন

হিন্দু-মুসলমান কোন নারীরই প্রকাশ্যে নাম জাহির করার মনোবৃত্তি ছিল না ।আর হিন্দু-মুসলমান আলাদা করে চিহ্নিত করার মত সংকীর্ণতা সমাজে ছিল না বলে হয়ত হিন্দুমুসলমান এরূপ ভাগ বাটোয়ারা হয়নি। তাই কোনটি হিন্দু নারীর, কোনটি মুস্‌লেম নারীর তা বলা শক্ত ।

উনবিংশ শতকের প্রথমদিকের কয়েকজন নারী লেখিকার নাম ও তাদের রচিত ছড়া বা গান এখনও পাওয়া যায় । আনন্দময়ী দেবী, লক্ষ্মী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, সুন্দরী দেবী, যজ্ঞেশ্বরী দেবী, দ্রবময়ী দেবী প্রভৃতির নাম এই সময়ের সাহিত্যে পাই । এই যুগের নারী কবিদের মধ্যে আনন্দময়ী দেবী সবচেয়ে বিদুষী বলে খ্যাতা ছিলেন । উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে বহু নীচজাতীয়া নারী ও বৈষ্ণবীদের ছড়াবেঁধে গান গাওয়ার প্রবণতা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলার সমাজজীবনে চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল । যার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে। সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ। সুতরাং এই সময়ের সাহিত্যে মিথ্যাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির ছাপ ছিল স্পষ্ট । সাহিত্য বলতে এইসময় কবির লড়াই, তরজা, পাঁচালী, টপ্পাগান প্রভৃতি যাতে শ্লীলতার কোন বালাই ছিল না । উনিশশতকের প্রথমদিকে বাংলাসাহিত্যে কোন ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় না । কারণ সাহিত্যে অশ্লীলতা এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, কোন ভদ্রমহিলার পক্ষে তখন বাংলারই বা বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করা ছিল ভয়ের ব্যাপার। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকেই মহিলাগণ সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। সে যুগের সাহিত্যচর্চা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল কবিতায়। দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রভৃতির মত গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ বিষয়ও পদ্যে লেখা হত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ভারতবর্ষে গদ্য সাহিত্যের প্রচলন শুরু হয় । এর আগে বাংলাভাষায় পত্রাদি, দলিল দস্তাবেজ রচনাতেই গদ্যের ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ । উনিশ শতকের প্রথমদিকে শুরু হয়ে চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই একটি শক্তিশালী বাংলা গদ্যশৈলী গড়ে উঠেছিল । সেই সময়ের কাব্য সাহিত্যের প্রধান উপকরণ ছিল দেবদেবীর গুণকীর্তন ও দৈবনির্ভরতা। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেও সুরুচি ও নীতিজ্ঞান ফিরে আসে। দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে স্থান পায়। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের জোয়ারে আমাদের দেশে নারীশিক্ষা,

নারীজাগরণ শুরু হয় এবং তার ফলে কিছু মহিলা প্রকাশ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তখন থেকেই নারী প্রগতির জোয়ার বইতে শুরু করে। মহিলাগণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং মহিলাদের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে নিজেরাই তৎপর হয়ে উঠেন। মহিলা-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা হল 'বঙ্গমহিলা'। শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮৭০) প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গমহিলা'য় বামাগণের রচিত অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। জনৈকা মহিলা রচিত এরূপ উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা 'আশা' —

"আজিকার চেয়ে কালি আসিবে উত্তম।
এইমত ভাবি মুগ্ধমানব অধম।।
জানে না সে কল্য কাল ধরি কোন বেশ।
করিবে তাহার সেই আশাতরু শেষ।।
কি ভাব ধরিয়া তায় দিবে জ্ঞানদান।
কিরূপে করিবে তার আশার বিধান।।
বিষম আশার আশে মন বেগবান।
জানে না কি ভাবে তার হবে সমাধান।।[১০৭]

এখানে লেখিকা আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান নারীচিত্তের ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। আর একটি বিশিষ্ট কবিতা 'বঙ্গনারী'। কবিতাটিতে লেখিকা পুরোপুরি আশান্বিত হয়ে সাহস সঞ্চয় করে, ভগ্নিগণকে পুরানো দিনের অবসাদ, অত্যাচার ও নির্যাতনের গ্লানি থেকে গাত্রোত্থান করার আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ —

"জাগ ভগ্নীগণ কর অবধান,
ঐ ঘোর নিশা হল অবসান,
কেন আছ আঁখি করে নিমীলিত,
ঐ সুখতারা হয়েছে উদিত,
নিশ্চিন্ত হইয়া আছ কেমনে।
অজ্ঞান তামসী করিছে প্রয়াণ,
আলস্য ত্যজিয়া কর বিদ্যাগান,

কবি কুল পিক — কি মধুর শুনি,
করিতেছে দেখ কাকলির ধ্বনি,
জাগাতে ভারত নিবাসিগণে ।" [১০৮]

নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ শুরু হয়েছে, আশার আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে 'ভগ্নীগণ'কে তাই সম্বোধন করে বলছেন, ভগ্নিগণ, অজ্ঞান তমসা দূর হয়েছে, দুঃখের রাত্রিও শেষ । তোমরা আলস্য ত্যাগ করে বিদ্যাশিক্ষা লাভে অগ্রবর্তিনী হও ।

পরাধীন ভারতে ভারত মাতার দুঃখে ব্যথিত হৃদয় কবির অন্তর্বেদনায় বিষণ্নবদনা, সজলনয়না ভারতজননীর পবিত্র-নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল মুখকমলের শ্রীটি অপূর্ব ঃ—

"কে তুমি, সুন্দরী ! বিষণ্ন বদনে,
সুচিক্কণ তব সুন্দর তনু
ঢাকিয়াছে হায় যেন কাদম্বিনী,
প্রভাতে উদিত নবীন ভানু ।
কি পবিত্র জ্যোতিঃ নয়নে তোমার
বহিছে পবিত্র নয়ন-জল,
সুপবিত্র ভাতি ভাসিছে বদনে,
পবিত্র তোমার মুখ-কমল ।"[১০৯]

এই শ্রেণীর ভাবাবেগঋদ্ধ উদ্দীপনাময় কবিতাগুলিকে তথাকথিত বামারচনা বলে তুচ্ছ করার মত নয়। ভব-ভাষা ও ছন্দ প্রকাশে কোন ত্রুটি দেখা যাচ্ছে না। কবিতাটির মধ্যে। বরং দীর্ঘদিনের অবসাদ কাটিয়ে প্রথম প্রকাশ্য জড়তাহীন আত্মপ্রকাশের দীপ্তিতে কবিতাটি সমুজ্জ্বল, সুতরাং প্রশংসনীয়।

"গজগামিনী, মৃগনয়নী, মনোমোহিনী, ললনা ।
এলোকেশে, হীনবেশে, করিতেছে, ভাবনা ।।
যেন পদ্মিনী, হলে যামিনী, বিনে দ্যুমণি, মলিনা ।
কুমুদিনী, বিষাদিনী, অস্তগতে চন্দ্রমা ।।"[১১০]

গজগামিনী, মৃগনয়নী, মনোমোহিনী হয়েও সুযোগ ও শিক্ষার অভাবে রমণীকুল সমাজজীবনে পদদলিত হতে হতে হীন থেকে হীনতর পঙ্কে নিমজ্জিত

হয়েছে। সমাজে প্রচলিত সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মত কু-প্রথাগুলি যা ছিল নারীজীবনে অভিশাপস্বরূপ তা দূর হয়ে গিয়ে শিক্ষালাভের অধিকার পেয়ে মহিলাগণ বাস্তবক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে মোটেই দেরী করেনি। সতীদাহ আইন করে বন্ধ করা হল, বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য প্রবল আলোড়ন শুরু হল সমাজে, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও তুমুল প্রতিবাদ শুরু হয়। স্ত্রী-শিক্ষার রুদ্ধদ্বার খুলে যায়। শিক্ষালাভের ফলে মহিলারাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতির জন্য অনেক সভা ও সমিতি স্থাপন করেন।

(১) 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি সমিতি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্থাপন করেন। এতে উপাসনাসহ সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেয়া হত। স্ত্রী-সমাজের ধর্মোন্নতির জন্য এটি ১৮৬৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহিলাগণই এর পরিচালনা করতেন এবং বিভিন্ন জেলায় এর শাখা সংগঠন তৈরী করেছিলেন। শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায় বরিশাল ব্রাহ্মিকাসমাজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি সারগর্ভ উপদেশ দেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' তার প্রশংসা করে লেখেন — "ইহা যেমন সারগর্ভ, সেইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ। আমাদের রমণীগণ এরূপ সুন্দর উপদেশদানে সমর্থ ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে।"[১১১]

ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর প্রীতি, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, ঈশ্বরেতে প্রীতি, বিশ্বাস, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস, বিশ্বাস প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য, ধর্ম্মপুস্তক, বিবেক, পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ও চরিত্র নির্ম্মল করণ, আত্মোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উপদেশ দান করতেন।

(২) 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' ঃ নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতিই এই সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ৩য় বর্ষের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে — গত বর্ষে ৪১টির স্থানে এবৎসর ৫৫টি গ্রাম থেকে ২২৬ জন পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা দেন। উহার মধ্যে ১১৪ জন সধবা, ৮জন বিধবা এবং ১০৪ জন কুমারী। ৩৫ বৎসরের মহিলাও পরীক্ষা দিয়েছে। ২২২ জনকে পারিতোষিক দেওয়া হয়েছিল।[১১২] পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এই সমিতির যে তথ্য পাওয়া যায় তা এরূপ — গতবর্ষে

এই সভার অধীনে ৪৩৯ টি স্ত্রীলোক পরীক্ষা দিয়ে ৪২৪টি উত্তীর্ণা হয়েছিলেন। ৩০ বৎসর বয়স্কা সধবা ও বিধবা মহিলারা পরীক্ষার্থিনী হয়েছিলেন এবং চন্ডাল জাতির ২জন পরীক্ষা দেয়, ইহা বড়ই আশার কথা। সভার হস্তে গচ্ছিত অনেকগুলি বিশেষ বৃত্তি ও পুস্তক ছিল এবং সভার আয় ৬০৬ টাকা ৩ পয়সা হয়েছিল।[১১৩]

(৩) 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'র ৫ম বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা - ১৪৫; উত্তীর্ণ - ১৩৬; সধবা - ৫৩ ; বিধবা - ১২ এবং কুমারী - ৭১।[১১৪]

(৪)'ফরিদপুর সুহৃদসভা'র ২য় বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় — পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা — ২৭৫; উত্তীর্ণ ২০৪, বিশেষ পরীক্ষা দেয় - ২১, সধবা - ১৫২, বিধবা - ১২, কুমারী - ১১১। বয়স্কা সধবার বয়স - ৩২। কুমার, ছুতার নমঃশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মহিলাগণ উক্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।[১১৫]

(৫) মধ্যবাংলা সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ছিল ২৪ পরগণা জেলার উন্নতি সাধন ও স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা দান করা।[১১৬]

(৬) 'ময়মনসিংহ সম্মিলনী'-র দ্বিতীয়বর্ষের কার্য-বিবরণীতে বলা হয় যে এই সভায় ৪০২ জন পরীক্ষার্থিনী হন, তন্মধ্যে ২৬৯ জন পরীক্ষা দিয়ে ২৫৯ জন উত্তীর্ণ হন। এই সভার আয় প্রায় ৪০০ টাকা হয়েছিল। সভা দুই বৎসর মাত্র জন্মগ্রহণ করে যেরূপ কার্য করতে সক্ষম হয়েছিল তা বেশ সন্তোষজনক।[১১৭]

বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা এবং পশ্চিম ঢাকা হিতকারী সভার পক্ষ থেকে বামা শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষা পরিষদের সভাপতির কাছে সেই সময়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয় ঃ — (১) আবশ্যক স্থলে বালিকাদের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও কলেজ স্থাপন। (২) মেডিকেল কলেজে স্ত্রী-লোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। (৩) উচ্চশিক্ষার সহায়তার জন্য পুস্তকালয় স্থাপনে উৎসাহ দান। (৪) বাংলা শিক্ষার সুবিধার জন্য মাসিক ৭৫ টাকা ব্যয়ে ২০টি প্রথম শ্রেণীর এবং মাসিক ৫০ টাকা ব্যয়ে ৩০টি দ্বিতীয় শ্রেণীর আদর্শ সরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। (৫) বালিকা বিদ্যালয়ে কমপক্ষে অর্ধেক এবং আবশ্যক স্থলে তিন-চতুর্থাংশ সাহায্য সরকারকে দিতে হবে। (৬) বালিকা পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মাসিক ৫্

টাকা হারে বৃত্তি দিতে হবে । (৭) সার্কেল বালিকা পাঠশালা স্থাপন করতে হবে। (৮) সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যে অথবা স্থানীয় সমিতির সঙ্গে একযোগে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপন করতে হবে ।(৯) অন্তঃপুর শিক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে । (১০) স্কটল্যান্ডের প্রথানুযায়ী ডাকযোগে স্ত্রী-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে । (১১) উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে ।[১১৮]

(৭) 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা' ঃ এটি ১৮৬৩ সালে স্থাপিত হয় । এর মোট তিনটি বিভাগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা ছিল অন্যতম প্রধান বিষয় । অল্প বয়সে মেয়েরা বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবার ফলে বেশীদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারত না । সেই কারণে অন্তঃপুরে শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা করার সুযোগ মহিলাদের দেওয়া হত ।এর ফলে মেয়েদের স্কুলে যেতে হত না । বছরে দুইবার পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল এবং পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও ছিল ।উপযুক্ত পাঠক্রম প্রবর্তন এবং শিক্ষয়িত্রীদেরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল । শুধু কেবলমাত্র কলকাতাতেই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন ছিল ।ঢাকা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান । সেখানকার ১২৮০ সালের পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ —

১ ম বার্ষিক শ্রেণীতে	৯ জনের মধ্যে	৬ জন পাশ করে ।	
২য়	· ·	৭ · ·	৬ · · ·
৩য়	· ·	৬ · ·	৫ · · ·
৪র্থ	· ·	২ · ·	২ · · ·
৫ম	· ·	১ · ·	১ · · ·

সাধারণ বিষয়ে শ্রেণীতে ১ জনের মধ্যে ১ জন পাশ করে ।[১১৯] চোরা বাগান বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও এইসময় অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিবাহিতা মহিলাগণের শিক্ষার জন্যই অন্তঃপুর মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং প্রতিবৎসর পরীক্ষা গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

(৮) বরিশাল ফিমেল এডুকেশন কমিটির নিকট ১২৮০ সালে ১৩২ জন হিন্দুমহিলা পরীক্ষা দেবার জন্য আবেদন করেন । এর মধ্যে একজন ছিলেন

ফরিদপুরের ও অপর আর একজন ছিলেন কুমিল্লার ।[১২০]

মহিলাদের উন্নতি এবং তাদের বিভিন্ন লেখা প্রকাশের জন্য এই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মহিলাগণের উন্নতি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও তাদের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮৫৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' — রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায়, ১৮৬৩ সালে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' — উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায়, ১৮৬৯ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় 'অবলাবান্ধব' সহ আরো বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । তার মধ্যে 'জ্যোতিরিঙ্গণ', 'নারীশিক্ষা,' 'বালরঞ্জিকা', 'হেমলতা', 'বঙ্গমহিলা', ও 'পরিচারিকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১২১] এগুলির মধ্যে বামাবোধিনীর ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য ।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকেই সাহিত্যচর্চা ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে মহিলাগণ পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন এবং বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেন ।এতে মহিলাগণ স্বাধীনভাবে তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও পারিবারিক নানা কু-প্রথার বিরুদ্ধে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন ।নারীও মানুষ ।তাদেরও স্বাধীন ইচ্ছা ও মতামত আছে ।চিরদিন পুরুষের দাসত্ব ও সমাজের দাসত্বের জন্য তাদের জন্ম নয় । দেশের জন্য, জাতির জন্য, নিজেদের জন্য তাদেরও করবার মত কাজ আছে ।নিশ্চেষ্ট হয়ে অলস জীবন যাপনের দিন আর নেই । ঐ সময়ের সমাজে ও পরিবারে মহিলাদের দুরাবস্থার দিকে পুরুষ সমাজের দৃষ্টিও নিবদ্ধ হয় ।তারাও উপলব্ধি করতে শুরু করছিলেন যে মহিলাদের অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে পুরুষ তার আপন উন্নতিই ব্যহত করছে এতদিন । সময় ও সুযোগ এসেছে । বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে কালনিদ্রার অবসান সর্বাগ্রে প্রয়োজন । সুতরাং পুরুষজাতি তাদের ভুল সংশোধনার্থে নিজেরাই মহিলাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন । পুরুষের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া নারী জাতির উত্থান সম্ভব নয়, একথা মহিলারাও উপলব্ধি করেছিলেন ।উভয়ের সমান উপলব্ধি ও চেষ্টায় মহিলারা শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই এখন অংশ গ্রহণে সক্রিয় ।

১২৯৩ সালের ৩০শে চৈত্র কলকাতার সিটি কলেজে একটি সভায় পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রলাল রায়, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, পন্ডিত অন্নদাপ্রসাদ

সরস্বতী, জয়কৃষ্ণ মিত্র, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, কামিনী সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্যামলধন মিত্র ও আরো অনেকে তথায় মিলিত হন । শিল্পকার্য, উদ্যান তৈরীর কৌশল, গার্হস্থ্য, রসায়ন, রন্ধন এবং বিশ্বসেবায় স্ত্রীজীবন সমর্পণ সম্পর্কে ধারাবাহিক লেখা বার করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয় । সেখানে উপস্থিত লেখক লেখিকাগণ উপরোক্ত বিষয়গুলির এক একটি লেখার দায়িত্ব নেন ।

আলোচনা সূচির দ্বিতীয় বিষয় ছিল 'বামাবোধিনী'র ২৫বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা । দুটি ভাগে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল। ১ম ভাগের রচনার বিষয় ছিল ঃ —

১) আদর্শ বঙ্গ রমণী,

২) ভারতে দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হতে পারে ;

৩) স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার ;

৪) বর্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও এর উন্নতি সাধনের উপায় ;

৫) বিশ্ব সেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা ;

দ্বিতীয় ভাগের বিষয় ঃ -

১) গৃহচিকিৎসা অর্থাৎ গাছগাছড়া ও টোট্‌কা ওষুধে পীড়া আরোগ্যের কারণ ;

২) প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য প্রণালী ও তার উন্নতির উপায় ;

৩) বাঙ্গালী স্ত্রী-পরিচ্ছদ ও এর উৎকর্ষ সাধন,

৪) স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত,

৫) নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়।
প্রতিযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সেখানে গৃহীত হয় ।

১) প্রথম বিভাগে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সেখানে যোগ দিতে পারবে ।

২) দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিযোগিতা শুধু মহিলাদের জন্য ।

৩) প্রথম বিভাগের পারিতোষিক মূল্য ৪০্ টাকা, আর দ্বিতীয় বিভাগের মূল্য ২০্ টাকা ।

৪) ১২৯৪ সনের বৈশাখ মাস থেকে রচনা জমা দেবার সময় ধার্য করা হয়।[১২২]

প্রথম শ্রেণীর রচনায় পুরুষের সঙ্গে যোগদানকারী মহিলাগণের নাম ও রচনার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে এরূপ ঃ—

১) কুমুদিনী রায়, মানকুমারী বসু
২) কুমুদিনী রায়, শৈলজাকুমারী দেবী ও সুষমাসুন্দরী দাসী।
৩) কুমুদিনী রায় ও মানকুমারী বসু।
৪) কুমুদিনী রায়, শৈলজাসুন্দরী দেবী ও সুষমা সুন্দরী দাসী।
৫) বসন্তকুমারী ও কুমুদিনী রায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় যোগদানকারী মহিলাগণ ঃ—

১) কুমুদিনী রায়, বরদাসুন্দরী দেবী, সুষমাসুন্দরী দাসী, শৈলজাকুমারী দেবী।
২) কুমুদিনী রায় ও শৈলজাকুমারী দেবী
৩) কুমুদিনী রায়
৪) কুমুদিনী রায়, মানকুমারী বসু, শৈলজাকুমারী দেবী ও সুষমা সুন্দরী দাসী।
৫) কুমুদিনী রায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর রচনার প্রতিযোগিতায় কুমুদিনী রায়ের নাম পাওয়া যায়।[১২৩]

মহিলাদের উন্নতি বিষয়ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূগোল, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিকথা, গৃহকাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'তে আলোচিত হতে থাকে। এইসময় থেকেই মহিলারা সাহিত্যের বিভিন্নক্ষেত্রে পদযাত্রা শুরু করেন। এমনকি মহিলাগণ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনেও দক্ষতার পরিচয় দেন। মহিলাগণ পায়ের তলায় একটু একটু করে মাটির স্পর্শ পেতে শুরু করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পত্র-পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আর তার উল্লেখ করা অবান্তর।

মানুষে মানুষে বিভেদ বৈষম্য, নর ও নারীতে বৈষম্য, ইহা মানব জাতিকে ধ্বংসের দিকে, অধঃপতনের দিকেই টেনে নিয়েছে। বহু প্রাচীন যে আর্যজাতি তারা

কিন্তু বৈষম্য ও বিভেদের পথে না গিয়ে নিজেদের উদার ক্রোড়ে অনার্য দ্রাবীড়িয়ান, শক, হুন সকলকেই স্থান দিয়েছিলেন । যখন থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব শুরু হয়, ধীরে ধীরে সাম্যের আদর্শ দেশ থেকে লোপ পেতে শুরু করে । ধার্মিকেরা সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ না হয়ে বনচারী হয়ে জীবন অতিবাহিত করাকেই শ্রেয় বলে মনে করলেন । তখন থেকেই সমাজ-সংসারে অধর্মের কালো ছায়া আত্মপ্রকাশ করতে থাকে । গার্হস্থ্য শাস্ত্রে মানুষকে পশু করে রাখা স্থির হয় । ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদের সংসারের ক্ষুদ্রগন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে । তাঁরা বনচারী পূর্বপুরুষদের ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শ বিশ্রুত হয়ে, ধর্মহীন কর্মজগতের আদর্শদ্বারা নিজেদের জ্ঞান দৃষ্টিকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলে । ফলে মিথ্যাচার সাধারণ মানুষের জীবন বোধকে গ্রাস করে । মানুষ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অধর্ম, অসত্য ও মিথ্যার রাজ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে । এইভাবে মানুষ অধর্মের রাজ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে । নিজেদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যকে জীবনের ব্রত মনে করতে থাকে । তার ফলে নানাবিধ কু-সংস্কার এসে সমাজে প্রবেশ করে । এইভাবে মানুষ নিজেদের আপন সত্তাকে হীন থেকে হীনতর করে তুলেছিল । মানবজাতি সমাজ জীবন থেকে রমণীদেরও আলাদা করে রাখে । জ্ঞানাভিমানী শাস্ত্রবিদ্‌গণ শূদ্র ও রমণীদের একই পর্যায়ভুক্ত করে জ্ঞানলাভের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন । ব্রাহ্মণ ও ভদ্র সমাজ যতই উন্নত আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল, সমাজের নিম্নস্তরে তা তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল । এই অসাম্যই আমদের জাতির জীবনে মৃত্যু ডেকে এনেছে । সমস্ত মানবের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান আছে। সেই মানবরূপী ভগবানের অপমান করে জাগরণের চেষ্টা বালুকা-মন্দিরের ন্যায়ই ছিল বিফল প্রয়াস । শূদ্র ও রমণীজাতির উন্নতির সকলচেষ্টা রুদ্ধ করতে গিয়েই অসংখ্য কু-সংস্কারের জাল রচনা করতে হয়েছিল । এই জাল ছিন্ন করতে না পারলে রমণী, শূদ্র ও পতিতদের উদ্ধারের আশা নিরাশামাত্র । ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায় অনুভব করছিলেন, যে কুসংস্কারের জাল নিজেরা একদিন রচনা করছিলেন, আজ সেই জালে তারাই জড়িয়ে পড়ছেন । অপরকে দাসত্বের হীন কারাগারে নিক্ষেপ করে নিজেদের মুক্তি অসম্ভব । ভদ্রলোক শ্রেণী অনুভব করতে শুরু করছেন যে, যাঁরা শরীরের রক্ত জল করে তাদের সুখ বিধান করছেন, তাদের দূরে সরিয়ে না রেখে,

তাদের ভাই বলে, মানুষ বলে কাছে টেনে আনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রেমের দ্বারা তাদের হৃদয় জয় করতে হবে, স্বার্থের খাতিরে নয়। নেপোলিয়নের শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর সেই শক্তি বিশ্বমানবের প্রতিকূলে মানবধর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল বলেই তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখেছেন ফরাসী বিপ্লব। আভিজাত্যের বন্ধন কাটিয়ে বিশ্বমানব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যদিও আমাদের ভারতীয় অবস্থা ছিল অন্যরূপ। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের জ্ঞানৈশ্বর্যে অতিরিক্ত গর্বিত হয়ে তাদের মতবাদকেই বিধাতার বাক্য বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু চিরকাল কাউকে দমিত রাখা যায় না। তাই আজ নারী ও দুঃস্থ জনসমাজ জাগ্রত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাই আজ নারী বুঝতে শিখেছে যে, সেও মানুষ তারও উদ্যম আছে, ভিতরে সুপ্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে, কর্ম করবার শক্তি আছে, তবে কেন অপরের গলগ্রহ হয়ে আলস্যে জীবন অতিবাহিত করবেন। তাই ভারতীয় রমণিগণ মাভৈঃ বলে জেগে উঠেছে। দেশের দুর্দিনে, জাতির দুর্দিনে, নারীজাতির উন্নতিকল্পে, যার যেমন শক্তি সেইটুকু প্রয়োগ করে দেশের সেবায়, জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে সঙ্কল্প নিয়েছে।

নারী জাগরণ শুরু হয়েছে। সমস্ত রকম বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে আজ নারী স্বমহিমায় সাহিত্য আসরে, কেবল সাহিত্য আসরই বা বলি কেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই দণ্ডায়মানা হয়ে আপন প্রতিভা প্রকাশে নিয়োজিতা। মানুষে মানুষে এই বৈষম্য কাটিয়ে মহিলাগণ প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্ত্রী শিক্ষা প্রকাশ্যভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে এবং পর্দার অন্তরালবর্তিনী মহিলাগণ সাহসে ভর করে প্রকাশ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'চিত্তবিলাসিনী' নারী রচিত প্রথম একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর লেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলাগণ নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন। এই সময় পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের জোয়ারে এবং ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে সাহিত্যে জীবনবাদ ফিরে আসে। মহিলাগণ অন্তঃপুরের বদ্ধজীবন থেকে বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হন, যেটা সে যুগে কম সাহসের পরিচয় নয়। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেও এ সময় নীতিজ্ঞান ও

সুরুচির প্রতিষ্ঠা হয়।

মহিলা পরিচালিত পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা'তে বঙ্গললনাগণের লিখিত কবিতা, প্রবন্ধ, স্ত্রী-শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্গীয় মহিলাগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও তার প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখা যায়। পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কিভাবে গৃহকে সুসজ্জিত ও সুখবাসরে পরিণত করা যায় তা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ পত্রিকার পাতায় স্থান পেতে থাকে। সে যুগের পুরুষ চিন্তানায়কগণও মহিলাদের উন্নতির জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। সে যুগের মেয়েদের যন্ত্রণার ইতিহাস এ যুগের এক মহিলা কবির রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, যায় কিছু অংশ ঃ

"আমিই সেই মেয়েটি
যে গত কোনো শতাব্দীতে
পাঁচ বছর বয়সে মালা দিল গঙ্গাযাত্রীর গলায়
কুলীন ব্রাহ্মণের তিনশ পঁয়ষট্টিতম স্ত্রীর অন্যতমা হয়ে
স্বামীর গরবে হয়েছি গরবিনী
একাদশীর দিন অবুঝ দশমী বালিকার তৃষ্ণায়
আটক ঘরের মাটি লেহন করতে করতে
প্রাণত্যাগ করেছি।
সন্তানের পর সন্তান জন্ম দিতে দিতে রক্ত শূন্যতায় মুখ থুবড়ে
পড়েছি সূতিকাগারে।
জ্বলে পুড়ে মরেছি সতীদাহে।
....
আমি প্রণাম জানাই সেই প্রথম আগুনকে
যার নাম বর্ণ-পরিচয়
সেই অগ্নিশুদ্ধ পরম্পরাকে
সেইসব পুরুষ রমণীকে
যারা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারের হাতলে

জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে
একজন্মেই আমাকে জন্মজন্মান্তরের
দরজা খুলে দিয়েছেন" ।[১২৪]

উনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে যাঁরা গীতিকবিতায় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁরা হলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় ও মানকুমারী বসু। এছাড়াও কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের বহুমহিলা গীতিকবিতা লিখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য কীর্তির পরিচয় বহন করতে না পারলেও তাদের লেখা 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল । এইসব কবিতার কোন কাব্যগুণ ছিল না বটে, কিন্তু গুপ্তকবি মহিলাদের উৎসাহ দেবার জন্য কবিতার অযোগ্য ছড়াও 'সংবাদপ্রভাকরে' ছাপতেন । উনিশশতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়নি, তখন একাধিক মহিলা অন্তঃপুরে পড়াশুনা করে গীতিকবিতা লিখবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু সাহিত্যের অন্যক্ষেত্রে তাদের কোন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না । এদের বাদ দিলে এই সময়ের কিছু পরে গিরীন্দ্রমেহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্য প্রতিভা বিংশশতকের গোড়ার দিকেই বেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে । এরা বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সরল ও সাদাসিধা ধরণের অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছেন । কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা সরল, সংযত ও পরিমিত ছিল । স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত উচ্চ-শিক্ষার সংযোগ হয়েছিল বলেই তাঁর রচনা মার্জিত ও সুষমা মন্ডিত হয়েছিল । কেউ কেউ সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা লিখতেন এবং জনপ্রিয়তা লাভেও সমর্থ হয়েছিলেন । তবে এইসব মহিলা কবিদের লেখার মধ্যে ভগবৎপ্রীতি, সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, ব্যক্তিগত বেদনা, স্বামীভক্তি ও বৈধব্যজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা, সামাজিক উৎপীড়ন প্রভৃতির চিত্রই অধিক প্রতিফলিত হত ।

মানকুমারীর কবিতার কিছু অংশ ঃ —

"শত জনমের আজি কত পুণ্যবলে
শুনিনু তোমার মুখে অয়ি সুবচনি,

পুঃন পাইয়াছে প্রাণ দেবর আমার !
ইচ্ছা হইতেছে বনে যাই পাখী হয়ে
দেখিগে সে চাঁদমুখ, পরাণ ভরিয়া
বিপদ বিমুক্ত বীর, দেখিগে স্বজনি।"[১২৫]

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা কাব্যসাহিত্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুর আবির্ভাবে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন ঘটেছিল । বয়সের দিক দিয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এদের সকলের বড়। স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত খ্যাত পরিবারের উন্মুক্ত পরিবেশে জন্মেছিলেন, কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বাল্যকাল থেকে সংস্কৃত পড়ার দিকে, কবিতা লেখা ও ছবি আঁকার দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল, পরবর্তীকালে এগুলির সব দিকেই তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় নারী মনের স্বাভাবিক আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে । তাঁর আবেগের প্রধান কেন্দ্রে ছিলেন তাঁর স্বামী । তাঁর কবিতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল গৃহ সংসার প্রভৃতির মধ্যে । স্বামীর মৃত্যুর পর রচিত তাঁর 'অশ্রুকণা' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । তাঁর রচনার একটু নমুনা ঃ —

"কোথা হ'তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর ।
কোলের উপরে ব'সে
হৃদয় লইলি চুষে —
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোর,
কোথা হ'তে এলি দুঁদেরে ক্ষুদে সিঁধেল চোর ।
কিছু থুতে সাধ নাই,
সকলি তুহার চাই,
মুখের তাম্বুলটুকু,
সিঁথির সিন্দুর টুকু
গলার হাঁসুলিহার - বাহুর কনক-ডোর;
চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ তোর ।

হায়রে সিঁধেল চোর,
আরো নিতে বাকী তোর।
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে দুঁদে চোর।[১২৬]

কামিনী রায় উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে কবিতা লিখতে আরম্ভ করে বাংলার যুগান্তকারী কবি রবীন্দ্র পরিমন্ডলের মধ্যেও নিজস্ব ধরণের কাব্যচর্চ্চা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কবিতার একটি ছত্র ঃ— "গিয়াচে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি, ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার," পুত্রশোকে রচিত করুণরসের কবিতা — "তোমার দেহের সাথে হলো ভস্মীভূত, আমার অগণ্য আশা" ইত্যাদি প্রত্যেকটিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল।

স্বর্ণকুমারীর কবিতার নিদর্শন পূর্ব অধ্যায়ে আছে বলে এখানে আর উল্লিখিত হল না। উনবিংশ শতকের মহিলাকবিগণ পারিবারিক মন্ডলের মধ্যেই তাঁদের সাহিত্যচর্চ্চা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

নাম না জানা কোন এক বঙ্গনারীর লেখার কিছু অংশ ঃ—

"কে তোরা স্নেহের বাছা, ভক্তি সুধা বারি
তপ্ত হৃদে দিলে,
পুতঃ মাতৃপ্রীতি শ্রদ্ধা অর্ঘভরে লয়ে
দীনে অরপিলে।
বজ্রাহত দগ্ধপ্রায়, যবে দুঃখে মরি
তোরা কাছে বসে,
নয়নের অশ্রু উৎস সযতনে, আহা,
মুছাইলি এসে।
. . . .
আশীর্ব্বাদ করি তোরা দেশের গৌরব
হও বিধি বরে।
ভারত কৃতার্থ হোক - বসুধা পবিত্র,
হোক কীর্ত্তিভরে,

ভাবরাজ্যে পুত্র হয়ে এলি যদি তোরা
বিধাতার দান,
থাক তোরা চিরদিন হয়ে সুকুমার
ভরি স্নেহোদ্যান ।"[১২৭]

লেখিকা সরোজকুমারী দেবী আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন ঃ —

"ক্ষুধিত হৃদয় মোর কাঁদিছে সদাই।
কিছুতে মেটেনা আশা যাহা হাতে পাই ।।
আরো কি কামনা করে হৃদয় চঞ্চল,
কি যেন লভিতে আশা হয়েছে প্রবল ।
সে কি সাধ, সে কি আশা তুমি অন্তর্য্যামী,
আলোকিত করে আছ কি বা দিবাযামী
হৃদি অন্তঃপুর মম, জান কোন আশা,
কি লাগি আকুলচিত্ত কিসের পিপাসা ।
সে শুধু তোমারি তরে, তোমা লভিবার,
জাগিছে বাসনা চিত্তে সদা দুর্নিবার ।
দয়াময় কাঙ্গালিনী এসেছি দুয়ারে,
রাখ পায়, ঠেলিওনা কভু তারে দূরে ।
তোমারি করিও, লও এ হৃদয় মন,
আমার সর্ব্বস্ব তোমা করিনু অর্পণ ।
.... ।"[১২৮]

মহিলা সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলাকুলের উন্নতি বিধান । এইজন্য প্রয়োজন ছিল মহিলাদের শিক্ষা, অবরোধ মুক্ত স্বাধীন জীবন। শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে, সাংসারিক জীবনে সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করে গৃহকে সুখ ও শান্তির স্বর্গে পরিণত করা । শিক্ষা বলতে কেবল বই পড়া বিদ্যা বোঝায় না, যে জ্ঞান দ্বারা স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সন্তানের উত্তম মাতা, পরিবারের সকলের আদর্শস্থানীয়া হওয়া যায়, তাহাই শিক্ষা । গৃহ মহিলাদের আদর্শ কর্মক্ষেত্র, পরীক্ষাক্ষেত্র । বিবাহের পর একটি বালিকা বধূ হয়ে সংসার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে

সেখানে কি ভাবে চলতে হবে তা জানা থাকলে তার পক্ষে অনেক উপকার হয়। বাল্যকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বাপের বাড়ীই বালিকার শিক্ষার আদর্শস্থান, আর শ্বশুরালয়ে সেই শিক্ষার পরীক্ষা শুরু হয়। জ্ঞান অভাবে, শিক্ষা অভাবে তারা নিজেরাও কোন ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে না, অপরকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। সংসার অশান্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠে। রমণিগণ গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, তারা সংসারকে লক্ষ্মীর স্থায়ী বাসস্থানরূপে গড়ে তুলতে পারেন। এই লক্ষ্মীর লক্ষণ কি, কোথায় তার স্থায়ী বসতি তা নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর কাছে জানতে চান। উত্তরে লক্ষ্মী বলেন—

"শুচি অঙ্গ, শুচি বস্ত্র, শুচি যার মন।
সর্ব্বকর্ম্ম পরিপাটী, সুমিষ্ট বচন।।
গতি ধীর, দৃষ্টি স্থির, হস্ত সদাবশ।
অল্প কথা, মৃদুহাসি, লোকে করে যশ।
গুরুজন, বৃদ্ধগণ যার পূজা পায়।
আলস্যে অধম অন্ন কভু নাহি খায়।।
অদ্যকার ব্যয় করে কল্যকার রাখি।
এমন লোকের গৃহে সদা আমি থাকি।।"[১২৯]

বিবাহের পর মহিলাগণের শ্রেষ্ঠ গুরু হলেন স্বামী। শ্রেষ্ঠ গুরু জেনে তাঁকে ভক্তি ও সম্মান করা উচিত। বিবাহের পর স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের চিন্তাও মহাপাপ। পরপুরুষের বিষয় ভাবলেও মহাপাপ হয়, সে পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। জন্ম-জন্মান্তর সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়। শ্রীমতী দ্বিদলবাসিনী দেবী বিধবা বালিকার কষ্ট ও লাঞ্ছনার বিবরণ দিয়ে আবার নিজেই বিধবার মুখে তার স্বান্ত্বনার কথা, ত্যাগের কথা শুনিয়েছেন :

"কে তুমি ললনে, সংসার প্রাঙ্গণে,
আছ শূন্য মনে, খুজিছ উদাস পরাণে কায়।
মলিন বসনা, বিলাসবিহীনা,
আভরণ হীনা, বিনা যত্নে দেহ কঙ্কাল প্রায়।
আহার বিহার, মিছা অধিকার,
এ সুখ সংসার, কারাগার যেন তোমার কাছে,

উত্তরে লেখিকা বলছেন : —

সংসার আশক্ত, কিন্তু দয়ান্বিত,
কে তুমি গো পিতঃ, স্নেহযুত ঘোর প্রণতি পায়
অনাথা বিধবা, বটে গো যদিবা,
সধবা নাহিক, তবু কে অভাগী বলে আমায় ।
স্বর্গগত পতি, লইতে সংহতি,
সমাদরে অতি, সতী সতী বলে ডাকেন ওই ।"[১৩০]

মহিলাগণ অবরোধ ভেঙ্গে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করছে, কেবল বি.এ., এম. এ. পাশ হলেই নারী শিক্ষিত হল একথা মনে করলে চলবে না । বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই শেষ কথা নয় । নারী জাতির প্রকৃত শিক্ষা হল, যাতে তাঁর বুদ্ধির বিকাশ হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং মানবিক সদ্‌গুণগুলি জাগ্রত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা । বিধাতা নারীজাতিকে কতগুলি মহৎগুণের অধিকারী করেছেন, যা পুরুষের মধ্যে বিরল । স্নেহ, দয়া, মায়া, সহনশীলতা, ত্যাগ, উদারতা এগুলি নারীজাতির প্রধান গুণ। স্ত্রীলোক মাতৃজাতি । সে দুঃখের সময়, শোকের সময় স্বান্তনা দেবে, পাশে থাকবে, স্ত্রীলোকের মুখ দেখে প্রাণে শান্তি আসবে, এটাই তো চাই । স্ত্রীলোক মাত্রেই বাইরের শিক্ষা অপেক্ষা অন্তরের শিক্ষা বেশী আবশ্যক । বিলাতে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন, যাদের অন্তরের সদ্‌গুণ থাক আর না থাক, বাহ্য সাজগোজ দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করতে পারলেই তাদের আনন্দ । একপ্রকার পুষ্প আছে, যেগুলি দেখতে সুন্দর কিন্তু সুঘ্রাণের বদলে কু-ঘ্রাণ আছে । আমাদের ভারতীয় মহিলারা সেরূপ হোক, এটা বাঞ্ছনীয় নয় । বিলাতের স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলাসপ্রিয়, সাজগোজ দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখেন, এমন নয় । এমন একশ্রেণীর মহিলা আছেন, যাঁরা স্ত্রীজাতির মধ্যে রত্ন বিশেষ ।

কি ইংলন্ড, কি ভারতবর্ষ মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিই জীবনের প্রকৃত উন্নতি । স্ত্রীজাতির কোমল হৃদয়ে ভক্তি একান্ত আবশ্যক । পদ্মে যেমন মধু, স্ত্রীজাতির হৃদয় পদ্মেও সেইরূপ ভক্তি মধু থাকলে যেমন নিজের, তেমনি অপরের জীবনও ধন্য হয় । ভক্তিই মানব জীবনের সার পদার্থ । মাতৃজাতির মধ্যে ভক্তির সমাবেশ যত হয় ততই মঙ্গল ।

স্ত্রী-জাতি শিক্ষা লাভ করুক, সভায় বক্তৃতা করুক, গ্রন্থরচনা করুক, সব ভাল। কিন্তু যদি স্ত্রীজাতির মধ্যে কোমলতা মাতৃভাব না থাকে, তবে তার সব শিক্ষাই ব্যর্থ। ভারত রমণীর পতিভক্তি পতিসেবা ও সতীত্ব হল সবগুণের বড় গুণ। চারিত্রিক শুদ্ধতা না থাকলে কোন সদ্‌গুণের অনুপ্রবেশ হৃদয়ে ঘটে না । সতীত্বই রমণীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। এর সঙ্গে বিনয়, নম্রতা, দয়ামায়া, কোমলতা প্রভৃতি যুক্ত হলেই নারী হয়ে উঠেন মহীয়সী, বরেণ্যা ।

সতী রমণীর প্রধান কর্তব্য স্বামীর বিপদে তার পাশে দন্ডায়মান হওয়া। পতিই রমণীর গতি । পতিই রমণীর শ্রেষ্ট গুরু, বন্ধু, শিক্ষক, স্বামী ও জীবনসাথী। সতী রমণী পতির গৌরবেই গৌরবান্বিত । তবে পতি যদি অসৎ বা উচ্ছৃঙ্খল হয় সে ক্ষেত্রেও সতী রমণী তার ভালবাসা, প্রেম, সেবা ও কোমলতা দ্বারা পতির চরিত্রদোষও সংশোধিত করতে পারেন ।

. . . পতি বিনা সতীর কে আছে সংসারে,
যে পতি বিহনে সতী তরিতে না পারে ।
পতিপদ ভক্তিভাবে সেবে যেই নারী,
পতিরে যে ভাবে সদা পারের কান্ডারী ।
পতিজ্ঞান, পতিধ্যান, যপ তপ পতি,
এমন যে নারী তার হয় স্বর্গে গতি ।

. . . .

পতিপ্রেমে তদ্গদ চিত্ত যার মন,
মনো দুখ নাহি সেই পায় কদাচন ।

. . . .

হ'ক না সে নারী কেন শিল্পে সুনিপুণা;
হ'ক না সে নারী কেন বিদ্যা বিচক্ষণা,
কিন্তু যদি তার মন না থাকে পতিতে,
পতিতা হইবে সেই এসব থাকিতে ।
অতএব ভগ্নীগণ সবে একমনে
সর্ব্বদা রাখিও ভক্তি পতির চরণে।"[১৩১]

নারীর জীবনে সতীত্বের মত মূল্যবান রত্ন আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। এই রত্ন অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ে লুক্কায়িত করে রাখতে যে নারী জানে, সে মহা বুদ্ধিমতী ও শক্তিমতী মহিলা।"

মহামূল্য ধন সতীত্ব রতন
ত্রিভুবনে তার সমতা নাই,
দানবী মানবী নাগ কন্যা দেবী
যাহার প্রভায় দেখিতে পাই
প্রশান্ত প্রচুর প্রকৃতি মধুর
কিবা চমৎকার তারা সবাতে
নেহারি নয়নে দয়াদি দাক্ষিণ্যে
মনের মালিন্য যায় তফাতে।

....

প্রাঙ্গণ পাথারে প্রান্তর কান্তারে
সর্ব্বত্র সে নারী নির্ভয়ে চলে।
দস্যু বা দানব পিশাচ মানব
কার সাধ্য কিছু টলাতে পারে
সলীল অনল তীব্র হলাহল
সকলি সহায় সতীর তরে।

.................।"[১৩২]

শিক্ষালাভের ফলে মহিলাদের চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। মহিলাগণ শুধু গৃহকার্যেই নিজেদের নিয়োজিত না রেখে সামাজিক জীবনে ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও যাতে পুরুষদের কাজে সহায়তা করতে পারেন, তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। নূতন নূতন পেষা গ্রহণে মহিলারা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মহিলারা যাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করতে সমর্থ হন, এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে উনিশশতকের শেষের দিকে নীলকমল মিত্র মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অবলা দাস সহ কয়েকজন মহিলা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাদ্রাজ যান। পরবর্তীকালে মহিলাগণ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা

বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পান। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অন্যান্যদের চেষ্টা ও যত্নে মহিলাগণ এই সুযোগ লাভে সমর্থ হন ।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাগণ আপন ভরণ-পোষণের জন্য পূর্বের ন্যায় পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকাও যুক্তি যুক্ত বলে মনে করছেন না । যখন একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ছিল, তখন সংসারে বহু পতিহীনা বিধবা ও কুলীন ব্রাহ্মণ অবিবাহিত্র কন্যা স্বামীর আশ্রয় না পেলেও একান্নবর্তী পরিবারে আশ্রয় পেত ।এদের সংখ্যাও সমাজে বা পরিবারে নেহাৎ কম ছিল না । গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর নেই । চাকুরীর উপর নির্ভর করে সংসার প্রতিপালন । যৌথ গ্রাম্য সরল জীবনের পরিবর্তে এসেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার । তার ফলে একজন পুরুষের পক্ষে নিজের সংসারের সব দায়িত্ব সামলে অপরের জন্য কিছু করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা চলে যাচ্ছে । কিন্তু কথা হল — সহায় সম্বলহীনা অনাথা মহিলারা কোথায় যাবেন । সমাজের এমনই ব্যবস্থা যে এইসব সহায় সম্বলহীনা মহিলারা সংসারে শত লাঞ্ছনা ও দুঃখ সহ্য করেও অলসভাবে সময় অতিবাহিত করেন । তবু স্বাধীনভাবে কোন ভাল জীবিকার কথা সমাজের নিন্দার ভয়ে ভাবতে পারেননা । দুঃখ যতই বেড়ে যাক না কেন সমাজ ভয়, তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ভয়ে তারা অপরের গলগ্রহ হয়ে চোখের জলে দিনাতিপাত করছেন, তবুও সমাজভয়ে স্বাধীনভাবে কিছু করবার উপায় নেই।

তৎকালীন সমাজে অনাথা মহিলাদের দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়ে আলোক প্রাপ্তা শিক্ষিতা মহিলাগণ সেইসব দুঃস্থ অনাথাদের দুঃখ দূর করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন । কিভাবে অনাথা মহিলাগণ স্বাধীনভাবে জীবিকা গ্রহণ করতে পারেন তার বিষয় নানা চিন্তাভাবনা করতেন । তাঁরা বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে সরব হন । মহিলাগণ যাতে শিক্ষা পেয়ে স্বাধীনভাবে কিছু উপার্জ্জন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বহু সভাসমিতি স্থাপিত হয় ।

'বামাহিতৈষিণী সভা'

বামাগণের উন্নতির জন্য ১২৭৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে 'বামাহিতৈষিণী সভা' স্থাপিত হয় । এই উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী পত্রিকায়' একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয় । তাতে দেখা যায় ঃ - 'পরের উপরে ভর কতদিন তরে ? চিন্ত আপনার হিত আপন

অন্তরে ।' পুরুষের গলগ্রহ হয়ে সারাজীবন চলা, এতে না আছে পুরুষের উন্নতি, না আছে মহিলাদের উন্নতি। কারণ, (১) স্ত্রীজাতির অভাব পুরুষের পক্ষে দূর করা সম্ভব নয় । (২) নিজেদের রুচি, অভাব ও অবস্থা অনুসারে পুরুষেরা মহিলাদের চালাতে চেষ্টা করেন । তাই স্ত্রীলোকগণ যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পান সেইজন্য একটি স্ত্রী সমাজ স্থাপনের প্রয়োজন ।[১৩৩] কেশবচন্দ্র সেন ও শিক্ষয়িত্রী স্কুলের কয়েকজন ছাত্রী ছিলেন এর উদ্যোক্তা । সেখানে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ঃ (১) সমাজের নাম রাখা হয় 'বামাহিতৈষিণী সভা'। (২) বামাগণের মঙ্গলসাধনই এর মূল উদ্দেশ্য । (৩) ১৫ দিন বাদে সভ্যারা মিলিত হয়ে স্ত্রীজাতির পক্ষে হিতজনক রচনা পাঠ এবং বক্তৃতা ও কথোপকথনে নিজেদের নিযুক্ত রাখবেন। (৪) যে কোন মহিলাই উক্ত সমাজের সভ্যপদ গ্রহণ করতে পারবেন । সভা স্থাপিত হবার অল্পদিন পরেই ঐ সভার এক অধিবেশন হয় । কেশবচন্দ্র সেন তার সভাপতি নিযুক্ত হন । বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিক্ষয়িত্রী স্কুলের চারজন ছাত্রী কিসে স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি হয় সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ৩০ জন মহিলার মধ্যে মনমোহন ঘোষ ও দুর্গামোহন দাসের পত্নীরা উপস্থিত ছিলেন ।[১৩৪]

প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয় কাঁকুড়গাছিতে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর বাগানবাড়ীতে। সভাপতির ভাষণে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সমিতির কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটামুটি যা বলেন — ১২৭৮ সালের ৭ই বৈশাখ কেশবচন্দ্র সেনের ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় 'বামাহিতৈষিণী সভা' স্থাপিত হয় । মহিলারা সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় পুরুষেরা ঐ সমিতির কাজে অংশ গ্রহণ করেন । বিগত ১ বৎসরে ১৬টি বিষয় নিয়ে সভাপতি মহাশয় ঐ সভায় আলোচনা করেন — (১) প্রকৃত শিক্ষা, (২) প্রকৃত স্বাধীনতা, (৩) স্ত্রীলোকদের নিরুদ্যম ও উৎসাহ হীনতা (৪) লজ্জা, (৫) বিনয়, (৬) অভ্যর্থনা, (৭) সভ্যতা, (৮) পরিচ্ছদ, (৯) নম্রতা, (১০) অহঙ্কার, (১১) ক্রোধ (১২) গৃহকার্য, (১৩) পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, (১৪) হিংসা, (১৫) ভগ্নীভাব, (১৬) দয়া । প্রথমে সভ্যার সংখ্যা ছিল ১৩/১৪ জন । এঁরা হলেন — রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী মজুমদার, যোগমায়া গোস্বামী, সৌদামিনী খাস্তগিরি, সারদাসুন্দরী ঘোষ, বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়, সরলাসুন্দরী দাস, জগত্তারিণী বসু, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, জগমোহিনী রায়, কৈলাসবাসিনী দত্ত,

অন্নদায়িনী সরকার, কৃষ্ণকামিনী দেব, মহামায়া বসু প্রমুখ মহিলাগণ। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সভাতে সভাপতি মহাশয়, সৌদামিনী মজুমদার ও অন্য একজন বক্তৃতা দেন। সৌদামিনী কাস্তগিরি স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।[১৩৫]

'বামাহিতৈষিণী সভার' দ্বিতীয় অধিবেশন হয় বেলঘরিয়াতে ১৮৭৩ সনের ২১ জুন শনিবার। কেশবচন্দ্র সেন দ্বিতীয় বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন এবং রাধারাণী লাহিড়ী সম্পাদিকা মনোনিত হন। সম্পাদিকা তাঁর ভাষণে জানান যে ১ম বৎসরের ন্যায় ২য় বৎসর সভার কাজ তেমন হয়নি। দ্বিতীয় বৎসরে তা কমে মাত্র ৮টি বিষয় আলোচিত হয়ঃ (১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্তমান কালের সুসভ্য ইংরাজ রমণীগণের কি কি গুণ অনুকরণীয়। (২) সন্তান পালন, (৩) দয়া, (৪) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্তমান অবস্থা এবং তাহাদিগের প্রতি ইংলন্ডীয় রমণীদিগের কর্তব্য। (৬) নারীগণের ধর্মহীন শিক্ষা সমুচিত কিনা, (৭) কি প্রকারে শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হতে পারে, (৮) নারীজীবনের উদ্দেশ্য।

উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে ১৩ জনের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন— কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, কৈলাসকামিনী দত্ত, বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়, মালতি মালা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলাসুন্দরী দাস, নিস্তারিণী রায়, মহামায়া বসু, রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী সরকার, কুমারী সিংহ, মতিমালা দেবী, মহালক্ষ্মী ঘোষ ও রাধারাণী লাহিড়ী। ১২৮৩ সনের ১২ই মাঘ বুধবার মাঘোৎসবের সঙ্গে 'বামাহিতৈষিণী সভা'র একটি অধিবেশন হয়। বৈকাল ৫টার সময় সভার কাজ শুরু হলে সম্পাদিকা রাধারাণী লাহিড়ী বিগত সভার তিনটি প্রবন্ধের সারাংশ ঐ সভায় পড়ে শোনান এবং পরে নিজের লেখা 'স্ত্রীলোকের কার্য্য ও শিক্ষা' এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৩৬]

আর্য্যনারী সমাজ

স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে দুটি মতবাদ দেখা দেওয়ার পরিণামে আর্য্যনারী সমাজ স্থাপিত হয়। একদল মনে করেন আমাদের দেশের নারীজাতির শিক্ষা ইউরোপীয় মহিলাগণের অনুকরণে হোক, অপরদল মনে করেন ভারতরমণীর শিক্ষা পূর্বকালেরপ্রথা অনুযায়ী হওয়া উচিত। এরই ফলশ্রুতিতে আর্য্যনারী সমাজের

জন্ম। 'আর্য্যনারী সমাজে'র উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ — (১) বাংলার নারী সমাজের পরিবর্তন ও সংশোধন করাই ছিল এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। (২) এই পরিবর্তন হবে প্রাচীন ও আর্য্যবংশীয় হিন্দু মহিলাদের বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার অনুসারে। (৩) শরীর, মন ও আত্মার সংশোধন করা। (৪) নারীর পক্ষে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের অনুকরণ না করা।(৫) সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য বিজাতীয় রীতি গ্রহণ না করে জাতীয় কল্যাণকর আচার অনুষ্ঠান সমূহ মহিলাদের রক্ষা করা। (৬) ধর্মভাবের উপর ভিত্তি করে সমাজ সংস্কার করা। (৭) ধর্ম ও জাতীয় ভাবকে রক্ষা করে জাতির কল্যাণকর দিকগুলি গ্রহণ করা।(৮) দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন দ্বারা নারীর স্বভাবকে প্রস্ফুটিত করা। এছাড়া প্রত্যহ স্নান ও গাত্রশুদ্ধি, পরিমিত আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান ও সময়মত নিদ্রা অবশ্য প্রয়োজন। জ্ঞানোপার্জনের জন্য ধর্মোপদেশ গ্রহণ করা, ইতিহাস, সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করা আবশ্যক। পূজাপাঠ, সৎসঙ্গ এবং নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতি করাও আবশ্যক। সামাজিক ও গৃহকর্মের জন্য মহিলাদের আরো বহুবিধ বিষয় অবলম্বনের উপর ঐ সমাজ গুরুত্ব আরোপ করে—(ক) স্ত্রীলোকের প্রধান কাজ হবে পতিসেবা ও পাতিব্রত্য গ্রহণ করা, (খ) স্বামীকে ঋণগ্রস্ত না করে স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করা, (গ) ছেলেদের সৎশিক্ষা দান করা, (ঘ) রন্ধন প্রভৃতি সাংসারিক কাজে দক্ষতা অর্জন করা, (ঙ) সামর্থ্য অনুসারে গরীব দুঃখীদের দান করা, (চ) ব্রতানুষ্ঠান পালন করা, (ছ) ধর্মসাধনার সময় বেশভূষার বাহুল্য বর্জন করা প্রভৃতি কাজ মহিলাদের করণীয় বলে ঐ সমাজ একখানি অঙ্গীকার পত্র প্রকাশ করে। যারা ঐ সমাজের সভ্যা হতে চাইবেন তাদের নাম, ধাম ও তারিখ লিখে দিতে হবে। কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ঐ সমাজ সৌদামিনী, রাজলক্ষ্মী, রাধারাণী, গোলাপ ও কুমুদিনী প্রভৃতিকে নিয়ে একটি অধ্যক্ষা সভা গঠন করে। জগমোহিনী ও মোহিনী নামে দুইজন মহিলা ঐ সমাজের কর্মচারীরূপে কাজে যোগ দেন।[১৩৭] সমাজের ১৮৮১ সালের সম্পাদকীয় বক্তব্যে জানা যায়ঃ (১) ঐ সমাজের সভ্যা সংখ্যা ২২। এর মধ্যে ১৫ জন কলকাতার, অবশিষ্ট ৭ জন ঢাকা, আসাম, আরা, বগুরা ইত্যাদি অঞ্চলের। (২) অন্যান্য কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রধান হল দরিদ্রদের মাসিক অর্থসাহায্য দান করা।

বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান লাভ করে ঃ — ১) স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে,
২) নারী জীবনের উন্নতি,
৩) সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান,
৪) প্রাচীন আর্য্য সতী নারীদের অনুসরণ,
৫) স্ত্রী স্বাধীনতা,
৬) দেহের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞানকৌশল দর্শন,
৭) নববিধান,
৮) যোগতত্ত্ব,
৯) যোগসাধন,
১০) ঈশ্বরের বিবিধ নিরাকার রূপ,
১১) ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ
১২) ঈ শ্বর প্রীতি
১৩) দম্পতির প্রকৃত সম্বন্ধ বৈরাগ্য
১৪) প্রকৃত স্বাধীনতা ।

মাঘোৎসব উপলক্ষে উক্ত বৎসর সামাজের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র, অর্থ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয় ।[১৩৮]

১৮৭৯ সনের নভেম্বর মাস থেকে ভারত সংস্কার অধীনস্থ স্ত্রী বিদ্যালয়ের দায়িত্ব 'আর্য্যনারী সমাজ'কে দেওয়া হয় । সমাজের সভ্যাগণ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।[১৩৯] ১২৯৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে 'পরিচারিকা'র দায়িত্ব উক্ত সমাজকে দেওয়া হয় ।[১৪০]

'বঙ্গমহিলা সমাজ'

কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে 'ব্রাহ্মসমাজ' দ্বিধাবিভক্ত হলে আনন্দমোহন বসুর সহধর্মিণী সুবর্ণপ্রভা বসুর নেতৃত্বে 'বঙ্গমহিলা সমাজ' গঠিত হয় এবং কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় 'আর্য্যনারী সমাজ' গঠিত হয়। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী জগন্মোহিনী দেবী 'আর্য্যনারী সমাজে'র দায়িত্ব গ্রহণ

করেন ।[১৪১]

১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে বাংলার মহিলাদের জ্ঞান, নীতি ও ধর্মবিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য 'বঙ্গমহিলা সমাজ' গঠিত হয় । এই সমাজের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ লিখন, আলোচনা, উপদেশ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয় ।[১৪২] ১২৮৯ (১৮৮২) বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে এই সমাজের পক্ষ থেকে চারটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল । পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী — 'স্বাধীনতা', ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু শাস্ত্রী — 'এদেশের শাসন প্রণালী' এবং কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।[১৪৩] ১২৯০ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ সোমবার 'ব্রাহ্মসমাজ' মন্দিরে 'বঙ্গমহিলা সমাজে'র বাৎসরিক অধিবেশনে সম্পাদিকা সুবর্ণপ্রভা বসু সমাজের কার্যসূচি ও আদর্শের বর্ণনা দেন ।

১৮৮৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী সিটি কলেজে প্রায় ১০০ জন মহিলার উপস্থিতিতে একটি সভা হয় । ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায় পরীক্ষা সহকারে বায়ু সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন । তথায় আমোদ-প্রমোদের ও জলযোগের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।[১৪৪] ১২৯৬ বঙ্গাব্দে রাজাবাজারে ডাঃ মোহিনীমোহন বসু মহাশয়ের বাড়ীতে দশম বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । ৯ই মাঘ প্রার্থনা দিয়ে সমাজের কাজ শুরু হয় । শিশুদিগের নীতি শিক্ষা' ও 'পারিবারিক সুখ' সম্পর্কে দুইজন সভ্যা আলোচনা করেন । ভালো ভালো পুস্তক থেকে কিছু পাঠ ও সঙ্গীতের পর সভার কাজ শেষ হয় । ১৩ই মাঘ রাত্রিবেলা ঐ সমিতি একটি সভা ডাকেন । বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পর রাত্রি ১১টায় জলযোগের পর সভার কাজ শেষ হয় । এর কিছু দিন পর 'বঙ্গমহিলা সমাজ' ভেঙ্গে যায় ।[১৪৫]

'ভারত মহিলা সমাজ'

কিছু ব্রাহ্মমহিলা ও কাদম্বিনী লাহিড়ীর উদ্যোগে ১৮৯৫এর ৪ঠা আগষ্ট 'ভারত মহিলা' সমাজ গঠিত হয় । দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের জীবিকা রোজগারের সহায়তা করা ও মহিলা সমাজের নৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি করা, বুদ্ধি ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নয়ন এবং সহায় সম্বলহীনা বিধবা মহিলাদের উন্নতি প্রভৃতি এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির অপর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি

উল্লেখযোগ্য—
(১) যে সমস্ত নরনারী সমস্তদিন পরিশ্রম করেও পেটের ভাত জোগাড় করতে পারেনা, তাদের কল্যাণসাধন ও শিক্ষাদান।
(২) জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতা সহকারে জীবনের কর্তব্য সাধনের জন্য মহিলাদের সাহায্য করা।

প্রত্যেক সভ্যাকে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করতে হত ঃ —
(১) জ্ঞানোন্নতি ঃ অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সুবিধামত সংবাদপত্র সহ ভাষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা।
২) সামাজিক কর্তব্য ঃ— মাসের মধ্যে কমপক্ষে একঘন্টা করে যে কোন পরিবারের জন্য স্বহস্তে কাজ করা।
৩) পারিবারিক কর্তব্য ঃ— নিজ নিজ পরিবারের উন্নতিসাধন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কয়েকজন মহিলা নিয়ে এর কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। মোট সভ্যা সংখ্যা ৯৫ জন। সভাপতি - চপলা দত্ত, সম্পাদিকা - সুশীলা বসু। সহকারী সম্পাদিকা - গিরিবালা বিশ্বাস ও যজ্ঞেশ্বরী মজুমদার। কাদম্বিনী লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে ঐ সমিতি অসহায় বিধবাদের জন্য একটি বিধবাশ্রম তৈরী করে।[১৪৬]

'সখী সমিতি'

'বঙ্গমহিলা সমাজ' সাধারণত শিক্ষিত ব্রাহ্মমহিলাদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল। অন্তঃপুরে আবদ্ধ মহিলাগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতেন না। সেই জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী একটি পৃথক সমিতির কথা চিন্তা করেন। অল্প কয়েকটি কথায় তার মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করেন ঃ কিছুদিন হতে 'বঙ্গমহিলা সমাজ' নামে শিক্ষিত ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদের একটি সম্মিলনী সভা স্থাপিত হয়েছে। তবে এই সভায় পুরুষ যেতে পারেন এবং অন্তঃপুরে মেয়েদের নিয়ে এই সভা নহে - সেজন্য এ সভার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ, কারণ যে কয়েকটি ব্রাহ্মমহিলা শিক্ষিত বলে অভিহিত তাঁরা আর কয়জন — আর দেশের সমস্ত মহিলাই প্রায় অন্তঃপুরে আবদ্ধা — সুতরাং যদি অন্তঃপুর ছেড়ে দিয়ে কয়েকটি মেয়ে নিয়া সভা করা হয় - তা হলে দেশ আর সে উপকার পেল না - দেশের একটি সামান্য ভাগ মাত্র সে উপকারে লাভবান হল।[১৪৭]

১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'সখী সমিতি' গঠিত হয় । শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । 'সখী সমিতি'তে প্রবেশের নিয়মাবলী : —

১) সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই এই সমিতির 'সখী' হতে পারতেন ।

২) কেহ নূতন সখী হতে চাইলে, কোন বিশেষ কারণে অন্য সখীগণ আপত্তি না করলেই তিনি সখীরূপে গৃহীত হতেন ।

৩) মাসিক একটাকা করে সখীদিগের চাঁদা দিতে হত ।

৪) অভিভাবকের মতামত গ্রহণ না করে 'সখী সমিতি' কোন বালিকার ভার গ্রহণ করতেন না ।

৫) যে পুরমহিলা সমিতিতে মিলিত হবার অভিপ্রায়ে সখী না হয়ে দানের ইচ্ছায় সখী হতে চাইতেন তিনি সমিতির নিমন্ত্রণে আসতে বাধ্য নন ।

৬) সখীগণের সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হত যেন টাকার বিল শোধ করতে দেরী না হয়, কেননা এই চাঁদার উপরেই পালিতাগণের প্রতিপালন নির্ভর করত ।

৭) কলিকাতাবাসী উৎসাহী সখীগণের মধ্য হতে বাছাই করে প্রতি বৎসর আট কিংবা দশ জনের একটি ক্ষুদ্রসভা গঠিত হত । সমিতিতে বালিকাগণের তত্ত্বাবধান, নূতন কোন আশ্রয় প্রার্থী বালিকাকে নেওয়া না নেওয়া এবং সমিতির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পরামর্শ দান এঁদের উপর নির্ভরশীল ছিল ।[১৪৮]

১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'সখী সমিতি'র প্রতিবেদন থেকে ঐ সমিতি ও শিল্পমেলার কর্ত্রীসভার তালিকায় এই মহিলাদের নাম পাওয়া যায় : — শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, শ্রীমতী লতিকা রায়, শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা, শ্রীমতী থাকমণি মল্লিক, শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী, শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী মনোমোহিনী দত্ত, শ্রীমতী সরলা রায়, শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্তা, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী, শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দাস, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু, শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা, শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী, শ্রীমতী বিধুমুখী রায়, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী সুরবালা দেবী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী । ইনি সম্পাদিকা ছিলেন ।[১৪৯]

'সখীসমিতি' স্থাপনের কিছুদিন পরেই কয়েকটি মহিলা সমিতির তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন এবং কয়েকজন অভিভাবকও সমিতির তত্ত্ববধানে তাদের কন্যাদের লেখাপড়া শেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। শুধু চাঁদার টাকায়

সমিতির শিক্ষার্থী বালিকাদের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব না হওয়াতে একটি শিল্পমেলা খোলার পরিকল্পনা করা হত। মেলায় মহিলাদের তৈরী জিনিষ বিক্রি করে যা লাভ হয় তা সমিতির প্রয়োজনে ব্যয় করা হত এবং মূলধন পরের বছরের জন্য জমা রাখা হত। মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতিকে ১০২৫ টাকা দান করেছিলেন। লেডি বেলী ও অন্যান্য মহিলাগণ টাকা ও নিজেদের হাতে তৈরী জিনিষ দিয়ে সমিতিকে সাহায্য করতেন। প্রথম বৎসর শিল্পমেলা থেকে যা লাভ হয় তা দিয়ে সমিতি আরো দুটি অনাথা মহিলাকে আশ্রয় দেন। মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় বৎসরের শিল্পমেলায় শিল্প দ্রব্যের মধ্যে পুতির, কাগজের, কাপড়ের, ধানচালের, পশম, জরী ও সূতার কারুকার্য মন্ডিত দ্রব্য যেমন ছিল, তেমনি মাটি দিয়ে তৈরী পাহাড়, পর্বত, পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের তৈরী কতকগুলি সুন্দর অঙ্কনচিত্রও মেলায় বিক্রির জন্য আনীত হয়েছিল।

'সখী সমিতি'র প্রধান উদ্দেশ্য হল সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান। পরে এই সব শিক্ষিত মহিলাগণ অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন এবং সৎভাবে নিজ নিজ সন্মান রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবেন। এর ফলে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটবে এবং ভারতীয় মহিলাগণই মিশনারি মহিলাদের মত কাজ করতে সমর্থ হবেন।

এই শিল্প সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে ৯নং শিব নারায়ণ দাস লেনে 'মহিলা শিল্পাশ্রম' নামে একটি আশ্রম তৈরী হয়। এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—বিধবাদের স্বাবলম্বী করে তোলা ও অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া। যদিও প্রথমে এখানে অনাথা বিধবাদের থাকার ব্যবস্থা ঠিক ছিল কিন্তু প্রয়োজনবোধে কুমারীদেরও আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হয়। এখানে যে যে জিনিষ শিক্ষা দেওয়া হত ঃ—

১) বস্ত্র বয়ন ও সূতা কাটা,

২) কলের মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি তৈরী শেখানো,

৩) লেস তৈরী শেখানো,

৪) কাটা কাপড় ও পোষাক তৈরী শেখানো,

৫) এছাড়া রেখাচিত্র ও তৈলচিত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান,

৬) খোদাই ও গঠন কার্য শেখানো,

৭) সঙ্গীত ও যন্ত্র এবং আলপনা শিক্ষা,

৮) নানাবিধ কারুকার্য শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা. শুশ্রুষা শিক্ষা । স্বাস্থ্য রক্ষা ও সহজ চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানদান ।

তখন আশ্রমে মোট ৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে হিন্দু বিধবার সংখ্যাই ছিল বেশি। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্য প্রতিমাসে হাজার টাকা ব্যয় হত । এর মধ্যে জনসাধারণের নিকট হতে ৬০০ টাকা ও বাকী ৪০০ টাকা ছিল সরকারী দান ।[১৫০]

এই সমিতির ব্যয় ভার বহন করতে গিয়ে অর্থাভাব ঘটে। সরকারী দান, সমিতির চাঁদা ও জনসাধারণের নিকট থেকে যা সংগ্রহ হত তা দিয়ে সমিতি ও বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করা ছিল কষ্টকর। এইজন্য স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'তে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন— "ভারতীর পাঠক পাঠিকাগণ বোধহয় মহিলা শিল্পাশ্রমের বিষয় অবগত আছেন । 'ভারতী'তে ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল ।ইহা একটি হিন্দু বিধবাশ্রম। শিল্পাদি শিক্ষা দ্বারা হিন্দু বিধবাগণ স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হন, এতদুদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত ; এখানে তাঁত, কলের মোজা এবং অন্যান্য শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় । আপাততঃ প্রায় ৩০ জন অনাথা মহিলা এই আশ্রমে বাস করিতেছেন । বলা বাহুল্য, এই আশ্রম রক্ষার ব্যয় বিস্তর — অথচ ইহার স্থায়ী কোন ফন্ড নেই - প্রধানতঃ ভিক্ষার উপরেই ইহার জীবন নির্ভর । বাঙ্গালী গৃহে পূজার সময় কেহ ভিক্ষা পাত্র লইয়া দ্বারস্থ হইলে গৃহস্বামী কখনই তাহাকে শূন্য হস্তে ফিরাইতে পারেন না ।আমরাও তাই আশাপূর্ণ হৃদয়ে পাঠক পাঠিকাগণের নিকট এই অনাথা মহিলাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি । প্রত্যেকে যদি অন্তঃত একটি করিয়া টাকাও এজন্য ভিক্ষা দান করেন, তবে কৃতার্থ হইব । 'ভারতী'র কার্য্যলয়েই দান পাঠাইতে অনুরোধ করি।"[১৫১]

আশ্বিন মাসে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে মাঘ মাসের মধ্যেই ১৩৫০ টাকা আট আনা সমিতির ফান্ডে জমা পড়ে।[১৫২] হিরণ্ময়ী

দেবী অকালে চলে গেলে সুচারু দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবীর কন্যা এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ল্যান্সডাউন রোডে এই শিল্পাশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়।

'সুমতি সমিতি'

বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বনলতা দেবীর সম্পাদনায় 'সুমতি সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এটি 'সখী সমিতি'র অনুকরণে গঠিত। সকলশ্রেণীর মহিলাদের উন্নতিই এর কাম্য ছিল। বরানগরে এর কার্যালয় ছিল। অসহায় মহিলাদের অর্থসাহায্য দান ও অন্তঃপুরের হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কিভাবে তাদের উন্নতি করা যায়, এটাই ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। বনলতা দেবী অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলে পরে তাঁর বড় বোন সুখতারা দেবী এর সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১৫৩]

এই সমিতির উদ্যোগে ১৩০৪ সনে শ্রীমতী ক্যানিংকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। সেখান থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ"বঙ্গরমণীদের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে প্রায় ৬ বৎসর হইল সুমতি সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা কয়েকটি মহিলার আত্মোন্নতির চেষ্টা হইতে প্রসূত হয়। বরাহনগর বিধবা আশ্রম ইহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। প্রথম অবস্থায় কেবল কয়েকটি মহিলা প্রতি রবিবার সৎবিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের জন্য সমবেত হতেন। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় এখন সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানের হিন্দু পরিবারের মহিলাগণ বিশেষভাবে সমিতির সহিত যোগাযোগ রাখিয়া ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এখন ইহার সভ্য সংখ্যা ৫২। প্রবন্ধপাঠ ও সৎ আলোচনার সঙ্গে শিল্পশিক্ষাও সমিতির একটি কাজ। স্থানীয় মহিলাদের পাঠের সুবিধার জন্য একটি লাইব্রেরী, বালক বালিকাদিগের আমোদসহ নৈতিক উন্নতির জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সমিতির দ্বারা চলিতেছে।..... গত বৎসর দরিদ্র রুগ্ন রমণী ও নিরাশ্রয় ৩টি বালক বালিকার সাহায্যার্থে সমিতি হইতে কিছু অর্থদান করা হইয়াছে। এই সমিতির সকল কার্য্য

বঙ্গ রমণীদিগের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং রমণীদিগের উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।"[১৫৪]

'শ্রীহট্ট সমিতি'

'শ্রীহট্ট সমিতি' প্রথমে শিলং এ স্থাপিত হয়েছিল । এর সম্পাদিকা ছিলেন হেমন্ত কুমারী দেবী । পরে অবশ্য এই সমিতিকে শ্রীহট্টে স্থানান্তরিত করা হয় ।[১৫৫]

এইসব সমিতিগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । তার প্রধান কারণ অর্থাভাব ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা। তা সত্ত্বেও সমাজের উপর এর সুদূর প্রভাব পড়েছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই ।

রাজনৈতিকজীবন

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যেসব ভারতীয় পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরাই সর্বপ্রথম জাতীয় চেতনা ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন । সেদিক থেকে বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর আলোকপ্রাপ্ত অনুরাগীরাই ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদিপুরুষ ও ভারতীয় আধুনিক জাতির প্রবক্তা। এঁরাই ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের পুনর্বিন্যাসের জন্য সমাজ ও ধর্মসংস্কারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন ।

১৮৮৫ সালে উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবিগণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন । ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কার্যক্রম, রূপ ও কর্মপদ্ধতি এঁরাই স্থির করেন । ১৯০৫ সালে এঁরাই সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি ছিল প্রধানত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করা, যুক্তিতর্ক দ্বারা ইংরাজ সরকারকে বোঝাবার চেষ্টা করা এবং বৃটিশ জনগণের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করে ভারতীয়দের উপর অধিক সংবেদনশীল হওয়া। বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের দাবীদাওয়াগুলোর একটাও মেনে নিচ্ছে না দেখে নূতন দর্শনচিন্তা, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সংগ্রাম পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী হয়ে একটি নূতন

গোষ্ঠী কংগ্রেসের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে । মতাদর্শের প্রশ্নে চরমপন্থীরা ছিল উদারনৈতিকদের ঠিক বিপরীত । চরমপন্থীরা শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে তুষ্ট হতে না পেরে স্বশাসনের অধিকার দাবী করেন । জাতীয়তাবাদী যুবকগণের একটা ক্ষুদ্র দল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করা বা সময়ে সময়ে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টাতেও নিযুক্ত ছিলেন ।

সরকারের কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলতে থাকে এবং জনসাধারণের মনে জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হতে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশের দিকে তাকিয়ে না থেকে জনগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আত্মনির্ভরশীল হতে শুরু করে । চরমপন্থী নেতারা হিন্দুদর্শনের আন্দোলন গড়বার চেষ্টার ফলে আন্দোলন যেমন কিছুটা জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠে তেমনি তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রও দুর্বল হয়ে পড়ে । এই আন্দোলন মুসলমানদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ।

হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বদেশপ্রীতি বোধ অঙ্কুরিত হতে থাকে । হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন, বাংলা ১২৭৩ অব্দে (ইংরাজী ১২ই এপ্রিল ১৮৬৭) । এই হিন্দুমেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা । স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য । প্রথম উদ্বোধন সভায় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এই বলে 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকার্য্যের নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য — ইহা মাতৃভূমির জন্য।' বিদেশী শাসকগোষ্ঠী লক্ষ্য রেখেছেন, বাঙ্গালী জাতি এতকাল যে সব বিভিন্ন ব্যাপারে ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না । কিন্তু স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য নেতারা যখন আন্দোলন শুরু করেন, তাঁরা দেখলেন তাঁদের সাম্রাজ্যের স্বার্থ সত্য সত্যই তাতে বিপন্ন হতে চলেছে । তখন ইংরাজ সরকার বিভেদনীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় । ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন লর্ড কার্জন । তিনি বুদ্ধি দিলেন, বাঙ্গালীর প্রভাব থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে হলে তার একমাত্র উপায় হল বাঙ্গালী জাতিকে দুভাগে ভাগ করে দুর্বল করে দেওয়া । তখনকার বাংলাদেশ

আকারে অনেক বড় ছিল। তাছাড়া বিহার ও উড়িষ্যা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা পাকা হল।

বিদেশী শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে তাদের সিদ্ধান্ত নিল। এই সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দুর নেতৃত্ব বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে তারা ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে গিয়ে পড়ে নিজেদের সংহতি হারিয়ে ফেলে। প্রকৃত বাংলার পূর্ব অংশকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সেখানে ছিল বাঙ্গালী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর পশ্চিমবাংলার সহিত বিহার ও উড়িষ্যাকে যুক্ত করে আর একটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হল। সেখানে বাঙ্গালী হিন্দুর চেয়ে অবাঙ্গালী হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ। ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে উভয় প্রদেশেই বাঙ্গালী হিন্দু দুভাগে বিভক্ত হয়ে সংখ্যালঘু হয়ে নিজেদের সংহতি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে।

ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে প্রগতিশীল বাঙ্গালী তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। দেশ যখন এভাবে বিপন্ন তখন দেশবাসীর মধ্যে যে গভীর জাতীয়তাবোধের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, তা থেকে বাঙ্গালী মেয়েরাও নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেনি। নেতারা সরকারী সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তর হিসাবে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এসময় বহু জাতীয়তাবোধ সূচক সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সূত্রেই রজনীকান্ত সেন তাঁর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" এবং রবীন্দ্রনাথও বহু জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সরকারের ঘোষণা অনুসারে ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ তারিখে বঙ্গবিভাগের নির্দেশটি কার্যকর হয়।

এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে সমগ্র বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠে। বঙ্গমহিলাগণ জাতির এই দুর্দিনে নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। তারাও জনমত সংগ্রহ ও দেশের এই দুঃসময়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের মুখোস খুলে দিতে বদ্ধ পরিকর হন। মহিলা-সম্পাদিত পত্র -পত্রিকার মাধ্যমে মহিলাগণ বঙ্গ-মহিলাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী

চেতনার সঞ্চার কল্পে লেখনী ধারণ করেন । সুসভ্য ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী বহু বিষয়েই উপকৃত হয়েছেন। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, নারীজাতীর অবরোধপ্রথা, অশিক্ষা প্রভৃতির ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃই হীন থেকে হীনতর স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় জনগণ ক্রমশঃই মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের উন্নত ও জীবনমুখী ভাবধারার সংস্পর্শে এসে ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার স্পৃহাও জাগ্রত হয়েছিল । দীর্ঘদিনের পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তির জন্য ভাতরবাসী তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন । ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ইংরেজ সরকারের কবল থেকে দেশের মুক্তির জন্য আরো অধিক সংগ্রামী মনোভাব নারীপুরুষ নির্বিশেষে দেখা দেয়। বঙ্গবিভাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে জনচেতনা সর্বত্র জাগরিত হয়েছিল, তার সূত্র ধরেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার করার জন্য প্রতিশ্রুত বদ্ধ হলেন । কিন্তু তাদের চিন্তা ছিল শেষ পর্যন্ত বঙ্গ রমণিগণ ব্যাপারটা পণ্ড করে না দেন । তাদের সংকল্প রক্ষায় মেয়েরা বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা মেয়েরা যদি বিদেশী বিলাসদ্রব্যের মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারেন তবে পুরুষের পক্ষে তাদের সংস্কল্পে দৃঢ় থাকা কোন মতেই সম্ভব নয় । বঙ্গমহিলাগণের অধিকাংশেরই শিক্ষা সামান্য, চিন্তার ক্ষেত্রও তত প্রশস্ত নয় এবং সূক্ষ্ম রাজনীতির মধ্যেও তাদের বিচারবুদ্ধি প্রবেশ করেনি । পুরুষের এই চিন্তা বঙ্গরমণিগণ তাদের কাজের মধ্য দিয়ে দূর করেছেন। 'ভারত মহিলা' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ— আমাদের দেশের "মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষা পায় নাই বটে, তথাপি তাঁহারা স্বদেশের কল্যাণের জন্য পুরুষদিগের পার্শ্বে দাড়াইবার অযোগ্য নহেন।.... প্রয়োজন হইলে এখনও তাহারা জননী জন্মভূমির নামে পুরুষের ন্যায়ই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন এবং বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিলাস বাসনাও বর্জন করিতে পারেন। যদি তাঁহারা তাহা না পারিতেন, তাহারা যদি পুরুষদিগের ন্যায় দৃঢ় সংকল্পের সহিত বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে

কখনই এত সহজে স্বদেশী আন্দোলন সর্ববব্যাপী হইয়া পড়িত না।"[১৫৬] সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে তিনটি বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল — (১) বয়কট, (২) স্বদেশী, (৩) জাতীয় শিক্ষা। ব্রিটিশ সরকারের কঠোর ভেদনীতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, যে সব দ্রব্য স্বদেশে উৎপন্ন হয় ইংলন্ডের সেসব দ্রব্য ব্যবহার করা হবে না। বয়কট্ অনুষ্ঠানের অঙ্গহিসাবে স্বদেশী শিল্প চালু করার জন্যও চেষ্টা চলল। স্বদেশী মূলধনে গড়ে উঠতে লাগল বহু শিল্প কারখানা - কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, সাবানের ফ্যাক্টরী, চামড়ার কারখানা, ঔষধের কারখানা প্রভৃতি। স্বদেশী বোধের তাগিদে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবী চৌধুরাণী 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্যের এক আড়ত খুললেন।

বঙ্গীয় রমণিগণের ত্যাগ স্বীকাবের জন্যই বিদেশী দ্রব্য বর্জন সহজে সম্ভব হয়েছিল। বরং অনেক স্থলে রমণিগণের উৎসাহই অধিক দেখা গিয়েছিল। এর ফলেই স্বদেশী আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পেরেছিল। এমন বহু পরিবার ছিল যেখানে পরিবারের পুরুষগণ বিদেশী দ্রব্যের প্রতি অধিক আকর্ষণ বোধ করতেন। কিন্তু মহিলারাই সেখানে বিদেশী দ্রব্য বর্জনে সহায়তা করেছেন। হাত খালি থাকলেও কখনও মহিলারা কাচের চুড়ি পরতেন না বা বিদেশী চিনি ব্যবহার করতেন না। এমনকি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করলেও বিদেশী কাপড় ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র বিদেশী দ্রব্য বর্জনেই মহিলাগণ পুরুষের সহায়তা করছেন তাই নয়, স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে বহু স্বদেশ হিতকর কর্মে মহিলারা অংশ গ্রহণ করে তা সুসম্পন্ন করেছেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস দল গঠনের পর দেশের রাজনৈতিক কাজে বহু মহিলা অংশ গ্রহণ করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ও ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে যোগ দেন এবং কলকাতা শহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী আরও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এছাড়া মহিলাগণ বহু সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত সংগ্রহ ও মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'ভারত মহিলা'তে লেখা হয় — "সর্ব্ব প্রথমেই ময়মনসিংহের মহিলাদের সভার

কথা উল্লেখযোগ্য । নারীদের মধ্যে সৰ্ব্বাগ্রে তাহারাই সভা করিয়া বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনপূর্ব্বক স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন ।"[১৫৭] বঙ্গ বিভাগের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হবার পর ময়মনসিংহের বহু মহিলা শোকচিহ্ন স্বরূপ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করতেন । একটি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সভার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে বক্তৃতা হবার সময় কয়েকজন মহিলা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে বক্তৃতা শুনতে আসেন। এর কারণ জানা গেল "বঙ্গের অঙ্গ চ্ছেদের জন্য ময়মনসিংহের কয়েকজন মহিলা শোকচিহ্ন স্বরূপ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছেন । . . . ময়মনসিংহের রমণীদিগের এই স্বদেশানুরাগ অনুকরণযোগ্য ।"[১৫৮] বঙ্গের রমণিগণ কোন ব্যাপারেই নিকৃষ্ট নন। সময় এবং সুযোগ পেলে যে কোন পরিস্থিতিতে সর্বপ্রকার কর্ম করতে সক্ষম তা ময়মনসিংহের মহিলাদের কর্ম হতেই বোঝা যায় ।

শুধু ময়মনসিংহেই নয়, এরপর কলকাতা শহরে ভদ্রঘরের রমণীদের নিয়ে একটি বৃহৎ সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল । তাতে এত অধিকসংখ্যক মহিলার সমাগম হয়েছিল যা ইতিপূর্বে আর হয় নাই । ঐ সভাতে কয়েকজন মহিলার রচনা পাঠ করা হয় যা দ্বারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল । মহিলাদের নানাবিধ বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিদেশে যেত । বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মহিলাদের মধ্যে বিলাসিতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল । সুতরাং মহিলাদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত — সভাতে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয় ।

কলিকাতা ছাড়া ঢাকা, বরিশাল, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানেও বহু সভাসমিতির মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার বৃদ্ধি পেতে থাকে । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় ভাইসরয়ের উপর কার্যত একটি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ হয়েছিল । ঐ বৎসরই ১৬ অক্টোবর বাংলার মৈত্রীর নিদর্শন স্বরূপ রাখী বন্ধন দিবস পালিত হয়। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ তারিখটিকে দুঃখের ও প্রতিবাদের দিবসরূপে পালনের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে এক বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন । সেদিন বাড়ীতে রান্না হবে না, অরন্ধন হিসাবে দিনটি পালিত হবে । জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে শোভাযাত্রীর দল গান গাইতে গাইতে জগন্নাথের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে একে অপরকে রাখী পরিয়ে দেন । রবীন্দ্রনাথ

ও রজনীকান্তের গান বঙ্গের ছাত্র ও যুবকের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে থাকে। রাখী বন্ধনের দিন তথায় পুরুষদিগের যেরূপ একটি সভা হয়েছিল তেমনি মহিলাদেরও একটি সভার অধিবেশন হয়েছিল। মহিলাগণ সেই সভায় পরস্পরের হাতে রাখি বন্ধন করেন। তাছাড়া বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করবেন না বলে সংকল্প করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্যের জন্য আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করেন।

সরলা দেবী শক্তিমন্ত্রের উপাসনার জন্য 'বীরাষ্টমী' মেলার আয়োজন করে শক্তি চর্চার উদ্বোধন করেন। দেশীয় যুবকদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি কল্পে শরীর চর্চার আয়োজন করেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি করবার মানসেই বহু আখড়ায় কুস্তিগীর নিয়োগ করে ছেলেদের ব্যায়াম চর্চায় উৎসাহিত করা হয়। এমনকি বাঙ্গালী যুবকগণ দেশের জন্য জীবন দিতেও যাতে কুণ্ঠিত না হন, তার জন্য ভারতের মানচিত্র স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়া হত। ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সরলা দেবী সঙ্গীতে অংশ নেন। 'ভারতী পত্রিকায়' 'বিদেশী ঘুষি বনাম দেশী কীল' নামে এক প্রবন্ধে যে সব ক্ষেত্রে সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছিল তার বিবরণ বেরুতে থাকে। এতদিন স্বদেশীদ্রব্য তুচ্ছ করে বিদেশের চাকচিক্যময় দ্রব্যের আকর্ষণবশতঃ স্বদেশী শিল্পকলার যে ক্ষতি হয়েছিল দেশবাসী এখন তার ভুল শুধরে নিতে বদ্ধ পরিকর। "বিদেশীয় অশন বসনে অনুরাগ ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় শিরায় শিরায় এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে এতদিন স্বদেশের দ্রব্য তুচ্ছ করে বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি অত্যধিক আদর বেড়েছিল, তার ফলে স্বদেশী শিল্প অনাদরে বিনষ্ট প্রায় হয়েছিল। সামান্য দ্রব্যের জন্যও বিদেশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হতাম। দেশীয় বস্ত্রের প্রতি আমাদের ঘৃণা বশতঃ দেশের তাঁতিকুলের অন্নাভাব উপস্থিত হয়েছিল। আমরাই আমাদের স্বদেশবাসীর ক্ষতি করেছি। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে গিয়ে প্রতিপদে বিদেশীর সাহায্য প্রয়োজন এমন অনুভূত হত। আমরাই স্বদেশের অকল্যাণ করে বিদেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত করেছিলাম।"[১৫৯]

সেই বিপদের দিনে বঙ্গরমণিগণকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় বহু তেজোদ্দীপ্ত লেখনী প্রকাশিত হতে থাকে। যাতে বঙ্গরমণিগণ স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় এই বিপদের দিনে পুরুষের

পার্শ্বে দন্ডায়মান হয়ে পুরুষের কাজে সহায়তা করেন ।

জাতীয় বিপদের দিনে জাপানের মহিলাগণ সাম্রাজ্ঞী থেকে পথের ভিখারিণী পর্যন্ত জাতির সেবা করেছেন । 'ভারতমহিলা' মন্তব্য করেছেন — রাজবংশের যে মহিলা সামান্য দ্রব্যের ভারও বহন করতে অনভ্যস্ত, তিনিও অম্লানবদনে সকল ক্লেশ সহ্য করে সামান্য সৈনিকের সেবা করেছেন । একমাত্র পুত্রের স্বদেশ সেবার অন্তরায় বলে মাতা স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন । আমরা কি এ বিষয়ে তাঁদের একতিলও অনুসরণ করতে পারব না ? এই উপস্থিত বিপদ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য সমগ্র দেশে যে জীবন্তভাব দৃষ্ট হচ্ছিল নারিগণ তাতে কেন যোগদান করবেন না ? প্রাতস্মরণীয়া তেজোদৃপ্তা আর্য্যরমণিগণের দেশে জন্ম গ্রহণ করে আমরা কেন মৃতের ন্যায় থাকব ? রমণিগণ স্বদেশানুরাগে পুরুষদিগের পশ্চাতে পড়ে থাকবেন কেন ? তাঁরা পুরুষদিগের সহিত মিলিত হয়ে স্বদেশের কল্যাণসাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হলে পুরুষেরা কখনও এই শুভ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হবেন না । আমরাও তবে স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে "স্বদেশী দ্রব্য পাইলে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না এবং যে দ্রব্য স্বদেশে না পাওয়া যায় তাহা অন্য দেশ হইতে ক্রয় করিব, তথাপি ইংলন্ড জাত দ্রব্য ব্যবহার করিব না ।"[১৬০] এই ডাকে সাড়া দিয়ে মহিলাগণ কাতারে কাতারে মাতৃভূমির সেবায় যার যতটুকু সামর্থ্য এগিয়ে আসেন ।

সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে বাঙ্গালীকে যে কয়েকটি কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে একটি হল বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র পেলে রন্ধনশালার বাইরেও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন সুশিক্ষা ও সুযোগ পেলে, উপযুক্ত অবস্থায় পড়লে মহিলারা বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাড়িয়ে স্বদেশের কাজেও আত্মোৎসর্গ করতে পারেন । কিন্তু এতদিন একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। রমণীদের উচ্চশিক্ষা ও অবস্থার উন্নতির কথা হলেই আমাদের দেশের অনেকে বলতেন, "আমাদের মেয়েরা ত বেশ আছে । তাহারা স্বামীকে ভালবাসে, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে, সন্তানদিগকে স্তন দান করে, — তাহাদের অভাব কি ? তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার চেষ্টা কেন ? তাহারা কি কানে কলম গুজিয়া কেরাণী সাজিয়া অফিস করিবে ? মেয়েদের ঘর হইতে আবার বাহিরে

ডাকা কেন ?"[১৬১]

বাঁকিপুরের পেনসনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে শহরের অনেক উদার প্রকৃতির বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী পুরুষকে নিমন্ত্রণ করে তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি ও প্রার্থনায় মহিলাগণ তাঁদের স্বদেশভক্তি ও অন্তরের উচ্চাভিলাষ ব্যক্ত করেন এবং স্বদেশের কাজে নারীদের সঙ্গী করে নিতে অনুরোধ জানান। সেই অনুষ্ঠানে মহিলাগণ যে সকল সঙ্গীত গেয়েছিলেন তার মধ্যে একটির কিছু অংশ ঃ

" সঙ্কল্প লইব নব, বোনেরা সহায় হব.
ভাই যবে দিবে প্রাণ স্বদেশের তরে,
যদি মানবের দুঃখে, ভাই থাকে ম্লান মুখে,
বোনেরা করুণা লয়ে যাবে ঘরে ঘরে ।"[১৬২]

স্বদেশবাসীর উন্নতি এবং তাদের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হলে চাই পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। জাপানিগণ স্বদেশের উন্নতির জন্য শুধু পুরুষদিগকেই বিদেশে সুশিক্ষার জন্য পাঠান নাই, একদল রমণীকেও আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। রমণীদের সাহায্যেই জাপানের সর্বত্র স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। তাঁরাই সন্তানদের হৃদয়ে জাতীয় গৌরব স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং স্বামী ও সন্তানদের স্বদেশের মঙ্গলের কাজে সাহায্য করেছিলেন। জাপানের রমণিগণের ন্যায় বঙ্গীয় রমণিগণও সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হলে স্বদেশের অনেক অভাব ও দুর্গতি দূর হবে। মাতা সুশিক্ষা না পেলে সন্তানের সুশিক্ষা কিছুতেই সম্ভব নয়। কলকাতায় মহিলাগণের স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক একটি সভা আহুত হয়েছিল। নাটোরের মহারাণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী এই সভায় সভাপতি এবং বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু সেই সভার সম্পাদিকা হয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশে স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশঃই গভীর দানা বাধতে থাকে। এইভাবে ১৯০৩ থেকে ১৯১০ সাল এই ক'বছরের মধ্যে একটি গণআন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রায় দু-হাজার জনসভা

অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৌলবী মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে 'দি মুসলমান' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদকেরা সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন : *It is our economical and political situation that make all of us Indians and so far as we have to live our practical lives, we are Indians first and Mohamedans afterwards.*[১৬৩] এই পত্রিকাটি মুসলমান সম্প্রদায়কে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করে। ১৯০৭ সালের ১লা মে এক বিরাট জনতা, ছাত্র, রেলশ্রমিক ও কৃষক রাওলপিন্ডিতে সমবেত হন। এখানকার আদালতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫ জন কর্মীর বিচার চলছিল। এই গণপ্রতিবাদ এক অভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করেছিল। ১৯০৮ সালে তিলককে যখন ছয় বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল তখন বোম্বাইএর শ্রমিকেরা এই কারাদন্ডের প্রতিবাদে দু-দিন ধরে প্রতিবাদ করেছিল। এতে মহিলাগণও যোগদান করেছিলেন।

এই স্বদেশী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গৌরব — এই আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। পুরুষের পাশে থেকে মহিলারাও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

বাঙ্গালীর দুর্নাম আছে যে বাঙ্গালী বক্তৃতা করে, মাদ্রাজী শোনে, আর বোম্বাইবাসী কাজ করে। সর্বসাধারণেরও এতদিন ইহাই ধারণা ছিল। আমাদের মধ্যে যে বিরাট কর্মশক্তি লুকিয়ে আছে আমরা নিজেরাও তা কখনও বুঝতে পারিনি। এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমাদের নিদ্রিত আত্মশক্তি জেগে উঠেছে। সকলে অনুভব করতে শুরু করেছে যে, বাঙ্গালী কেবল বাক্‌সর্বস্ব নয়, আমরা নিজেরাও বুঝেছি যে আমরা ইচ্ছা করলেই অনেক কাজ করতে পারি। বঙ্গনারীর মোহনিদ্রাও যেন একটু ভেঙ্গেছিল। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে নারিগণ মিলিত হয়ে যেরূপ স্বদেশানুরাগ দেখিয়েছেন, এদেশে পূর্বে কেহ কখনও সেরূপ দেখেনি। এই আন্দোলন বাঙ্গালী জাতিকে যেন উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর করে দিয়েছিল। স্বদেশ প্রীতি মৌনকে বক্তা, অলসকে কর্মী ও কৃপণকে দাতা করেছে এবং জাতীয় চরিত্রের জড়তা অনেকটা দূর করতে সমর্থ হয়েছিল। পরধীনতা আমাদের জাতীয়

চরিত্রের মেরুদন্ডকে যেভাবে ভগ্ন করে দিয়েছিল তাতে কোন বিষয় দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা ছিল আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন । তাই "ভগ্নীগণের নিকট নিবেদন এই, সকলে কর্ত্তব্যে, সংকল্পে দৃঢ় থাকুন, বঙ্গনারীর স্কন্ধে বিধাতা এবার অতি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন ।"[১৬৪]

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া নেতারা ব্রিটেনের যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলে মনে করতেন। তাঁদের মনোভাব ছিল ব্রিটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করলে ইংরেজদের অনুগ্রহে হয়ত ভারত স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর হতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে কংগ্রেস নেতাদের আশাভঙ্গ হতে বেশী দেরী হয়নি । যুদ্ধের ফলে দেশের জনসাধারণের জীবনে দেখা দিল চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় । মহাত্মা গান্ধী এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের চম্পারণে ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের সমর্থনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সফল হন। পরিশেষে নীলচাষীদের উপর থেকে পীড়নমূলক ব্যবস্থাটি রহিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজির নেতৃত্বে গুজরাটের আমেদাবাদ ও খেদায় ঐ ভাবেই আন্দোলন করে গরীব প্রজাদের রাজস্বের হার মকুব হয় ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ রাওলাত আইন পাশ হলে সারা দেশ ব্যাপী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় । এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতারা । ঠিক হল এই অসহযোগ আন্দোলন হবে অহিংস আন্দোলন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত অহিংসার চৌহদ্দির মধ্যে এই আন্দোলনকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়নি ।

১৯১৯ এ অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বেপরোয়া গুলি চালনা করে । এর ফলে বহু হতাহত হয়। ১৯১৯ এর ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে এক বিরাট গণ অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। কতকগুলি ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি লুঠ হয় । অনেক ইউরোপীয়কে প্রহার করা হয় এবং কয়েকজনকে হত্যা পর্যন্ত করা হয় । সরকারী অফিস ভেঙ্গে তছনচ করে দেয়া হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যা কান্ডের পরে পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষ

ঘোষণা করলেন—১০ই এপ্রিলের অমৃতসরে গণঅভ্যুত্থানের যোগ্য শাস্তি হিসাবেই নাকি এই হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঘটনার গতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভীত হয়ে পড়লে ১৮ই এপ্রিল গান্ধীজি সাময়িকভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন একই সংগ্রামের মঞ্চে মিলিত হয়।

এইসময় প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রাজপুত্রের অভ্যর্থনা বয়কট করে কলকাতায় বড় আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বাঙলা আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু হঠাৎ গান্ধীজি হিংসার অজুহাতে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলে বাঙলা গান্ধীজির এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে। বাঙলার নেতারা গান্ধীজির মত মানতে রাজি হলেন না। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি নরমপন্থী নেতাদের বিরোধী ছিলেন। রাওলাত আইন পাশ হলে বাংলাদেশ থেকে প্রচন্ড প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এটি ছিল দমন মূলক আইন।

দেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে বঙ্গরমণিগণও নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গোটা জাতির চিত্তকে বিপুলভাবে দোলা দিয়েছিল। তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সমগ্র ভারতব্যাপী নারী আন্দোলনে। জাতির অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত মুক্তির জন্য লালায়িত না হলে অন্তঃপুরচারিকার দল এমনভাবে যুগযুগান্ত সঞ্চিত সংস্কারের সুদৃঢ় আবেষ্টন অতিক্রম করে বাইরে এসে দাড়াতে পারত না। বিক্রমপুরের পল্লীপথে পল্লীদুহিতাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল—ভারত কি চায়?— 'স্বাধীনতা'। তখন স্বতঃই মনে হয়েছে—দিন আগত ঐ।

১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়েও বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে মহিলাগণ স্বেচ্ছাসেবী ভাইদের সাহার্যার্থে গভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেছেন। দীর্ঘদিনের অবরোধপ্রথা ভঙ্গ করে রমণিগণ পথে বাহির হয়েছেন। ১৯৩০ এর এপ্রিলে— আইন অমান্য আন্দোলনের প্রারম্ভে — কাঁথিতে লবণ আইন অমান্যের জন্য ঢাকা থেকে প্রেরিত স্বেচ্ছা-সেবকদলের যাত্রা শুরু

হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে মহিলাদের ভিতর একটা সাড়া পড়ে যায় । এইসব স্বেচ্ছা-সেবকদের যাত্রাপথে যখনই যে গ্রাম পড়েছে তখনই সেখানকার মহিলারা সমবেত হয়ে সত্যাগ্রহীদের মাল্য-চন্দন উলুধ্বনি ও আশীর্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করে তাদের প্রাণের প্রথম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন । কেবল যে উচ্ছ্বাসবশেই মহিলাগণ এরূপ করেন নি, তা কয়েকমাস পরেই বোঝা গেল যখন বিক্রমপুরের চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ ও ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনে মহিলাগণ প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করেন ।

আন্দোলনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ।এই অর্থ সংগ্রহের জন্য বিক্রমপুর অঞ্চলের আশে পাশের বিভিন্ন গ্রাম — হলদিয়া, কনকসার, ভাগ্যকুল, বাহেরক, মিতারা, নশঙ্কর, হাসাইল, নয়না, রাউতভোগ, তাজপুর, আবীর পাড়া, রসুনীয়া, জৈনসার, ইছাপুর, মালখাঁনগর, পাইকপাড়া, আউটসাহী, সিলিমপুর প্রভৃতি গ্রামের মহিলাগণ লবণ সত্যাগ্রহের জন্য অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ এবং দান করেন।[১৬৫] এছাড়া বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্থ ও মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন । "কিন্তু যেসব অবরোধ বাসিনী নারী লজ্জা ও সঙ্কোচে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছেও বাহির হইতে কুণ্ঠিতা হন, তাঁহাদের জাতীয় পতাকা হাতে লইয়া দলে দলে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া অর্থ ও মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করার ভিতর দিয়া প্রাণের একটা প্রবল আবেগই প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু গৃহে গৃহে নয়, হাট বাজারের ভিতরে যাইতেও ইঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই ।"[১৬৬]

এছাড়া বিভিন্ন সভা ও শোভাযাত্রাতে যোগদানের জন্য পল্লীর মহিলারা গ্রামের পথ ধরে পায়ে হেটে কখন কখনও ৪/৫ মাইল দূর থেকেও এসে সভায় যোগদান করেছেন, আবার রাত্রি ৮/৯ টার সময় বাড়ী ফিরেছেন, এটা কোন হুজুগের বশে নয় । 'দেশের কথা' জানবার ও শুনবার জন্য রাত্রের অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কিছুই তাদের উৎসাহকে খর্ব করতে পারেনি — "ভারতের মুক্তি, জগতের শান্তি এস এস সৈনিক, ডাকিছেন সেনানী ।"

"কারাগারে যেতে হবে, - দেশের তরে মরতে হবে, বুকের রক্ত দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে ।"[১৬৭]

এইসব উন্মাদনাময় ধ্বনি করতে করতে মহিলাগণ পথ অতিক্রম করতেন।

একে শুধু উচ্ছ্বাস বা বহিরাড়ম্বর বলা উচিত হবে না। কোলের শিশুও মায়ের সঙ্গে এই বাণী উচ্চারণ করেছেন, ইহা কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাসে শেষ হবার নয়।

বিক্রমপুর অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে আউটসাহীর শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা গুপ্তা, জৈনসারের শ্রীযুক্তা হিরণবালা সেন, জোড়াদেউলের কিরণবালা রুদ্র, পাইকপাড়ার শ্রীযুক্তা বিরজা বসু, হলদিয়ার শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী, পারুলবালা চন্দ, স্নেহলতা রায়, ননীবালা চন্দ প্রভৃতি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও বিদেশী বর্জ্জন ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বক্তৃতা করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছেন।[১৬৮]

বিক্রমপুরে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ ও ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলনেও মহিলাগণ যথেষ্ট কাজ করেছেন। মহিলারা ইউনিয়ন কোর্ট পিকেটিং করতে যাবার সময় পুলিশ এসে মার পিঠ করতে পারে এইরূপ জনরব উঠলেও মহিলারা তাতে বিচলিত হননি। গ্রেপ্তারের জন্য মহিলারা বাড়ী থেকেই প্রস্তুত হয়ে গিয়াছেন। বি ক্রমপুরের মহিলারা মাতৃভূমির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপদের ঝুকি নিয়ে গৃহকোন থেকে বেড়িয়ে এসেছেন সেটা কম গৌরবের নয়।

মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দশায় ব্যথিত হয়ে কাতারে কাতারে নারীপুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আজ তার হিসাব কজন রাখে? ভাই এর পাশে বোন এসে না দাড়ালে অত সহজে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হত না। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, এমনকি যে নিরক্ষর সে মহিলাও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। বিক্রমপুর অঞ্চলের কাছাকাছি মালিকান্দা নামক স্থানের এক ছুতোর পল্লীর একটি ঘটনা — সেখানকার অধিবাসীগণ চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে না পাবার জন্য তাদের মাল ক্রোক হয়েছে। অতি দীনহীন অবস্থা তাদের। অতি অপ্রশস্ত একচালা, —পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা কোনো রকমে মাথা গুঁজবার স্থান। দুইচারখানা পিতল ও কাঁসার থালা, দু'একটি বাল্‌তি ও লোহার কড়াই, দুচার খানা তক্তা, এই গৃহস্থের সম্বল, ঘরের আসবাব। চৌকীদারী ট্যাক্স বার আনা, এক টাকা, এক টাকা চার আনা এই রকম। তা সময়মত না দিতে পারার জন্য ঐসব দরিদ্রের দরিদ্রতর সম্বল বিক্রী করে ৩/৪ কি ৫/৭ টাকা হয়ত পাওয়া যেতে পারে — তাই নিয়ে গিয়েছে।

তারা যে কত দরিদ্র তা তাদের গৃহের আসবাবপত্রের বর্ণনায় বোঝা

যায়। তাদের মনের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় । কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনের জোর ও দেশের প্রতি ভালবাসা তাদের কথাতে তার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় । একটি সর্বহারা গৃহস্থ ছুতোর বধূর কথায় তাদের মনোবল যে কতখানি তা ধরা পড়ে। তাদের মনের অবস্থা জানতে চাওয়া হলে একটি গৃহস্থ বধূর উত্তর এরূপ — "তা মা, চোর ডাকাতেও তো নিয়ে যায়, এও মনে করি তাহাই হইয়াছে ।" যত দরিদ্রই হউকনা কেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে এই যে ক্ষতি, তাহা তা'র প্রাণে কিছুই ক্ষোভের সৃষ্টি করে নাই । সেই 'অ-শিক্ষিত' ও 'অজ্ঞান' বলিয়া অজ্ঞাত সূত্রধর দুহিতার উত্তর শুনিয়া হৃদয় একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল।"[১৬৯]

নবাবগঞ্জ - গালিমপুর অঞ্চলের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যা 'জয়শ্রী'র পাতায় পাই । ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন সম্পর্কে সেখানে যখন আন্দোলন হয়, তখন সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের গুরুপত্নী শ্রীযুক্তা মোক্ষদা দেবী শিষ্যকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করে । কিন্তু শিষ্য অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি তার বাড়ীতে তিনদিন অনশনে কাটাবার পর গ্রামের সকলে মিলে প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবে এই আশ্বাস দেওয়ায় শ্রীযুক্তা মোক্ষদা দেবী অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে গ্রামবাসীরা একাজে সক্ষম হলেন না তখন শ্রীযুক্তা মোক্ষদা দেবী শিষ্যের বাড়ীতে ৭দিন পর্যন্ত 'ধন্না' দিয়ে অনশনে কাটান । ফলে উক্ত প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেন । দেশের প্রতি অনুরাগ এবং শিষ্যকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবার ইচ্ছাবশতঃ শ্রীযুক্তা মোক্ষদা দেবীর এই যে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' রূপ দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাই তখন তাহাতে সকলেরই হৃদয় উদ্যমে পরিপূর্ণ হয় ।[১৭০]

বিক্রমপুর অঞ্চলের রমণিগণের তেজস্বিতা, একনিষ্ঠতা ও স্বদেশপ্রীতি অনুকরণযোগ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যে ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছেন তা স্বদেশ প্রীতির পরিচয় বহন করে । গৃহকর্ম সমাপন করে কোলের সন্তানকে কাঁধে নিয়ে পল্লীগ্রামের দীর্ঘপথ পায় হেটে অতিক্রম করে মহিলাগণ যে ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ড ও কোর্ট পিকেটিং করেন তাতে তাদের নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায় ।

বিক্রমপুর অঞ্চলের পাইকপাড়ার মহিলাগণই সর্বপ্রথম বোর্ড ও কোর্ট পিকেটিং আরম্ভ করেন। এইখানে শ্রীযুক্তা বিরজা বসু ও কিরণবালা রুদ্র প্রমুখ বহু মহিলা ইউনিয়ন বেঞ্চ পিকেটিং করার ফলে পাইকপাড়ার প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারগণ সকলেই পদত্যাগ করেন ও কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা কোর্ট পিকেটিং করার সময় একদিন S.D.O প্রভৃতি যান। তখন মহিলারা দ্বার অবরোধ করে দাঁড়িয়ে S.D.O প্রভৃতির নানা প্রশ্নে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে যে সমুচিত উত্তর প্রদান করেন তাতে তাঁদের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।[১৭১]

মহিলাগণ যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কোর্ট পিকেটিং করেন তা নজীরবিহীন। মালখাঁনগরের শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা গুহ, বিধুমুখী সেন, প্রফুল্লময়ী বসু, মৃনালিনী গুহ, স্বর্ণময়ী বসু, নীহার বসু, লতিকা বসু ও মালবদিয়ার তিনজন মহিলা বেতকা ইউনিয়ন বেঞ্চ এবং রাইপুরার শ্রীযুক্তা বিরজা বসু, কুমারী বাদল প্রভা বসু, মলিনা ধর, নলিনী দেবী, সন্ধ্যা বসু, প্রফুল্ল বালা বসু প্রভৃতি ও প্রথমোক্ত মহিলাগণ বয়রাগামী কোর্ট পিকেটিং করেন। এদের প্রচেষ্টায় বেতকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তিনজন মেম্বার এবং বয়রাগাদীর প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চারজন সভ্য পদত্যাগ করেন।[১৭২]

পদত্যাগ করানোর জন্য অনেক সময় মহিলাগণ মেম্বারদের বাড়ী গিয়ে প্রাতে বসেছেন, সারাদিন জল স্পর্শ না করে নানাযুক্তি প্রদর্শন ও অনুরোধ ইত্যাদির দ্বারা অপরাহ্নে পদত্যাগ স্বীকার করিয়ে তবে বাড়ী ফিরেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে তৎকালীন একজন কংগ্রেস কর্মীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য — "কি শোভাযাত্রা ও অর্থাদিসংগ্রহ, কি কোর্ট পিকেটিং, কি মেম্বারদের পদত্যাগ করানো, কংগ্রেসের সব কাজই, এদের কাজ বলা যায়, এঁরা তো সবটাতেই সৰ্ব্বময়।"[১৭৩]

তাজপুর-রসুনিয়া ও আবীর পাড়াতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দে সরকার, উত্তমাসুন্দরী মজুমদার, রাধারানী পাল, অমিয় সরকার প্রভৃতি সেখানকার মেম্বারদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের পদত্যাগ করান এবং তাঁরা রসুনিয়া ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করার ফলে সেখানকার কোর্ট বন্ধ হয়।[১৭৪]

এইসব স্থানের মহিলারা চারিদিকের গ্রাম সমূহের মহিলাদের নিয়ে যেরূপ বিরাট শোভা যাত্রা করে সর্বত্র উদ্দীপনা সঞ্চারে সাহায্য করেছেন সেরূপ অন্যত্র

খুব কমই হয়েছে । এখানকার শ্রীমতী অমিয় সরকার, পারুল সরকার প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবিকা বালিকারা প্রত্যহ প্রভাতফেরী ও চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য অনুরোধ সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বদা সমভাবে কাজ করেছেন ।

কামার খাড়াতে - বাহেরকের শ্রীযুক্তা সুরমা দেবী, কামারখাড়ার শ্রীযুক্তা বিনোদিনী বসু, সরোজিনী বসু, মনতোষিণী ঘোষ ও কুসুমকুমারী ঘোষ প্রভৃতি ও যশোলঙের শ্রীমতী বিজনপ্রভা দেবী ও উমালক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি ইউনিয়ন কোর্ট পিকেটিং করেন— ফলে কোর্ট বন্ধ হয় ।[১৭৫]

'জয়শ্রী'র সৌজন্যে আমরা আরো বহু মহিলার কর্মকান্ডের বিবরণ জানতে পারি — ব্রজযোগিনী ইউনিয়ন কোর্টে শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু, সুকুমারী সরকার, কিরণবালা দেবী, কুমারী বিভারাণী বসু প্রভৃতি পিকেটিং করেন । ফলে এই স্থানের প্রেসিডেন্ট ও তিনজন মেম্বার পদত্যাগ করেন ।[১৭৬]

কুঁকুটিয়া গ্রামেও মহিলাগণ সেখানকার ইউনিয়ন কোর্ট পিকেটিং করেন ।[১৭৭] হলদিয়াতে মহিলাগণ কোর্ট পিকেটিং এর সময় বহু সংখ্যায় কোর্টের দ্বারদেশে বসে তক্‌লিতে সূতা কাটতেন । প্রেসিডেন্ট, দফাদার ও চৌকীদার সহ তথায় প্রবেশ করতে গিয়ে মহিলাদের পিকেটিং এর ফলে ফিরে আসতে ও কোর্ট বন্ধ রাখতে বাধ্য হন।[১৭৮] এখানকার মহিলারা আন্দোলনের গোড়া থেকে সত্যাগ্রহীদের টাকার তোড়া, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দান থেকে আরম্ভ করে শোভাযাত্রা, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও চরকা প্রচলন ইত্যাদি যথেষ্ট কাজ করেছেন । শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী, ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়, স্নেহলতা রায়, ননীবালা পাল, সুধাংশু বালা সাহা, কুমারী চঞ্চলকুমারী চন্দ, সরযূবালা রক্ষিত, শান্তিময়ী দেবী, জ্যোতিরাণী দত্ত, পারুলবালা চন্দ, সুরবালা সাহা, জ্যোৎস্নালতা চন্দ, রেণুকাবালা মিত্র প্রভৃতি মহিলা ও বালিকারা এই অঞ্চলে বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করেছেন ।

এই গ্রামের মহিলাদের সম্পর্কে জনৈক কর্মী লিখেছেন —"এই গ্রামের মহিলারা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আন্দোলনকে জয়শ্রী মন্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের সাহায্য ব্যতীত এখানে আন্দোলন এতদূর সাফল্যমন্ডিত হইতে পারিত না ।"[১৭৯] এই কথাগুলি বিক্রমপুরের অন্যান্য মহিলা-কর্মীদের সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে । বিক্রমপুরে এমন কোন কংগ্রেস কমিটি আছে কিনা সন্দেহ যা

বিশেষভাবে মহিলাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়নি ।

মদগাঁজার দোকানে পিকেটিং সম্পর্কেও কোন কোন গ্রামে মহিলারা কাজ করেছেন । সিরাজদীঘা বাজারে আবীর পাড়ার শ্রীযুক্তা কিরণশশী নন্দী, নিকুঞ্জবালা নন্দী, কিরণবালা কুন্ডু মদ গাঁজার দোকান এবং শেখরনগরে শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ ও শ্রীমতী হেনা দেবী প্রভৃতি বালিকা স্বেচ্ছা-সেবিকাগণ গাঁজার দোকান পিকেটিং করেন । বাজারের মাঝখানে এইসব মহিলা ও বালিকারা যেভাবে পিকেটিং করেছেন তাতে পল্লীসমাজে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে।

চরকা ও খদ্দর সম্পর্কেও আন্দোলনের সময়ে কোন কোন গ্রামের মহিলারা বিশেষ উদ্যোগী হ'য়ে কাজ করেছেন । এই বিষয়ে বাঘিয়া, কামারখাড়া, নয়না প্রভৃতি গ্রামের মহিলাদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব স্থানে চরকা দ্বারা বস্ত্র সম্পর্কে গ্রামকে স্বাবলম্বী করবার জন্য মহিলারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । বাঘিয়াতে চরকা কাটুনীর সংখ্যা ৫০, কামার খাড়াতে ২৫, ও নয়নাতে ৭০। নয়নাতে ছয়মাসের মধ্যে ৬০ খানা খদ্দর নিজেদের সূতায় তৈরী করা হয় । এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাঘিয়া, কামার খাড়া, নয়না, তাজপুর, আউটসাহী, সিলিমপুর, মালখাঁনগর, হলদিয়া, শেখরনগর, মধ্যপাড়া প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি 'মহিলা-সমিতি' গঠিত হয় এবং মিতারা বাঘরা প্রভৃতি স্থানে কোন সমিতি গড়ে না উঠলেও মহিলারা উৎসাহের সহিত কাজে অগ্রসর হয় ।[১৮০]

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের মহিলাগণ দেশের দুর্দিনে যেভাবে পুরুষ ভাইদের পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন এবং নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তাতে বঙ্গরমণিগণের গৌরব অনেকগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে । বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর কাছে, স্বদেশবাসীর কাছে নারী তার আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন । যে হীনতাবোধ এতদিন তাদের কুরে কুরে খাচ্ছিল, আজ নারী তার শক্তির পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন , নারী যে অবলা নয়, সবলা, উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পেলে তার নিজের জয়ধ্বজা নিজেই উড্ডীন করতে সক্ষম, কর্মের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় ক্রমেই দিচ্ছেন । পুরুষের পাশে নারী তার ছায়াসঙ্গিনী না হলে পুরুষের শক্তির বিকাশও পুরোপুরি হত না। স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু মহিলা স্বামী-পুত্রের আকর্ষণও অনেকক্ষেত্রে ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগের

মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। অনেক সময় দেখা গেছে কোলের শিশুপুত্রের বন্ধন পর্যন্ত ত্যাগ করে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে নারী নিজেকে সমর্পণ করেছেন। পুরুষের একার চেষ্টায় দীর্ঘদিনের পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশ কখনও মুক্ত হতে পারত না, যদি না নারী তার ত্যাগের মধ্য দিয়ে পুরুষের কাজকে সহজ সরল করে তুলতেন। কখনও নীরবে, কখনও সরবে পুরুষের পাশে থেকে পুরুষের চলার পথকে মসৃণ করে তুলেছেন। নারী যে শক্তিরূপিণী, একথার সত্যতা তার কাজের মধ্যে পরিস্ফুট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

ঙ) ধর্মজীবন :

গত শতকের তিরিশের দশকে বাংলাদেশের সমাজের উপর দিয়ে একটা ছোট খাট ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঝড়ের দাপট ছিল প্রধানতঃ কলকতা শহর ও তার উপকণ্ঠ। পাশ্চাত্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মচেতনা, আমাদের দেশের তরুণচিত্তকে স্বদেশের মাটি থেকে বন্যাস্রোতের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল। 'ইয়ংবেঙ্গল' বা 'ডিরোজিয়ান' নামে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশের সবকিছুকে নস্যাৎ করে বিদেশী সভ্যতা ও ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার সমাজ, ধর্ম, কৃষ্টি,সভ্যতা ও আচার বিচারের প্রতি সরোষে ও সদম্ভে নিজেদের অস্থির চিত্ততার স্বাক্ষর রাখল। ডিরোজিয়দের প্রবর্তিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র (১৮২৮-২৯) বিচার বিতর্ক থেকে এই বিরোধের বিদ্যুতাভাস পাওয়া গিয়েছিল। প্রবীণ রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ তরুণদের এই মতিগতি দেখে রীতিমত বিচলিত হয়েছিলেন। এই বিরোধের বীজ যে কেবল বিদেশ থেকে আমদানি আদর্শের সঙ্গে ঘটেছিল তাই নয়, বরং এই নব্য ইংরাজী শিক্ষিত তরুণদের মনে তার চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে ছিল স্বদেশীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি বিজাতীয় অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা।

এইসময় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্বদেশীয় নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনার জন্য আগ্রহ দেখা দেয়, এবং যতদূর জানা যায়, রামমোহন রায়ের উদ্‌যোগে ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। তার আগে স্যার উইলিয়ম জোন্স এর উদ্‌যোগে ১৭৮৫ সালে বাংলাদেশে 'এসিয়াটিক

সোসাইটি' নামে একটি প্রাচীনতম বিদ্বৎসভা স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৫ বছর 'এশিয়াটিক সোসাইটি' *''Represented the elite of the European community in Calcutta at that time''*[১৮১] সেদিক থেকে রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা'ই সামাজিক সভা বা বিদ্বৎসভার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে ধরে নিতে হয়। 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নব্যশিক্ষার আদি কেন্দ্র হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার দু-বছর আগেই। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে এই ধরণের সভাসমিতি প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা দেয়, কেবল তরুণেরাই নয়, প্রবীণেরাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে সভাসমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এইভাবে 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৮) শিক্ষিত নবীনদের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন (১৮২৮-২৯), গোঁড়া হিন্দুদের 'ধর্মসভা' (১৮৩০), শিক্ষিতদের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' (১৮৩২), 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) প্রভৃতি সভা -সমিতি গড়ে ওঠে।

১৮৩৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'-র আদর্শেই জন্মলাভ করেছিল। ধর্মসংস্কার ছিল এর প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও অন্যান্য আরো বহু মহৎকর্ম ছিল তার আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। উনবিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে হিন্দুধর্ম এমন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল যা ইতিপূর্বে বোধহয় আর কখনও হয় নি। শ্রীচৈতন্য ও সমকালীন পন্ডিতেরা যে ধর্মসংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, উনবিংশ শতকের ধর্মসংকট কতকটা তার সঙ্গে তুলনীয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ও অপচয়ের ফলে এবং তৎসঙ্গে বহিরাগত ইসলামের হিন্দুবিদ্বেষ যুক্ত হয়ে হিন্দুধর্ম এক গভীর সংকটের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল এবং তারই প্রতিরোধকল্পে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে রামমোহন রায়ও অনুরূপ ধর্মসংকটের সম্মুখীন হন। তখন হিন্দুধর্মের ভিতরে অনাচার, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলা এমন ভাবে দাঁনা বেঁধে উঠেছিল, তার সঙ্গে বহিরাগত খৃষ্টধর্মের প্রচারকগণ হিন্দুধর্মের কুৎসা রটনায় এমনভাবে মেতে উঠলেন যা রামমোহন রায়কেও গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। এর ফলে তিনি ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেই হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ও

সংস্কার সাধনে উদ্বুদ্ধ হন ।

তখন হিন্দুধর্মের সংকট ত্রিমুখী হয়ে উঠেছিল । বিদেশী ও বিপরীত ধর্মীদের আক্রমণ, হিন্দুধর্মের ভিতরকার গোঁড়ামি কদাচার ও কুসংস্কার এবং তৎসঙ্গে স্বদেশে নব্যশিক্ষিতদের স্বধর্ম বিদ্বেষ । এই ত্রিমুখী ধারার বিরুদ্ধে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' একাই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে। সুতরাং ধর্মসংস্কার 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রধানতম কর্তব্য কাজ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ১৭৬১ শকের ২১ শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়েছিল (ইংরাজীর ১৮৩৯)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার মত্ততায় বাঙ্গালী ছাত্রদের মনে স্বদেশী বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়েছিল । তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী দেশের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছিল এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য অনুকরণই উন্নত Culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল। .... প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খ্রীষ্টান ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন ।.........

সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন । যদিচ প্রচলিত ধর্মসংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই দেশের ধর্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । . . . . তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ-উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞান তত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করেন । আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম হইতে স্বধর্মে ও বিদেষী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন ।"[১৮২] খ্রীস্টান পাদরী ও তরুণ ইয়ংবেঙ্গল দলের প্রচারের ফলে দেশের সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব যেমন প্রকাশ পাচ্ছিল, তেমনি কিছু লোক নাস্তিক ও কিছু খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেন । বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করার জন্যই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব ঘটেছিল । ইসলাম ধর্ম্মের আবির্ভাব সময়েও দেখা যায় যে দক্ষিণ ভারত থেকে উদ্‌ভূত শঙ্করাচার্য্যের 'অদ্বৈতবাদ' একশ্বেরবাদী ইসলামের গতিকে রুদ্ধ করেছিল । ঊনবিংশ শতকেও একশ্বেরবাদী খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম এই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

রামমোহনের বিদেশযাত্রা ও ব্রিষ্টলে মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন একেবারেই ঝিমিয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে গোটা বঙ্গদেশে খ্রীষ্টান মিশনারিদের অপপ্রচার ও নব্যশিক্ষিতদের স্বধর্মের প্রতি বিদ্বেষ এতই ঘোরতর হয়েছিল যার ফলে বঙ্গদেশে একটা নৈরাজ্যবাদী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপনের কাহিনী দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি লিখেছেন ঃ "যখন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল, এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম প্রচার করিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। প্রথমে আমার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এবং ভ্রাতাদ্দিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম।.... আমরা সেই কৃষ্ণাচতুর্দশীতে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া একটি সভা স্থাপন করিলাম।..... আমি প্রস্তাব করিলাম যে এই সভার নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী' হউক এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন, এবং তাহাকে এই সভার আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলাম, তিনি এই সভার 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামের পরিবর্তে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম রাখেন। এই রূপে ১৭৬১ শকে ২১ শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সংস্থাপিত হইল।" [১৮৩]

খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেবদের অপপ্রচার ও নৈরাজ্যবাদী যুবকদের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী আচরণের প্রত্যুত্তরে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমে এর সভ্যসংখ্যা কম হলেও পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে এর সভ্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে সমাজের সর্বজনস্তরের মানুষেরই নোঙরহীন মন ও দিগ্‌ভ্রান্ত চিত্ত এই সভার মধ্যে আলোকোজ্জ্বল দীপের সন্ধান পায়। এই সভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কবি ঈশ্বরগুপ্তের মত সল্পশিক্ষিত স্বভাব কবি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত নির্ভীক সমাজ সংস্কারক, রামগোপাল ঘোষের মত ডিরোজিয়ান, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত স্বধর্ম নিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মত

বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবী 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ।

১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় । দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ ''আমি ভাবিলাম 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অনেক সভ্য কার্য্য সূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন । তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না । সভায় কি হয় অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক । আর রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রাহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক । . . . . . আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারের সংকল্প করি । . . . . বেদবেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল ।''[১৮৪]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারিত হবার চারমাস পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন । দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে ঐদিন মোট ২১জন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন । ১৭৬৫ শকের ৭-ই পৌষ ইংরাজী ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার । পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল এবং এখন ব্রাহ্মধর্ম হল । ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্ম থেকেই ব্রাহ্মধর্মের নবরূপান্তর ঘটতে থাকে । দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ পাঠ শুরু করেন । এইভাবে ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ১৮৪০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' এবং ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' স্থাপিত হয় । এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমেই বেদের অপৌরুষেয়তা ও অদ্বৈতবাদী মত প্রচারিত হতে থাকে। ১৮৪৪-৪৫ সাল থেকে দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন । রামগোপাল ঘোষ ও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি যুক্তিবাদী ডিরোজিয়ানরা, যাঁরা 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'রপ্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁরা এই সময় বেদান্ত ধর্মের অভ্রান্ততা ব্যাখ্যায় মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি, বেণ্টিক আইনদ্বারা 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধ করেন ১৮২৯ সালে । এর প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে 'ধর্মসভা' (১৮৩০) নামে গোঁড়া হিন্দুদের এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন

থেকেই ব্রাহ্মসমাজ গোঁড়া হিন্দুদের নিকট চক্ষুশূল হয়ে উঠে। এইসময় ব্রাহ্মসমাজকে দারুণ সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল। তখনও রামমোহন রায় স্বদেশেই ছিলেন। ব্রিষ্টলে রামমোহনের মৃত্যুর পর তার সহযোগী দলের ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাবহেতু তাঁরা তখন 'ইয়ংবেঙ্গল দলে'র কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, খ্রীষ্টান মিশনারিরা নিজেদের স্বার্থে বৈদান্তিক ধর্মাদর্শের সমালোচনায় মুখর হন এবং প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দুদের কাছে তো তাঁরা প্রকৃত শত্রু হয়েই উঠেন এইসময়। উনবিংশ শতকের সমগ্র তৃতীয় দশকের ইতিহাসে দেখা যায়, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ। এর পরে ব্রাহ্মসমাজের ক্রমিক অধঃপতনের ইতিহাস, দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন, তিনি দেখেন, প্রাচীন প্রণালীমত বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যানের সাথে সাথে তার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণনা করছেন। ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে নীতিবিরুদ্ধ 'অবতার বাদ' ও পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিবেশে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভার' পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই — প্রথমতঃ নব্যশিক্ষিত তরুণদের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষকে সুপথে আনয়ন করা, দ্বিতীয়তঃ বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারিদের হিন্দুধর্ম বিরোধী নিন্দাবাদের জবাব দেওয়া এবং দেশের তরুণদের মধ্যে ধর্মান্তরের অভিযান প্রতিরোধ করা, তৃতীয়তঃ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ নেতাদের ব্রাহ্মসমাজ বিরোধী বিষোদ্গার বন্ধ করা, চতুর্থতঃ বেদান্ত-উপনিষদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রচার করে অসত্যের অপপ্রচার রহিত করা। এই কাজগুলি সঠিকরূপে পালন করতে হলে সকলের অগ্রে দরকার ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সঠিকরূপে নির্ধারণ করা। সমস্যার সমাধান কল্পেই দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মবীজ রচনা করে এই প্রতিষ্ঠানকে পোক্ত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের ৭-ই পৌষের মিলনোৎসবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হল ব্রাহ্মধর্মের এই নবজন্মোৎসবকে স্মরণ করা। সামাজিক প্রগতির বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ সনাতনধর্মী হিন্দু সমাজের আক্রমণ, বিদেশী রাজধর্মী খ্রীষ্টান মিশনারিদের সুপরিকল্পিত হিন্দুসমাজ বিরোধী অভিযান এবং তার উপর এদেশের বিভ্রান্ত নব্যশিক্ষিত তরুণদের স্বধর্ম বিদ্বেষ - এতগুলি সুসংহত শক্তির বিরুদ্ধে তখন কেবল একা ব্রাহ্মসমাজকেই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামের বাহন হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

হিন্দুধর্মকে বাহ্য আচার, বাহ্য অনুষ্ঠান, বাহ্য ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রানুশাসন, বাহ্য পৌত্তলিকতা ও প্রথা পীড়ন ইত্যাদির হাত থেকে মুক্ত করে লোকচিত্তকে ধর্মক্ষেত্রে বর্হিমুখী না করে অর্ন্তমুখী করাই ছিল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য । রামমোহন রায়েরও কাম্য ছিল ব্রাহ্মধর্মের ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্মকে শোধন করা এবং হিন্দুধর্মের অন্তমাধুর্য্যের উপর সর্বধর্ম সমম্বয়ের ও বিশ্বজনীন মানবধর্মের ভিত রচনা করা । রামমোহন রায় মধ্যযুগীয় সন্যাস ও বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না । তাঁর গৃহ সর্বদাই নৃত্যগীত আনন্দ উৎসবে মুখর থাকত । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবের ফলে ব্রাহ্মরা কিছুটা ভোগবিলাসে মেতেছিলেন । তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মোপাসনা' সময় এবং অর্থ উভয়দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শ বলে মনে হয়েছিল । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্রেও লক্ষিত হত ।

এককথায়, বহুযুগ প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন করে, মধ্যযুগীয় ছকবাঁধা গন্ডীর বাইরে এসে ব্যক্তি যাতে নিজের বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সব কিছুকে যাচাই করে নিতে পারে এটাই ছিল 'ব্রাহ্মধর্ম' ও ব্রাহ্মসমাজে'র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আবির্ভূত হয়েছিল । সুসংগঠিত প্রচার প্রয়োজন । একখানি পত্রিকা একশত প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে । শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ *"In this act propagation, the Tattwabodhini patrika rendered great help. There having been no regularly appointed missionaries of the Samaj at that time, the patrika largely fulfilled the want. In the course of a few years Samajes sprang up in many stations outside Calcutta through the influence of that paper. Some amongst the educated men, who were its readers, imbibed the new principles, took counsel together and established Samajes in their own localities."*[১৮৫] পরবর্তীকালে আরো বহু পত্র-পত্রিকা — যেমন, 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'সমদর্শী', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'ধর্মতত্ত্ব', ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে অংশ নিলেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভূমিকা এক্ষেত্রে অতুলনীয় । ব্রাহ্মসমাজকে তখন আধুনিক ভারতের পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় দেখা যায় ।

নবযুগের বাংলার এবং ভারতেরও নবজাগরণের ও সামাজিক প্রগতির

অগ্রদূত ছিল ব্রাহ্মসমাজ । সমাজকে অসংখ্য কু-সংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিসত্তার মুক্তি এনে দিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ । বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক মুক্তি আনয়নে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নবযুগের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ।

ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য একেশ্বরবাদ প্রচার করা । আদি ব্রাহ্মসমাজ অবতারবাদ, পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধী হলেও বিধবাবিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ এগুলি স্বীকারে স্বীকৃত নন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না । আবার আর একদল — যেমন, বিজয় গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখেরা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী । এইভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবীণে নবীনে মতবিরোধ দেখা দেবার ফলে নবীন ব্রাহ্মরা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় প্রবীণদের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন । কারণ নবীন ব্রাহ্মগণ বিধবা বিবাহ, আন্তর্জাতিক পরিণয়, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ প্রভৃতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেন । হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের আর কোন সংশ্রব রইল না । আদি ব্রাহ্মসমাজ একটি পৃথক সমাজে পরিণত হল। নবীন ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । এই সময় কেশবচন্দ্র একটি জোরালো ধর্ম আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । তার ফলে বহু শিক্ষিত যুবক রক্ষণশীলদের নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারিত হয় ও 'ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হয় । পূর্ববঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি শহরে 'ব্রাহ্মসমাজে'র বিস্তার প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন : *"The first adherents were most of them high officers under Government, and the movement was entirely a movement of the leaders of the educated community of the time"* [১৮৬] ব্রাহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা থাকবে না, এই নিয়ে আবার নবীনে নবীনে বিরোধ বাঁধে । এটাও মিটে গিয়েছিল একপ্রকার । অন্য একটি কারণে সমস্যার জটিলতা বেড়ে যায় । এইসময় কেশবচন্দ্র সেন অন্যধর্মী কুচবিহারের অপরিণত বয়স্ক মহারাজার সহিত তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যার বিবাহ দেবার ফলে বিরোধ এত স্পষ্ট প্রকট হয় যে

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় । আনন্দমোহন বসু, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ১৮৭৮ সালে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন ।

১৮৮০ সালের জানুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র সেন 'নববিধান সমাজ' গঠন করে তাঁর ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নূতন পথের ইঙ্গিত দিলেন । কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনায় ভক্তির পথ অবলম্বন করেন । শ্রীচৈতন্যের মত তিনিও প্রচার করতে থাকেন, 'যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার' । রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ থেকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পথে যাত্রা করেন । দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ ব্রাহ্মধর্মকে মনে করতেন হিন্দুধর্মের প্রগতিশীল অংশ, আর কেশবচন্দ্রের 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল একটি স্বতন্ত্রধর্ম । 'নববিধান সমাজ' গঠনের পর কেশবের ধর্মজীবনে এই পরিবর্তনকে অনেকে মনে করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যের প্রভাবের ফলেই দেখা দিয়েছে । সকল ধর্মের প্রতি উদারতা, 'সর্বধর্ম সমন্বয়ে'র প্রয়াস ও মাতৃভাবের প্রধান্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাবজাত। কেশবচন্দ্র নিজেই এইরূপ বলেছেন —"কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরস্বতী, কখনো মহাদেব, কখনো জগদ্ধাত্রী" — নানাভাবে কখনো এক নামে, কখনো অন্য নামে 'হরিকে নিত্য নবীন বেশে দেখিব ।"[১৮৭] 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র উদ্যোগীগণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সাধক । তারা সামাজিক ও নৈতিক বিষয় অনেকটা অবলম্বন করেন । এঁরা অবতারবাদ, গুরুকরণ, দেবদেবীর পূজা ও জাতিভেদ মানেন না । পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে সামাজিক সাম্য, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিবাহের বয়স বর্দ্ধিতকরণ, কন্যার স্বামী নির্বাচন বিষয়ে স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ ইত্যাদির পক্ষপাতী । সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা এদের সকল বিষয়ে মূলমন্ত্র । .... ব্রাহ্মসমাজ মোটামুটি শিক্ষা দেয় যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সংযমের সহিত সকল বিষয় ভোগ করে পরহিতার্থে ও আত্মহিতার্থে কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করে ভক্তি পথে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতীক্ষাকরণ ।[১৮৮]

বাঙ্গালীর ধর্মজীবনের এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের মনের মধ্যে নূতন আশার আলো নিয়ে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণ — বিবেকানন্দের 'সর্বধর্ম সমন্বয়ে'র বাণী । পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, মিথ্যা নয় কিছুই । ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়' । তিনি 'সাকার' ও 'নিরাকার', উভয় ভাবেই তার আরাধনা সম্ভব । শ্রীরামকৃষ্ণ ও

বিবেকানন্দ এই সময় হিন্দুধর্মের নূতন পথের সন্ধান দেন। তাঁরা বলেন — ধর্ম নিয়ে দলাদলি ঠিক নয়। সব ধর্মই সমান সত্য। এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'যত মত তত পথ' এর বার্তা প্রচার করেন। যে কোন নামেই তাঁকে ডাকতে পার। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বিভিন্ন ধর্মমতগুলি ঈশ্বর উপলব্ধির এক একটি পথমাত্র। বিভিন্ন ধর্মপথে সাধন করে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে বিভিন্ন মত ও পথ সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছেছে। ফরাসী মনীষী রোঁমা রোঁলা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন — ত্রিরিশ কোটি মানুষের কুড়ি হাজার বছর ব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতি স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সহস্র সুরের একটি সমন্বিত ঐক্যতান। এখানে মানব জাতির সহস্রধর্ম ও সহস্র মতবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটেছে। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সেকালের নারী সমাজের ভূমিকা আলোচ্য। তখনকার সামাজে ধর্মসম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত থাকলেও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান ধর্ম হল সতীত্ব ধর্ম। সতীর ধর্ম - সতীত্ব। সতীত্ব স্ত্রীলোকের পরম শ্রদ্ধার ধন, অমূল্য নিধি।[১৮৯] সতীত্বই হল স্ত্রীলোকের পরম শ্রদ্ধার ধন। সতীত্বরত্ন না থাকলে হাজার গুণ থাকলেও সে গুণের কোন মূল্য থাকে না। যদি স্ত্রীলোকের সতীত্বগুণ না থাকে তবে তার হৃদয়ে কোন ধর্ম বীজ জাগ্রত হতে পারে না। জীবন মরুভূমির মত শুস্ক বোধ হয়। নারী জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা সতীত্বকে অন্তরে ধারণ করে জীবনতরী বয়ে নিয়ে যাওয়া। এমনকি চন্ডালকন্যা সতীত্ব রত্নে ভূষিতা হলে দেবী বলে পূজ্যা হন, আর ব্রাহ্মণ কন্যাও যদি সতীত্ব ধর্ম থেকে চ্যুতা হয়, তবে সে ঘৃণার্হ্যা ও পিশাচী বলে পরিত্যজ্যা। স্ত্রীলোকের রূপ, গুণ, ধন সমস্ত একদিকে ও সতীত্ব অপরদিকে রেখে ওজন করলে, সতীত্বই গুরুতর হয়। সতী বস্ত্রালঙ্কার শূন্যা হয়ে চীর পরিধান করলেও রূপ ফুটিয়া বের হয়। তাঁর বিমল স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে দশদিক্ বিভাসিত হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকের পূজাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠান সবই বৃথা হয় তার চরিত্র দোষে। নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করলেও তার রূপ যৌবন প্রস্ফুটিত হয় না। নারী নিজেকে সুন্দর করে তুলতে যতই সাজসজ্জা করুন না কেন তা তার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করার বদলে কলঙ্কিতই করবে। "হাতে দুইগাছি শঙ্খ অথবা একগাছা লোহার বালা, সীমন্তে একটু সিঁদুর এবং শুধু একখানি লালপেড়ে কাপড় পরণে থাকে, আর তাহার উপর যদি শিরোভূষণ

সতীত্ব হয় এবং ক্ষমাশীলতা, নম্রতা, সরলতা প্রভৃতি অঙ্গের অলঙ্কার হয়, লজ্জা দেহের আবরণের কার্য্য করে, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন জন্য অন্য কোন বহুমূল্য বসনভূষণের প্রয়োজন হয় না।"[১৯০]

বাহ্য বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে অহঙ্কারে মদমত্ত স্ত্রীলোককে কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখেনা। হৃদয়ে কমনীয়তা, লজ্জা, দয়া, সেবা, পরদুঃখে দুঃখী এমন স্ত্রীলোককে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি স্বর্গে গমন করলেও লোকে তাকে ভুলতে পারেনা। রানী ভবানী বহুকাল হল স্বর্গে গিয়েছেন। এখনও লোকে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। গরীব দুঃখী তাঁকে দেবী বলে মনে করতেন। "গরীব দুঃখী কাঁদিয়া বলে, মা ভবানী আবার আইস। তুমি মানুষ নও, মানুষরূপে অন্নপূর্ণা।"[১৯১] তাছাড়া বৃথা অহঙ্কার করলে কেউ আদর করেনা। ধনগর্বে গর্বিত স্ত্রীদের সহিত লোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ করলেও আন্তরিক ঘৃণা করে। কিন্তু যে রমণী ক্ষণস্থায়ী বাহ্য সৌন্দর্য্যে আসক্ত নন, যিনি আপনি সাধারণ রকমে থেকে গরিব দুঃখীর দুঃখে দয়ার্দ্র হয়ে দুঃখ মোচন করতে যত্নবতী হন, তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তুচ্ছ ধনগৌরবে মদমত্ত হয়ে যে রমণী নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে তিনি সমস্তই একদিন নষ্ট করবেন। ভারত রমণীর ভূষণ সতীত্ব এবং তাঁর ধর্ম হল পতির সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়ে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া। এছাড়া তাঁর আলাদা কোন ধর্ম নেই। ভারত রমণীর সতীত্বই একমাত্র ভূষণ। পতিশুশ্রূষাই সনাতনধর্ম. ভারতরমণী মনে করেন এতেই তাঁদের গতি ভুক্তি-মুক্তি।[১৯২]

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য এই চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য অর্থাৎ সংসার আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে ভারতীয় শাস্ত্র নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নারী শিক্ষার অভাবে এই গার্হস্থ্য আশ্রমকে শোচনীয় করে তুলেছে। ফলে সে নিজেও যেমন কষ্ট পাচ্ছে পরিবারের অপরকেও কষ্ট দিচ্ছে। সে না পাচ্ছে নিজে শান্তি, অপরকেও নানারূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তার ফলে সংসার কণ্টকময় বলে মনে হয়। সংসার জীবনে চির অশান্তির মধ্যে বসবাস করতে হয়। বাল্যকালে মাতা পিতা গুরু, কিন্তু বিবাহের পর তার আর একজন গুরু হন, তিনি স্বামী, বিবাহের পর স্বামীই শ্রেষ্ঠ গুরু। স্বামীকে অবজ্ঞা করে, অসম্মান করে কোন ধর্মকার্য্য সাধিত হয় না। পূজা-পার্বণ করলেই ধর্মলাভ হয় না। নারীর জীবনে শ্রেষ্ঠ

ধর্ম পতিসেবা, অসৎ পতিকেও শিক্ষিত নারী তার সদ্‌গুণ দ্বারা সৎপথে আনয়ন করতে পারেন। সতীত্বের পরই নারীর জীবনের প্রধান ধর্ম হল পতিভক্তি ও পতিসেবা। সেবাই পরমধর্ম, পতির পরেই সংসারে অপরের সেবা করা কর্তব্য। মনুষ্য জন্ম কেবল ভোগের জন্য নয় । ত্যাগের মধ্য দিয়েই যা ভোগ আসে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হয় । বিবাহের পর স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের চিন্তাও মহাপাপ। সদা সর্বদা স্বামীর বিষয় চিন্তা করা উচিত । কখন ভুলেও পর পুরুষের বিষয় ভাবা উচিত নয়, কেননা পর পুরুষের বিষয় ভাবলেও মহাপাপ হয়, সে পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই । জন্ম-জন্মান্তরে সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়। [১৯৩]

ব্রজেশ্বর নন্দকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পতিব্রতা রমণীর ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ বলেছিলেন ঃ "পতিব্রতা রমণী পতিতে সর্ব্বদা শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিভাবে প্রত্যহ পতিচরণামৃত পান করিবে, ব্রত, তপস্যা ও দেবপূজা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'ধর সেই পথ যাতে হয় পতিব্রতা,

চরধর্ম্ম স্বামীসহ, হও স্বামীরতা,

তাহাতেই হ'বে ধর্ম্ম, তাহাতেই যশ,

তাহাতেই হ'বে তব সফল মানস।" [১৯৪]

মূঢ় রমণিগণই ইষ্ট ফললাভের জন্য দেবতাদিগাকে আরাধনা করে থাকেন। একথা সকলেই জানে যে সকলের অপেক্ষা প্রিয়তম যে স্বামী তাতে যে নারীর ভক্তি না থাকে, সেই নারী ধর্মহীনা ও সর্বধর্ম বিবর্জ্জিতা ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, যে রমণী পতিকে কটু কথা বলে, তার শতজন্ম সঞ্চিত পুণ্য সমুদয় বিনষ্ট হয়ে যায় । শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের এই এক উৎকৃষ্ট নিয়ম কথিত হয়েছে যে, তঁরা নিশ্চয় পতির চরণযুগল পুজা করে ভোজন করবেন । পতিব্রতা নারী পতির নিকট উচ্চআসনে বসবেন না, পতির লজ্জাকর বাক্য কখনও বলবেন না, পতির সহিত কলহ দূরে পরিত্যাগ করবেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, সৎকুলোদ্ভবা সতী রমণীদিগের পতি অপেক্ষা আর উত্তম বান্ধব নাই; যে রমণী পতিপরায়ণা লোকে তাকেই পুণ্যবতী বলে থাকে। যুবতীদিগের স্বামী ভিন্ন অন্য তীর্থ নাই। যে রমণী পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালন করেন তাঁর পক্ষে পতির দক্ষিণচরণ প্রয়াগতীর্থ ও বামচরণ পুষ্করতীর্থ ।[১৯৫]

সুরধুনী কাব্যে জাহ্নবীর প্রতি হিমালয়ের উপদেশগুলি নিম্নরূপ ঃ

"প্রমদা পরমগুরু পতি মহাজন
সেবিবে তাহার পদ করি প্রাণপণ,
যা ভালবাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে
সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণপণে।
কখন স্বামীর আজ্ঞা ক'রোনা লঙ্ঘন
পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষ দরশন,
যদি পতি করে মাতা কুপথে গমন
ব'লোনা সরোষে যেন অপ্রিয় বচন,
বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল
দিন দিন দম্পতির প্রণয় সরল।"[১১৬]

পতিব্রতা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যমের উক্তি। দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যমকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় যম বলছেন, — হে বিপ্র ! হে মহামতে ! পাতিব্রত্য নারীর নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, দান ও ধর্ম্ম নাই। অর্থাৎ স্বামী সেবাই তাদের ঐ সকল ফল দিয়া থাকে। যম আরও বলছেন — পতিব্রতা রমণী (পুরুষের মধ্যে) পতিকেই দর্শন করেন, পতিতেই তার মন নিযুক্ত থাকে ও পতি আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে থাকেন। হে তপোধন ! আমরা এইরূপ পতিব্রতাকে ভয় করে থাকি, অন্য সকলেও ভয় করে, এরূপ পরম শোভনা সাধ্বী দেবগণেরও পূজ্য। যম একটি নির্ভর আশ্বাসের কথাও বলেছেন — যে নারী সূর্য্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে গৃহ মার্জ্জনা করেন, তাকে যমালয়ে আসতে হয় না। যে রমণীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সংযত হয়, অর্থাৎ যাঁর চক্ষু পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে দেখতে পায়না ও যাঁর স্বভাব পতিভিন্ন অপরকে বুঝতে পারে না, সে সদাচারিণী রমণীকে যমালয়ে আসতে হয় না।[১১৭]

স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ঃ এক সময়ে কয়েকটি স্ত্রী লোক রামকৃষ্ণের নিকট গমন করলে, মহাপুরুষ কোন মহিলার প্রতি লক্ষ্য করে আনন্দের সহিত বলে উঠলেন, — আহা ! আহা ! এমন বিদ্যারূপিণী খুব কম দেখেছি। এর উত্তরে কোন এক বিদুষী মহিলা বিরক্ত হয়ে ঠাকুরকে বললেন যে ইনি বিধবা, এর আবার সুলক্ষণ কি ? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসাহের সঙ্গে বললেন

— আমি সব জানি, তবু বলছি ইনি সাক্ষাৎ বিদ্যারূপিণী। তোমরা পতিকে নিয়ে যেভাবে দিন যাপন কর, এবং তাঁর পরলোক গমনে যেরূপ পরিণাম মনে কর, বাস্তবিক পতিভাবে ভগবানের সে উদ্দেশ্য নহে। এ সম্বন্ধ চিরজীবনের— বলে রামকৃষ্ণ একটি গল্প বললেন। যার মূল বক্তব্য ছিল এরূপ — রাধিকা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। তিনি জীব শিক্ষার আদর্শ। সংসারে যে কয়টি হৃদয়ের বিশেষ ভাব আছে, সে ভাবগুলি ভগবানে ন্যস্ত করতে পারলেই জীবের ভববন্ধন মোচন হয়। দাস্য সখ্যাদি পঞ্চভাবের মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবে সকল ভাবের ঘনীভূতরূপ। মধুর ভাব পতিভাবেই বিকশিত হয়। এই পতিভাব যে রমণীতে ফুটেছে — সে রমণীতে বরাবর থাকবে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী পতিকে আশ্রয় করে এইভাব প্রস্ফুটিত হয়। তারপর জগৎপতিতে সেই ভাব যায়। তখন নারীধর্ম সার্থক হয়। রাধিকা পতিভাব আয়ান ঘোষ থেকে যখন ভগবানে সমর্পণ করলেন, তখন পতিভাব অনন্ত বিকাশের আশ্রয় লাভ করে কৃতার্থ হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত স্ত্রীলোকটির মধ্যেও সেইরূপ ভাব দেখেছিলেন।[১৯৮]

তখনকার প্রচলিত সমাজে সাধ্বী রমণিগণ স্বামীর ধর্মমতের বাধাস্বরূপ না হয়ে স্বামীর ধর্মমতকেই নিজের মত বলে মনে করতেন। তাঁরা স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা ব্রতানুষ্ঠান উপবাস ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের চরণে নিজেদের নিবেদিত করতেন। রমণীর পতিসেবাই ব্রত, পরম তপস্যা, পরম ধর্ম। পতিসেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা পূজা, পরম সত্য স্বরূপ, সকলপ্রকার দানস্বরূপ এবং তীর্থস্থান স্বরূপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিই সর্বদেবময়, যত পবিত্র বস্তু আছে তাদের চেয়েও স্বামী স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর পবিত্র বস্তু এবং সমস্ত পুণ্যস্বরূপ। তাদের পক্ষে পতিই নারায়ণ স্বরূপ।

আগেকার মেয়েরা গৃহকার্যের সাথে সাথে ব্রতানুষ্ঠান করতেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ব্রতানুষ্ঠান না করলে স্বামী-সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে। এযুগের অধিকাংশ মহিলার মনে বিশ্বাসের পরিবর্তে অশ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের একটি ব্রতকথার নাম 'মঙ্গলচন্ডী'। বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার দিনের বেলা 'মা-চন্ডী' দেবীকে স্মরণ করে অন্তরের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভক্তি দ্বারা তাঁর আরাধনা করতেন। আরাধনা অন্তে মহিলাগণ ব্রতকথা শুনতেন। যাঁরা ব্রতানুষ্ঠান করতেন

তাঁদের সকলকে পুরোহিত মহাশয় আশীর্বাদী ফুল দিতেন । সমাজে প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে ব্রতানুষ্ঠান না করলে সংসারে নানা অমঙ্গল হয় । যেমন — সুয়াই দুয়াই দুই বোন। বাল্যে তাদের মাতৃবিয়োগ হয়। মা জীবিতাবস্থায় তাদের 'মা-মঙ্গল চন্ডী'র ব্রতানুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । বড়বোন দুয়াই ব্রতানুষ্ঠানকে অবহেলা করার ফলে তার দুঃখ দারিদ্রের সীমা পরিসীমা রইল না । আর ছোট বোন সুয়াই নিয়মিত ব্রতানুষ্ঠানের ফলে 'মা-মঙ্গলচন্ডী'র কৃপায় আনন্দেই ছিলেন। দুয়াই অনেক দুঃখ যন্ত্রণার পরে পুনরায় 'মা-মঙ্গলচন্ডী'র ব্রতানুষ্ঠান করে আবার পূর্বের ধন সম্পদ ফিরে পান এবং আনন্দে সংসার করতে থাকেন ।[১৯৯]

তখন সে সংসারে প্রচার করে দিল যে — বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে চন্ডীর ব্রত যেন সকলেই করেন, তাহলে কারো কোন দুঃখ থাকবে না । নারী কেবলমাত্র মানবী নয়, জগদ্ধাত্রীর অংশসম্ভূতা । তার কল্যাণদৃষ্টি যেদিকে না পড়বে সেদিকেই মহা অনর্থের সূত্রপাত ঘটে । আবার তার উগ্র চন্ডালরূপ জগৎকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে । ধৈর্য্যে নারী ধরণীতুল্য । রোগ, শোক ও দুঃখ কষ্টে তিনি বিশল্য করণী । তিনি জননী, সখা, দাসী, ভগ্নী, বধূ ও পত্নী । পুরুষের কোন কাজই নারীর কল্যাণস্পর্শ ছাড়া সুন্দর রূপে সমাধা হয় না । রমণীর কোমল, কমনীয় স্পর্শ যাদুমন্ত্রের মত পুরুষের সকল কাজে সহায়তা দান করে । সংসারে নারীর এই সর্বময়ী ভূমিকা সম্পর্কে মাতৃমন্দির পত্রিকায় একটি সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হয় —

"সত্যম, শিবসুন্দরম বিশ্বেতে রমণী ।
মঙ্গলালয়া, জগৎলক্ষ্মী জগৎজননী ।।
নারী নহে শুধু ভোগের বস্তু
— নহে বিলাসের পাত্রী ।
দুহিতা, ভগ্নী, বধূ ও পত্নী
— জননী জগত-ধাত্রী ।।
নারী সখী, দাসী, মন্ত্রী
নর যন্ত্রের যন্ত্রী
রোগ, শোক, দুঃখে, যাতনা কষ্টে

— নারী বিশল্য-করণী ।
অবলা, সরলা, লজ্জাবনতা
—পেলব কুসুমসমা,
কুলিশ কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে
—নারী নর-মনোরমা ।
কুটিল অপাঙ্গ দৃষ্টি
নারী হ'তে প্রজা সৃষ্টি
নারী শ্রী নিবাস, প্রেম-বিশ্বাস
—ধৈর্য্যেতে নারী ধরণী ।। [২০০]

রমণীর সাহায্য ছাড়া এই জগৎসংসারে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না । কি সংসার ক্ষেত্র, কি সমাজক্ষেত্র, কি ধর্মক্ষেত্র সর্বত্রই নারীর চেষ্টা, যত্ন ও সহায়তা ভিন্ন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনা । নারীর সহযোগিতা বিনা পুরুষের কোন কাজই পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। পুরুষের ধর্মমতকে নারী টিকিয়ে রেখেছে । এই পৃথিবী-রণক্ষেত্রে নারী পুরুষের অলক্ষ্যে থেকে যন্ত্রের মত সকল কার্য্য সমাধা করছে । বোধিদ্রুমতলে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ভগবান বুদ্ধদেব তৃপ্তি পেলেন না, এশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হলেও তার মনে সংশয়ের উদয় হল, শেষ পর্যন্ত এই ধর্মমত জনসমাজে প্রচলিত রাখা কিভাবে সম্ভব । বুদ্ধদেব তপস্যান্তে নগরে ফিরে এসে স্ত্রীলোকদের নারীশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। রমণীরা ত্যাগে, ধর্ম্মে, সেবায় এমন উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন যে ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রয়েছে । যেমন — অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করে মানবের সেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে সিংহলে গমন করেছিলেন — কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য । [২০১]

মহিলাগণ ধর্মকে নিজ জীবনে যেমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। যেকোন সৎকার্য্যে নারী শক্তির ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্মের উদারতা, শিক্ষা ও স্বাধীনতার ফলে বহু মহিলা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল। মানুষ জ্ঞানলাভ করে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়। ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ অতি উদার, অতি উচ্চ ।আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্মকে শক্তিশালী

করতে মহিলাদের ভূমিকা কম নয় । ব্রাহ্মমতাবলম্বী শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা কম হলেও তাদের কর্মক্ষমতা ছিল অসীম । 'সুপ্রভাত পত্রিকা'য় উল্লিখিত একটি ঘটনা থেকে জানা যায় — যখন বিধবা বিবাহ প্রথমে প্রচলিত হল, তখন সেই সময়ের কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম তাঁর দুই ভ্রাতাকে বিধবা বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন । এ সংবাদ অবগত হলে তাঁর গ্রামবাসীরা বলেছিলেন, ইট দিয়ে তাঁর মাথা গুড়াইয়া ফেলব । পূজ্যপাদ ক্ষণজন্মা মহাত্মা নিজের স্ত্রীকে এসে বলেছিলেন, আমি বিধবা বিবাহ দিতে চাই, দেশের লোক আমাকে মেরে গুড়া করতে চায়, আত্মীয় স্বজনেরা অভিসম্পাত করবে কিন্তু তুমি এ বিষয়ে কি বল, আমি তাহাই শুনতে চাই । তখন তঁর সাধ্বী বলেছিলেন — "অনাথা দুর্ভাগিনী বিধবাদের বিবাহ তুমি আনন্দচিত্তে দাও । কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ হইও না ।" [২০২]

নারীর প্রকৃত ধর্ম স্বামীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা । যখন সমগ্র জাতির রমণীকুল জেগে উঠছিলেন, তখন বঙ্গরমণীও পিছনে পড়ে থাকেনি । সাধ্বী রমণিগণ স্বামীর পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা স্বামীর আত্মার সম্পদ দেখতে ও অনুভব করতে ভালবাসেন । স্বামীর সহ-মতাবলম্বী হওয়াই স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য এবং এই হল রমণীর প্রকৃত ধর্ম— তখনকার মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে ধর্ম-সম্পর্কিত পর্যালোচনা থেকে এ-সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয় ।

তথ্যসূত্র :

১) The complete works of Raja Rammohan Roy, vol. I, Snaskrit and Bengali -'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, প ২০৫।

২) Part played by women of Eastern India in the fight for free dom - Thesis by Shyamasri Som, 1986, P-2. [সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে হিন্দু স্ত্রী-লোকদের অবস্থা সম্পর্কে মহেশ চন্দ্র দেব বক্তব্য রেখেছিলেন । দ্রষ্টব্য - Awak ening in Bengal in early Nineteenth century, vol. I, edited by Gautam Chattopadhyay, Calcutta Progressive publishers 1965, P-92]

৩) কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত (কলিকাতা সংবৎ ১৯৩২), পৃ. : ১৫৪ - ১৫৬ । Bengal spectator, Vol. I, No. - 5, July - 1842.

৪) Calcutta Journal, Vol. 3, May - 18, 1891.

৫) Widow Remarriage papers, M. S. Records, National Archives of India (W. R. papers N. A. I. বলে পরে উল্লিখিত) Letter, Dated Fort William, the 24th

July 1837.

৬) W. R. Papers, Records N. A. I. - Letter, Dated Fort St. George, the 31st July 1837.

৭) W. R. Papers, Records N. A. I. - Letter, Dated Allahabad, the 11th August, 1837.

৮) Bengal spectator, Vol. I, No. - I, April 1842.

৯) শম্ভুচন্দ্র, বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, 'বিধবা বিবাহ', অধ্যায়।

১০) ক্ষিতীশ-বংশবলী চরিত, ২৪ অধ্যায়, ২০৩ পৃ.।

১১) সংবাদ প্রভাকর, ১০ই চৈত্র, ১২৫৮।

১২) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৭৭৬ শক।

১৩) শম্ভুচন্দ্র, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, পৃঃ ১২০।

১৪) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, চতুর্থ ভাগ, ১৪০ সংখ্যা ।

১৫) 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার-দ্বিতীয় পুস্তক' পৃ. ১৬৫।

১৬) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (৩য় খন্ড একত্রে) — বিনয় ঘোষ, প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ — ১৯৭৩, ১৯৮৪, ১৯৯৩, পৃ. ২৬৪।

১৭) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গলী সমাজ - বিনয় ঘোষ, (তিনখন্ড একত্রে) পৃ. ২৬৬।

১৮) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পৌষ ১৭৭৮ শক, ১৬ সংখ্যা ।

১৯) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৭৭৮ শক ১৬ সংখ্যা ।

২০) 'হিতবাদী পত্রিকা' ২০ শে ভাদ্র, ১২৯৮ ।

২১) বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত — শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০৯।

২২) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ — বিনয় ঘোষ, (৩য় খন্ড একত্রে) পৃ. ২৭৬

২৩) বিদ্যাদর্শন, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৬৪ শক ।

২৪) 'বিদ্যাদর্শন, ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৭৬৪ শক ।

২৫) হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, সুধীর কুমার মিত্র, ১ম খন্ড, পরিবর্তিত দ্বিতীয় মিত্রাণী সংস্করণ, মার্চ ১৯৬২, পৃ: ২৪০।

২৬) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ — বিনয় ঘোষ, (তিন খন্ড একত্রে) প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ. ২৮৩ ।

২৭) সোমপ্রকাশ, ৩০ শে শ্রাবণ, ১২৭৮ ।

২৮) সোমপ্রকাশ, ৩০ শে শ্রাবণ ১২৭৮ ।

২৯) 'সোমপ্রকাশ', ২৯ শে মে, ১৮৬৫।

৩০) 'সোম প্রকাশ' ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬৮।

৩১) 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৪।

৩২) 'বামাবোধিনী পত্রিকা' পৌষ, ১২৭৪ ।

৩৩) 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৭৪ ।

৩৪) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, বিনয় ঘোষ, (তিনখন্ড একত্রে) প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ. ২৩৭ ।

৩৫) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, চৈত্র ১৮০২ শক ।

৩৬) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১২৮২, পৃ. ৯৪ ।

৩৭) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১২৮২, পৃ. ৯৪

৩৮) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১২৮২, পৃ. ৯৭

৩৯) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪, পৃ. ২৬ ।

৪০) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪, পৃ. ২৮।

৪১). 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ. ২৫ ।
৪২) 'অন্তঃপুর', ২য় বর্ষ, ২য় ভাগ , ১ম কল্প, ১৭, ১৮ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ইং ১৮৯৯,- মে, জুন, পৃঃ ৯২।
৪৩) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ. ২৭ ।
৪৪) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ. ২৬ ।
৪৫) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ. ২৮ ।
৪৬) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ. ২৯ ।
৪৭) 'বিবেকানন্দের পত্রবলী', এখানে 'ভারতমহিলায়' প্রাপ্ত, পৃ: ২৮-২৯, 'ভারতমহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।
৪৮) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১২৮২, পৃ: ৯৭ ।
৪৯) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১২৮২, পৃ: ৯৮ ।
৫০) 'অন্তঃপুর, ২য় বর্ষ, ২য় ভাগ , ১ম কল্প, ১৭, ১৮ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, মে, জুন, ১৮৯৯, পৃ: ৯২।
৫১) 'অন্তঃপুর, ২য় বর্ষ, ২য় ভাগ , ১ম কল্প, ১৭, ১৮ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, মে, জুন, ১৮৯৯, পৃ: ৬৮
৫২) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: ২০ ।
৫৩) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃ: ৫৬ ।
৫৪) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃ. ৩০ ।
৫৫) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: ২৫ ।
৫৬) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: ৩০ ।
৫৭) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃ: ৫৬ ।
৫৮) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ২ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃ: ৫৭ ।
৫৯) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৩০, পৃ: ১৪০ ।
৬০) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩০, পৃ: ২২১।
৬১) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩০, পৃ: ২২৩।
৬২) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৪, পৃ. ১২২ ।
৬৩) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৪, পৃ. ১ ।
৬৪) 'ভারত মহিলা', ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৪, পৃ. ২ ।
৬৫) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১২৮২, পৃ: ৭৭ ।
৬৬) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, পৃ: ৩৪ ।
৬৭) 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার-দ্বিতীয় পুস্তক', পৃ: ১৬৫ ।
৬৮) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ১০ম সংস্করণ, মাঘ ১২৮২, পৃ: ২৩৫ ।
৬৯) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ১০ম সংস্করণ, মাঘ, ১২৮২, পৃ: ২৩৪।
৭০) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ১০ম সংস্করণ, মাঘ, ১২৮২, পৃ: ২৩৫।
৭১) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ১০ম সংস্করণ, মাঘ, ১২৮২, পৃ: ২৩৫ ।
৭২) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১২৮২, পৃ: ৫৫ ।
৭৩) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১২৮২, পৃ: ৫৬ ।
৭৪) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: ৭।
৭৫) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: ৮।
৭৬) 'মন্দিরা', ফাল্গুন, ১৩৫২, পৃ: ৫৮২।
৭৭) 'আর্য্যনারী কুলের উন্নতি', 'পরিচারিকা', ১২৮৬, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ২য় খন্ড, পৃ: ১৬-১৭।

৭৮) 'বঙ্গমহিলা সমাজের' নবম সাম্বৎসরিক উৎসব, 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮৮, সেপ্টেম্বর, ৪ কল্প, ২ ভাগ, ২৮৪ সংখ্যা, পৃ: ১৫৩ ।
৭৯) 'নারীসমাজে সুরেন্দ্রবাবুর অভ্যর্থনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৯৭, ভাদ্র, ৪ কল্প, ৪ ভাগ, ৩০৮ সংখ্যা, পৃ: ১৩২ ।
৮০) শিবনাথ শাস্ত্রী - History of the Brahmo Samaj, 2nd ed. Calcutta, 1894, পৃ: ৩৩৪।
৮১) 'মহিলাদের সভা সমিতি', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১১, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ৮ কল্প, ১ম ভাগ, ২৯৫ সংখ্যা, পৃ: ৪৯৬-৪৯৭।
৮২) 'ভারতী', ৩২শ খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৫, পৃ: ২৭৭ ।
৮৩) 'ভারতী', ৩২শ খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৫, পৃ: ২৭৯ ।
৮৪) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: অস্পষ্ট।
৮৫) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ: অস্পষ্ট।
৮৬) 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'মহিলা সমিতি সংবাদ', পৃ: ১৪৩, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৪ ।
৮৭) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪, পৃ: ২৯৫।
৮৮) 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ঘরে বাইরে কলম', ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৪, পৃ: ২০৭।
৮৯) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪, পৃ: ২৮৬।
৯০) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪, পৃ: ২৮৬-৮৭।
৯১) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষের ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত, পৃ: ৭৯৫ ।
৯২) তদেব
৯৩) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৫, পৃ: ৭৬৬।
৯৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৫, পৃ: ৭৬৬।
৯৫) 'জয়শ্রী', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ৮৫ ।
৯৬) 'জয়শ্রী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪০, পৃ: ৫১২।
৯৭) 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ঘরে বাইরে কলম', পৃ: ২৮৭।
৯৮) 'প্রবাসী', ২৩শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ: ৭১৮ ।
৯৯) 'প্রবাসী', ২৩শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ: ৭১৮ ।
১০০) 'প্রবাসী', ২৩শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ: ৬১২ ।
১০১) 'প্রবাসী', ২৪শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩১, পৃ: ৭০৩ ।
১০২) 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ঘরে বাইরে কলম', ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৪, পৃ: ১২১-১২২।
১০৩) 'জয়শ্রী', ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, পৃ: ২৮২ ।
১০৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ঘরে বাইরে কলম', পৃ: ২৮৭।
১০৫) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষের ১১শ ও ১২শ সংখ্যার প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছেড়া থাকায় দেয়া গেল না ।
১০৬) 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ঘরে বাইরে কলম', পৃ: ২০৬ - ২০৭।
১০৭) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১২৮২, পৃ: ২১ ।
১০৮) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২, পৃ: ৪৫ ।
১০৯) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১২৮২, পৃ: ১৬৩।
১১০) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৮২, পৃ: ১৯০ ।
১১১) 'পুস্তকাদি সমালোচনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৯৫ বৈশাখ, ৪র্থ কল্প, ২ভাগ, ২৮১ সংখ্যা, পৃ: ৩০ ।
১১২) 'বামারচনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১৮৮২, নভেম্বর ৪ ভাগ, ২ কল্প, ২১৪ সংখ্যা, পৃ:

· ২২২ ।
১১৩) 'পুস্তকাদি সমালোচনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮৪ ফেব্রুয়ারী, ৩য় কল্প, ২ভাগ, ২৪১ সংখ্যা, পৃ: ৩২৮ ।
১১৪) 'পুস্তকাদি সমালোচনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮৪ ফেব্রুয়ারী, ৩য় কল্প, ২ভাগ, ২৪১ সংখ্যা, পৃ: ৩২৮ ।
১১৫) 'পুস্তকাদি সমালোচনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮৪, ফেব্রুয়ারী, ৩য় কল্প, ২য় ভাগ, ২৪১ সংখ্যা, পৃ ২২৩।
১১৬) 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮২, নভেম্বর, ৪র্থ ভাগ, ২ কল্প, ২১৪ সংখ্যা, পৃ. ১৯৩।
১১৭) 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮২, নভেম্বর, ৪র্থ ভাগ, ২ কল্প, ২১৪ সংখ্যা, পৃ. ১৯৩।
১১৮) 'নূতন সংবাদ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৮৯, আষাঢ়, ৪র্থ ভাগ, ২ কল্প, ২১০ সংখ্যা, পৃ. ৯৩-৯৪।
১১৯) 'নূতন সংবাদ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৮০, শ্রাবণ, ৯ম ভাগ, ১২০ সংখ্যা, পৃ. ১৩৮।
১২০) 'নূতন সংবাদ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৮০, পৌষ, পৃ. ৩০৪ ।
১২১) 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী', কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ১।
১২২) 'বামাবোধিনী সমিতি ও পারিতোষিক রচনা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৯৪, বৈশাখ, ৪ কল্প, ১ম ভাগ, ২৬৮ সংখ্যা, পৃ. ৭-৮।
১২৩) 'বামাবোধিনী জুবিলী', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৯৫, ভাদ্র, ৪ কল্প, ২য় ভাগ, পৃ. ১৫৯-১৬০ ।
১২৪) Bethune College Centenary Volume 1879-1979. 'আমি সেই মেয়েটি'-কবিতা সিংহ, পৃঃ ৯৬-৯৮।
১২৫) 'সুপ্রভাত', ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৬, পৃ. ৪২২ ।
১২৬) 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮-১৯।
১২৭) 'সুপ্রভাত', ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ. ৫১৪।
১২৮) 'সুপ্রভাত', ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৭, পৃ. ৫৩৫ ।
১২৯) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ভাগ, ১ম ও ২য় খন্ড, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২০, পৃ. ১৩ ।
১৩০) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ভাগ, ৯ম ও ১০য় খন্ড, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ, ১৩২১, পৃ. ১১৭-১১৮।
১৩১) 'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, পৃঃ ৪৬ ।
১৩২) 'মাহিষ্য মহিলা', ৪র্থ ভাগ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২২, পৃ. ১৪১।
১৩৩) 'বঙ্গীয় স্ত্রী সমাজ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৭৭, আশ্বিন, ৬ ভাগ, ৮৬ সংখ্যা, পৃ: ১৪৯-১৫১।
১৩৪) 'বামাহিতৈষিণী সভা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৭৮, বৈশাখ, ৭ ভাগ, ৯৩ সংখ্যা, পৃ. ৩৯২-৩৯৩ ।
১৩৫) 'বামাহিতৈষিণী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৭৯, বৈশাখ, ৮ম ভাগ, ১০৫ সংখ্যা, পৃ. ২৬-২৭ ।
১৩৬) 'সপ্তচত্বারিংশে সাম্বৎসরিক মহোৎসব' 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৭৯৮ শক ১৬ মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, পৃ. ২৬ ।
১৩৭) 'আর্য নারীকুলের উন্নতি', 'পরিচারিকা', ১২৮৬, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ২য় খন্ড পৃ. ১৬-১৭ ।
১৩৮) 'আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ', 'পরিচারিকা', ১২৮৭, ফাল্গুন, ৩ খন্ড, ১০ সংখ্যা, পৃ. ২২৯-২৩১ ।
১৩৯) 'আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন', 'পরিচারিকা', ১২৮৭, ফাল্গুন, ৩ খন্ড, ১০ সংখ্যা,
১৪০) 'সাময়িক সংবাদ', 'পরিচারিকা', ১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ, ১০ খন্ড ২য়, সংখ্যা, পৃ. ৪৮ ।

১৪১) যোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল, 'কেশবচন্দ্র সেন', কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৬৯ ।
১৪২) 'বঙ্গমহিলা সমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৮৮৮, সেপ্টেম্বর, ৪ কল্প, ২য় ভাগ ২৮৪ সংখ্যা, পৃ. ১৫৩ ।
১৪৩) 'বঙ্গমহিলা সমাজ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৮৯, শ্রাবণ, ৪ ভাগ, ২ কল্প, ২১১ সংখ্যা, পৃ ১২৫-১২৬ ।
১৪৪) 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন, পৃ. ২৩৪ ।
১৪৫) 'বঙ্গমহিলা সমাজ', 'বামাবোধিনী পত্রিকা',১২৯৬, ফাল্গুন, ৪ কল্প, ৩য় ভাগ, ৩০২ সংখ্যা, পৃ: ৩৩৬ ।
১৪৬) 'মহিলাদিগের সভাসমিতি', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১১, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ৮ কল্প, ১ ভাগ, খংখ্যা ২৯৫, পৃ: ৪৯৬-৪৯৭।
১৪৭) 'একটি প্রস্তাব', 'ভারতী', ১২৯২, ৯ খণ্ড, পৃ. ২২।
১৪৮) 'সখী সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী', 'ভারতী', পৌষ, পৃ. ৫০৮-৫০৯।
১৪৯) 'সখী সমিতি' 'ভারতী', পৌষ, ১২৯৮, পৃ. ৫০৯।
১৫০) 'মহিলা শিল্প সমিতি,' 'ভারতী', ১৩১৫, ৩২ খণ্ড, ৬ সংখ্যা, আশ্বিন, পৃ. ২৭৭-২৮৫।
১৫১) 'পূজায় ভিক্ষা প্রার্থনা', 'ভারতী', ১৩১৭, আশ্বিন, ৩৪ বর্ষ, ৬সংখ্যা, পৃ. ৫৩২।
১৫২) 'শিল্প সমিতির দান প্রাপ্তি', 'ভারতী', মাঘ, ৩৪বর্ষ, ১০ সংখ্যা, পৃ. ৮৮০।
১৫৩) 'মহিলাদিগের সভা সমিতি', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১১, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ৪২ বর্ষ, ৪৯৬-৪৯৭ সংখ্যা, পৃ. ২৯৪-২৯৬।
১৫৪) 'সুমতি সমিতি', 'অন্তঃপুর', ১৩০৫, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১২-১৩।
১৫৫) 'মহিলাদিগের সভা সমিতি', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১৩১১, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, পৃ: ২৯৬ ।
১৫৬) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১২, পৃ. ১০৫ ।
১৫৭) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১২, পৃ. ১০৬ ।
১৫৮) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১২, পৃ. ১০৬ ।
১৫৯) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১২, প. ১৪ ।
১৬০) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১২, পৃ. ১৪-১৫ ।
১৬১) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১২, পৃ. ১০৭ ।
১৬২) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১২, পৃ. ১০৭ ।
১৬৩) 'The Musalman", Dec. - 14. 1906.
১৬৪) 'ভারত মহিলা', ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩১২, পৃ. ৭১ ।
১৬৫) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১০১।
১৬৬) তদেব, পৃ: ১০১-১০২ ।
১৬৭) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১০২ ।
১৬৮) তদেব ।
১৬৯) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃ: ২৩৮ ।
১৭০) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃ: ২৩৮ ।
১৭১) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃ: ২৩৮ ।
১৭২) 'জয়শ্রী', তদেব ।
১৭৩) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃ: ২৩৯ ।
১৭৪) তদেব, পৃ: ২৩৯ ।
১৭৫) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃ: ২৩৯ ।
১৭৬) তদেব ।
১৭৭) তদেব ।

১৭৮) তদেব, পৃ: ২৩৯-২৪০ ।
১৭৯) তদেব, পৃ: ২৪০ ।
১৮০) 'জয়শ্রী', তদেব, ।
১৮১) Centenary Review in Asiatic Society of Bengal, 1784-1883, Part I : "History of the Society" by Rajendralal Mitra.
১৮২) দীনেশচন্দ্রসেনকে লিখিত পত্র, শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সেন কৃত 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে উদ্‌ধৃত, পৃ. ২৮১ - ২৮৪ ।
১৮৩) দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃ. অস্পষ্ট ।
১৮৪) 'আত্মজীবনী' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ. অস্পষ্ট।
১৮৫) History of the Brahmo Samaj, Vol. - II, P-310.
১৮৬) History of the Brahmo Samaj, Vol. - II, P-312.
১৮৭) উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ৪৬৬ ।
১৮৮) 'সেবা ও সাধনা' ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৩, পৃ. ছেড়া ।
১৮৯) 'মাহিষ্য মহিলা', ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৫২।
১৯০) 'মাহিষ্য মহিলা', ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৫৩।
১৯১) 'মাহিষ্য মহিলা', ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৫৪।
১৯২) 'মাহিষ্য মহিলা', ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪থ ভাগ, পৃ. ৫৫।
১৯৩) 'মাহিষ্য মহিলা', ১ম ও ২য় খন্ড, ৩য় ভাগ, পৃ. ১৫।
১৯৪) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ও ৪র্থ খন্ড ৩য় ভাগ, পৃ. ২৬।
১৯৫) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ও ৪র্থ খন্ড ৩য় ভাগ, পৃ. ২৬।
১৯৬) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ও ৪র্থ খন্ড ৩য় ভাগ, পৃ. ২৭।
১৯৭) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ও ৪র্থ খন্ড ৩য় ভাগ, পৃ. ৫১ - ৫২।
১৯৮) 'মাহিষ্য মহিলা', ৩য় ও ৪র্থ খন্ড ৩য় ভাগ, পৃ. ৫৬।
১৯৯) 'শ্রেয়সী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, পৃ. ৩৬ - ৩৮।
২০০) 'মাতৃমন্দির', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃ: ৩৭ ।
২০১) 'সুপ্রভাত', ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৭, পৃ: ৪১৫ ।
২০২) 'সুপ্রভাত', ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৭, পৃ: ৪১৭ ।

—ঃ—

৩য় অধ্যায়

মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি সম্পর্কে সমকালীন মনীষিবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকে সাধারণ গেরস্ত ঘরে মেয়ে ছিল জঞ্জালের মত । সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষ সমাজ পরিচালনা করতেন । নারী ছিল তার সহচরী । পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রী বলে মনে করা হত । মনুর বিধানের অজুহাত দেখিয়ে এবং মুসলমান রাজত্বের সময় আবরু রক্ষার তাগিদে মেয়েদের চালান করে দেওয়া হল একেবারে অন্দরমহলে ।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক হাওয়ায় আমাদের দেশেও একটা পরিবর্তন এসেছিল। এর ফলে সমাজসংস্কার ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস চলছিল। সমাজে তখন সবচেয়ে করুণ অবস্থা ছিল মেয়েদের। তাই সমাজ সংস্কারের মূল কথাই ছিল নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কেননা নারী সমাজে তার যোগ্য মর্যাদা কবে পেয়েছে বলা কঠিন।

ইংরেজ রাজত্বে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই নয়, একটা ব্যাপক পরিবর্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়েছিল । তবে কলকাতা শহরেই এই পরিবর্তন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অতি নিম্নমানের। তৎকালীন পুরুষের রচনা থেকেই আমরা তা অবগত আছি। তৎকালীন পুরুষ সমাজ মহিলাদের হীনদশা সম্পর্কে মোটেই সজাগ বা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায় ইংলন্ডের মেয়েদের সঙ্গে তুলনায় স্বদেশের মহিলাদের দুর্গতি সম্পর্কে কমবেশী সচেতন হয়েছিলেন । এই দুঃখবোধ থেকেই বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভদ্রলোক সমাজ অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ মহিলাদের লেখাপড়া শেখানোর

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন । ১৮৩০ এর দশকের তরুণেরা যাঁরা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের নবজাগরণ অথবা রেনেসাঁসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । এরা মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন । তাঁরা উপলব্ধি করেন যে মেয়েদের অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কোন জাতি বা সমাজ উন্নতির পথে যেতে পারে না । ধীরে ধীরে কলকাতা ও মফঃস্বলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠে । তখনকার বঙ্গের শিক্ষাধিকারিকের বিবরণী থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, তাতে জানা যায় যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫টি এবং তাতে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১,১৮৩ জন। বেথুন স্কুল স্থাপনের পর নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহিলাগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং পত্র-পত্রিকা সম্পাদনেও অংশ নেন। এতকাল পুরুষের মুখে মহিলাদের নানা দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অভিযোগের সংবাদ পাওয়া যেত । কিন্তু মহিলা পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় মহিলাগণ নিজেরাই নিজেদের অভাব-অভিযোগগুলি জনতার দরবারে তুলে ধরতে শুরু করেন এবং তার প্রতিকার কল্পে মহিলাগণকে সংঘবদ্ধ করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালান ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রথম মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা', ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়েছিল । ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানির সম্পাদনা করতেন । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহিলাগণ কাব্য সাধনাতেও অংশ নিতে থাকেন । সিপাহীবিদ্রোহের এক বৎসর পূর্বে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার বলাগড় অঞ্চলের এক মিত্র মুস্তৌফী পরিবারের গৃহবধূ কৃষ্ণকামিনী দাসীর লেখা প্রথম নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশ পায় । এখানিই মহিলা লিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ । যদিও এর আগে ছদ্মনামে কয়েকজন মহিলার কিছু কিছু কবিতা, ছড়া প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু তার তেমন কোন কাব্যগুণ ছিল না ।

মহিলাগণ সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়ে অতি অল্পকালের মধ্যে যেভাবে নিজেদের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা পুরুষ লিখিত সাহিত্য থেকে কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না । পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রথম হাতে খড়ি হলেও তৎকালীন মনীষীদের দৃষ্টিতে পত্রিকাখানির গৌরব কোনো অংশে খাটো ছিল না । 'বঙ্গমহিলা'র

সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন ঃ "এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এদেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েকসংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রী-জনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্র সমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।"[১]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 'শনিবারের চিঠিতে' মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিকপত্র হিসাবে 'অনাথিনী'র কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু মহিলা পরিচালিত প্রথম পাক্ষিক পত্র 'বঙ্গমহিলা' এরও চার বছর পূর্বে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ঢাকার 'মিত্র প্রকাশ' (বৈশাখ ১২৭৭) নামক মাসিক পত্রে মুদ্রিত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য ঃ আমরা আর একটি সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি। কলিকাতার খিদিরপুর হতে 'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিকপত্রিকা প্রচারারম্ভ করিয়াছে। বঙ্গমহিলা কর্তৃক সাময়িক পত্রিকা প্রচার এই প্রথম।[২]

মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় পত্রিকা 'অনাথিনী'। এখানি মাসিক-পত্রিকা। থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে (ইংরাজী জুলাই ১৮৭৫) প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম সংখ্যা বের হবার পর ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' মন্তব্য করেন, "অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণমাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকপত্র এদেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে।"[৩]

১২৮২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'বান্ধব পত্রিকা' মন্তব্য করেন, "শুনিয়াছি,

সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।"[৪]

'হিন্দুললনা' মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮) বারাকপুরের নবাবগঞ্জ থেকে আত্ম প্রকাশ করেছিল। 'হিন্দুললনা'র প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেটে' (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন সংখ্যা) মন্তব্য প্রকাশিত হয় — "হিন্দুললনা — এতন্নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দু ললনা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখেছেন ঃ "বাঙ্গলা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দুমহিলা কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯/১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর ......। হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দুসমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই .... বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"[৫]

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'ভারতী'র নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করা উচিত। 'ভারতী' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসতনয়া। 'ভারতী' ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী' প্রকাশ করছিলেন তখন বাংলা সাহিত্যে একালের মত মাসিকপত্রের এত ছড়াছড়ি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' তখন স্তিমিত প্রায়। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে' বাংলার কথাসাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছিল। কিন্তু বাংলার নবযুগের গীতিকাব্যের সূচনা করেছিল 'ভারতী'। বিহারীলাল ছিলেন গীতিকাব্যের কবি। তাঁর সঙ্গে একে একে সুর ধরলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উদীয়মান কবিগণ। কিছুকাল পরে এসে যোগ দিলেন আনন্দের কবি দেবেন্দ্রনাথ ও হাসির কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁরা গীতিকাব্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছিলেন। এ যুগের মৌলিক ছোট গল্পও 'ভারতী'র বীণাতেই প্রথম ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল।

'ভারতী'র প্রথম আবির্ভাব ১২৮৪-র শ্রাবণ মাস। শ্রাবণ থেকে চৈত্র পর্যন্ত নয়মাসে বছর শেষ করে বৈশাখ থেকে আবার 'ভারতী' বর্ষ গণনা শুরু করেছিল। তখন দেশে প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র দু-তিনখানি ছিল। 'নবজীবন', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব', 'নব্যভারত' প্রভৃতি আরো কয়েকখানির নাম উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে 'বান্ধব' ছিল প্রধান। সে সময়ে 'বঙ্গদর্শনে'র মত সর্বাঙ্গসুন্দর আর একখানি মাসিকের প্রয়োজন অনুভব করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টা ও যত্নে 'ভারতী'র আবির্ভাব হয়েছিল। যদিও সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের উপর। তিনি সাত বৎসর যোগ্যতার সহিত পত্রিকা পরিচালনা করে বাঙ্গলা সাহিত্যে নবজীবনের ধারা আনয়ন করে অবসর গ্রহণ করলে 'ভারতী'র ভার গ্রহণ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ঐসময় স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'র ভার গ্রহণ না করলে শৈশবেই হয়ত 'ভারতী'র অপমৃত্যু ঘটত।

'ভারতী'র পাতায় বহু বিষয় আলোচিত হত। স্বর্ণকুমারী দায়িত্ব গ্রহণের পর এগুলির সাথে বিজ্ঞান আলোচনাও আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের আদি জন্মভূমি হলেও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মভূমি ইউরোপ। তিনি অনুভব করেছিলেন যে বাঙ্গালীজাতি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে নিজের কাজে লাগাতে পারলে আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। তাঁর লিখিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই 'পৃথিবী'র ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন — "বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্মতা লাভ করে ও কল্পনাসম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি; কেবল ইহাই নয়, যদি জাতির উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের বৃদ্ধি করিতে হয় ত বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রয়োজনেব গুরুত্ব যতদিন না ভারতবর্ষীয়গণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিবে ততদিন আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান কণ্টক, বিজ্ঞানের ক্ষমতা বলেই একমাত্র সে দারিদ্র্য মোচন হইতে পারে। এদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে তখন আমাদের আর অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। কি শিল্পে, কি বানিজ্যে সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্রধান হইতে পারিব।.... সেইদিন সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে, ধনে মানে যশে আমরা অন্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ

হইতে পারিব।"[৬]

তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার গভীরতা যে কতখানি ছিল তার পরিচয় বহন করে তাঁর লিখিত 'পৃথিবী' নামক বিজ্ঞান বিষয়ক বইখানি। তাঁর বইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে Statesman and Friends of India বলেন : *The writer brings a great research and vast information to bear upon her book. the work does great credit to the writer. we have no hesitation in saying that this is the best book in popular astronomy and geology in Bengali language."*[৭]

'ভারতী' দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেছিল তার কারণ স্বর্ণকুমারী মাতার মতই নিঃস্বার্থ সেবাদ্বারা 'ভারতী'র লালনপালন করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদক ও সম্পাদিকা 'ভারতী'র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেকালে মাসিক সাহিত্য জগতে 'ভারতী'র স্থান ছিল প্রধান। মহিলাগণ সাহিত্য রচনা করবেন একথা দূরে থাক, মহিলা পাঠকের সংখ্যাও ছিল তখন নগণ্য। কোন মহিলাদ্বারা পরিচালিত সাময়িকপত্র সেইসময় কেবল বঙ্গদেশেই নয়, ভারতবর্ষেও ছিল না। একজন বাঙ্গালী মহিলা বাংলা মাসিক পত্রের সম্পাদনা করছেন — একথা তখন কেউ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে পারতেন না। একজন মহিলার পক্ষে 'ভারতী'র মত একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনা করা অত্যন্ত মানসিক শক্তির দরকার। স্বর্ণকুমারী দেবী সে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সে যুগে অনেক সাহিত্যরথী ছিলেন কিন্তু স্বর্ণকুমারীর মত কয়জন তার পরিচয় দিয়েছেন।

স্বর্ণকুমারীকে 'ভারতী'র দায়িত্ব গ্রহণ করে অসীম পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি নিজে বড় গল্প, ছোট গল্প, হাস্যকৌতুক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতেন। তাছাড়া সমালোচনা, অন্যের লেখা নির্বাচন ও সংশোধন করা, প্রুফ দেখার কাজ, তাছাড়া তাঁর 'সখী সমিতি'র কাজ তো ছিলই। তখন বাইরের ভাল লেখকের সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিগণ্য। স্বর্ণকুমারী যেখানেই লেখার মধ্যে একটু ক্ষীর খুঁজে পেতেন, সেই লেখককে উৎসাহ দিয়ে লেখাটি সংশোধন করে 'ভারতী'তে ছাপতেন। অনেক সময় এমন হত যে লেখক লেখাটি তার নিজের কিনা বুঝতে পারতেন না। পরবর্তীকালে প্রথম যুগের সেইসব লেখক লেখিকাগণ সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

সে সময় দুই চারিজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন, তাদের নিয়ে সকলেই টানাটানি করতেন। ফলে যিনি সম্পাদনার দায়িত্বে থাকতেন তাকেই নিজের লেখা দিয়ে এবং অন্য লোককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে কাগজ পুরাতে হত। সম্পাদকের উপরেই মাসিক পত্রিকার পরিচালনা নির্ভর করত। স্বর্ণকুমারী নিজের প্রতিভা দ্বারাই সাহিত্যক্ষেত্রে সফলতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'র সঙ্গে 'বালক'ও যুক্ত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী'কে যে গৌরবের অধিকারিণী করেছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবীও চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা সে গৌরব কিছুমাত্র ম্লান হতে দেননি। সেইসময় সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের 'বঙ্গ দর্শন'কে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেও আদপে তা সম্ভব হয়নি। 'বঙ্গদর্শন' উঠে যায়। সুতরাং 'ভারতী'র আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় 'ভারতী' বঙ্গভাষার সর্বপ্রধান মাসিকে পরিণত হয়।

'ভারতী' যে বর্ষে নবম বৎসরে পদার্পণ করে তখনকার একখানি বিজ্ঞাপন পত্রের লেখা এরূপ — "'ভারতী' অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিয়া নবমবর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিত প্রকাশ বঙ্গদেশের আর কোন সাময়িক পত্রিকার ভাগ্যে ঘটে নাই।.......... কোন ভারতমহিলা কর্তৃক 'ভারতী'র ন্যায় পত্রিকার সম্পাদকতা বঙ্গে কেন — ভারতবর্ষে এই প্রথম।................. সকল শ্রেণীর সমালোচকেরই এই মত যে, 'ভারতী'র প্রবন্ধগুলি — বিষয়টি যতই কঠিন হউক না কেন, লেখার গুণে এত প্রাঞ্জল ও সরল হয় যে তাহা সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারেন।"[৮]

বাংলা সাহিত্য তখনও কৈশোরের অপরিণত অবস্থা কাটিয়ে যৌবনে উপনীত হতে পারেনি। সেই অপরিণত সাহিত্যকে যৌবনে আনয়নে ঠাকুর বাড়ীর ভূমিকা ছিল প্রধান। কেবল সাহিত্য বলি কেন, মধ্যযুগীয় কতকগুলি কু-প্রথা ও কু-সংস্কারের হাত থেকে সমাজকে মুক্তির আনন্দ এনে দিতে ঠাকুরবাড়ী যে ভূমিকা নিয়েছিল, তা চিরকাল ইতিহাস স্মরণ রাখবে।

বাংলাসাহিত্য 'ভারতী'র কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চ্চাকে কেন্দ্র করে বহু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ ঠাকুর বাড়ীর হাতেই বাংলা সাহিত্য স্নেহ ভালবাসা পেয়ে বর্দ্ধিত

হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন — "সমস্ত অপরিণতির মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও গৌরব অনুভব করিবার শক্তি আমাদের থাকা চাই, ভালো বলিতে পারিবার আনন্দ যদি আমাদের মনে না থাকে, যদি মন্দ বলিবার উৎসাহই যখন তখন ছোবল মারিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে তবে এমন নির্ম্মমতার পথে বঙ্গ-সাহিত্যের কোন কল্যাণ দেখিনা।. . . ভাষা আপনার সম্পূর্ণ শক্তি এবং সাহিত্য আপন পূর্ণতার আদর্শ একদিনেই পায়না। যতদিন না পায় ততদিন তাহাকে অবজ্ঞা যে করে সে নিজে অন্ধ ও অক্ষম। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে একটি অসামান্য শক্তি আছে, সে শক্তি প্রমাণ করা যায় না, অনুভব করা যায়।..... যার হৃদয় আছে ও সত্য দৃষ্টি আছে, সে ভিতর হইতে অনুভব করিতে পারে।"[৯] তিনি আরো বলেন —" ইব্‌সেন, বার্ণার্ডশকে নমস্কার করি, যাঁহারা তাঁহাদের বস্তা বহন করেন তাঁহাদেরও যথাযোগ্য খাতির করিব কিন্তু মাতৃভাষা নিজের লক্ষ্মীহস্তের যে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন তাহাকে প্রত্যেক গ্রাসে নিন্দা নাই করিলাম। ভালো যদি নাও লাগে তবে মৌন থাকিতে বলি।"[১০]

বঙ্গসাহিত্য তখনও কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পৌঁছুতে পারেনি। বঙ্গসাহিত্যের যৌবন আনয়নে 'ভারতী'র দান অপরিসীম। বহু নবীন লেখক গোষ্ঠীকে 'ভারতী' উৎসাহ দিয়ে পরবর্তীকালে তাদের বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন করে দিয়েছিলেন। 'ভারতী'কে যাঁরা লেখনী দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রিয়নাথ সেন, জলধর সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতিভাদেবী, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, নিস্তারিণী দেবী প্রভৃতি। এদের অনেকেই 'ভারতী'কে আশ্রয় করে সাহিত্য সাধনা শুরু করে পরবর্তীকালে সাহিত্য জগতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র

ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই দিক্‌পাল সাহিত্যিককে 'ভারতী' লেখকরূপে পেয়েছিলেন, এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

'ভারতী' যে সাময়িক পত্রের জগতে দীর্ঘ পরমায়ু পেয়েছিল তার মূলে ছিল স্বর্ণকুমারীর সাধনা। হিরন্ময়ীর ভাষায় — 'কাঁচা লেখকের লেখা পাকা করে তুলতে মা অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন।' 'ভারতী'র এত জয়জয়কারের মূলে ছিল প্রধানতঃ স্বর্ণকুমারী দেবী ও তার দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম।

'ভারতী'র কথা বলতে গেলেই স্বর্ণকুমারীর কথা আগে আসে। তিনি প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন। সুকোমল পরিবেশ পেয়ে তিনি সেই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সেকালে ঠাকুরবাড়ী ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান। ঐ পরিবারের চার দেওয়ালের গন্ডির মধ্যে যাঁরাই আনাগোনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন দিক আলোকিত করেছিলেন। বাংলাভাষা এত অল্পকালের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার মূলে রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর মত আরো কয়েকজন ভক্তের দান ছিল অপরিসীম।

যেযুগে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে উগ্র হয়, তাদের কোমলতা নষ্ট হয়ে যায় বলে ধারণা, সে যুগে স্বর্ণকুমারী বঙ্গসাহিত্যের সেবা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, নারীজাতির কিসে উন্নতি হয়, তাদের রুচি মার্জ্জিত হয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে 'সখিসমিতি' ও 'মহিলা শিল্প মেলার' আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশে নারীজাতির আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছিলেন। 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করলে উল্লসিত হয়ে নিস্তারিণী দেবী, যিনি 'ভারতী'র হাত ধরেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তিনি (নিস্তারিণী দেবী) মন্তব্য করেন — "'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পড়িল — ইহা আমার কাছে বড়ই আনন্দের দিন। বিশেষ করিয়া এইজন্য আনন্দ যে ইহা স্বর্ণকুমারীরই জয়গান আজ বিঘোষিত করিতেছে। চিরদিন করুক ইহাই প্রার্থনা করি।"[১১]

তৎকালীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জলধর সেন বলেন : "যে 'ভারতী'কে অবলম্বন করিয়া আমি বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহাতে আমার ন্যায় 'ভারতী'র নগণ্য

সেবকের যে কি আনন্দ বোধ হইতেছে, তাহা বলিবার ভাষা নাই।"[১২]

স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীও 'ভারতী'র সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা নিয়মিত 'ভারতী'তে লিখে পাঠক সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৩০২ থেকে ১৩০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী'র সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত থেকে নিজেদের কর্মদক্ষতা ও সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। হিরন্ময়ী দেবীর লিখিত বহু কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশ পেত। তাঁর লিখিত কবিতাগুলি সরল ও মাধুর্য্যমন্ডিত ছিল। তবে তিনি বেশী দিন সাহিত্য জগতে বিচরণ করেননি।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ অল্পকালের জন্য 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেও এক বৎসর পরে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলাদেবী একাই 'ভারতী'র দায়িত্ব গ্রহণ করে সাহিত্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র মাধ্যমে দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও যুক্তির তীব্রতা ছিল অসামান্য। বৈদিক ও বৌদ্ধসাহিত্যের মত যে সব বিষয় সাধারণতঃ কেহ চর্চ্চা করে না সেগুলির প্রতিও তার ছিল গভীর অনুরাগ। তাঁর সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করলে সাহস ও তেজস্বিতাগুণে তিনি অনেক ক্ষমতাবান লেখককেও মার্জ্জনা করতেন না। তিনি তখন বজ্রের মতই কঠোর হতেন।

উপযুক্ত লেখক খুঁজে বার করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসামান্য। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেন যে কার "কোথায় কোন গুণ আছে, এবং সেই গুণের আদর কিরূপে করিতে হয় এবং ঐ গুণের দ্বারা সমাজের ও সাহিত্যের উপকার কিরূপে হয় তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল এবং সেই অসাধারণ গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সেই সময়ে বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে সুন্দর প্রবন্ধরাজি সংগ্রহ করিয়া 'ভারতী'কে সুসজ্জিত করিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'ভারতী'র কথা উঠিলে সেই মূর্ত্তিমতী ভারতীকেই মনে পড়ে।"[১৩]

সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভারতী' দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকার কারণ 'ভারতী' কখনও কোন ব্যাপারে কারোর অনধিকারের চর্চ্চা যেমন বরদাস্ত করতেন না তেমনি কোন দলাদলির মধ্যেও প্রবেশ করেননি। 'ভারতী' নির্ভীকভাবে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন, এই নির্ভীকতার জন্যই অনেকসময় প্রসিদ্ধ

লেখককেও শত্রু করেছিলেন । সাহিত্যে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিপত্য চলছিল তখনও 'ভারতী' বঙ্কিমের কবিতাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে এরূপ মন্তব্য করেছিল যে 'কবিতায় বঙ্কিমের কোন গুণপনা নেই।'[১৪]

'ভারতী'কেও কম প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে হয়নি । তবে সেক্ষেত্রে 'ভারতী' দলাদলি ও নীচতার আশ্রয় না নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নির্বিকার চিত্তে আপন কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়ে সাহিত্য জগতে তার প্রবল অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন । তৎকালীন সাহিত্য জগতের দিক্‌পাল হেমন্ত কুমার রায় বলেন— "প্রাচীনা 'ভারতী' যখন বাঙ্গলার এই ক্ষণজীবী মাসিক সাহিত্যের মধ্যে এত ঝড়-ঝাপ্টা সহিয়াও এতকাল বাঁচিয়া আছে, তখন তাহার জীবন নিশ্চয়ই অনাবশ্যক নহে, অতএব ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, বর্ষীয়সী হইলেও 'ভারতী' যেন চিরজীবিনী ও চিরযৌবনা হইয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে পারে ।"[১৫]

'ভারতী'র কথা বলতে গেলে স্বর্ণকুমারীর কথাই বলতে হয় । স্বর্ণকুমারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাই ছিল 'ভারতী'র সাধনা । তাই তিনি বলেছেন — "আমি 'ভারতী'কে কতটুকু গড়িয়াছি বা না গড়িয়াছি তা ত আমি জানিনা, 'ভারতী' যে আমাকে 'এই আমি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহাই আমি জানি । পূজার আয়োজনে ফুলমালা হইতে রত্নমালা গাঁথিয়াছি, জানিনা, সে ফুল পারিজাত না অপরাজিতা, সে রত্ন হীরকমণি না কঙ্কর, সে বিচার আজি তোমরা করো ; 'ভারতী'কে মাল্যভূষিত করিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি আমি শুধু তাহাই জানি ।"[১৬]

তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা আমরা সকলে জানি। সাহিত্য পূজার উপচার সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, আবার অনেক অযাচিত বন্ধুর সাহায্যও পেয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী'র সম্পাদনা করে অবসর গ্রহণকালে তিনি বলেছিলেন — সুরুচি সুশ্লীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল, আনুষঙ্গিক একটি কর্তব্য ছিল নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা।. . . . . . যখন এই সম্পাদন ব্রত গ্রহণ করেছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করে এতে প্রবৃত্ত হই নাই । কর্মের আনন্দই কর্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করেছিল । আজ সে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরায়ে গিয়েছে ।..... আজ শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন একান্তই

নিবৃত্তি লোলুপ।.... বস্তুত ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত । ব্রত গ্রহণ করে আমি যে উদ্‌যাপনে অবসর পেলাম, ইহাই আমার কর্মের প্রকৃত পুরস্কার।[১৭] স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'কে বন্দনা করে একদিন গেয়েছিলেন ঃ —

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনী-বীণাপাণি
আমি কাহারেও আর জানি না, ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানিনা প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা —
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি ।
আমি জানি না ত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতি পুরিত পরমানন্দ
তোমারি চরণে দানি ।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহিনা মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবার সাধ
তোমারি অমৃত বাণী ।[১৮]

বঙ্গসাহিত্য 'ভারতী'র হাতেই যে পুষ্টিলাভ করেছিল একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই ।

'পরিচারিকা' পত্রিকাখানি প্রথমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ (ইং ৮ই মে ১৮৭৮) কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও কয়েক বৎসর পর কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন । এই পত্রিকা প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার' ও 'কুশদহ' ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৪ই শ্রাবণ (ইংরাজীর ২৯শে জুলাই ১৮৮৭) তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন—"আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা' কাগজখানি পুনরায় বামাগণের পরিচর্য্যায় বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছেন।

প্রথমাবস্থায় যিনি ইহার অধিকাংশ লেখা লিখতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুইবারের নমুনা যাহা দেখা গেল তাহা আশাজনক ।স্ত্রীলোকের পত্রিকা স্ত্রীলোকদ্বারা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে ? বামাকুলহিতৈষী মহাশয়েরা এরূপ সুরুচিসম্পন্ন জাতীয়স্বভাবের পক্ষপাতী আর্য্যগুণ বিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয় ।"[১৯] পত্রিকাখানি প্রথমে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' থেকে প্রকাশিত হলেও পরে এর ভার অর্পিত হয় আর্য্যনারী সমাজের উপর । পত্রিকাখানি দীর্ঘ পরমায়ু লাভে সমর্থ হয়নি । মাত্র ২৮ বৎসরকাল জীবিত ছিল ।

নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত তখন আরো বহু মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে । মহিলাগণ অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বলিত সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে ক্রমশঃই অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেন ।

'খৃষ্টীয় মহিলা' এইরূপ আর একখানি মাসিকপত্র। কুমারী কামিনী শীলের সম্পাদনায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ইংরাজীর জানুয়ারী ১৮৮১) আত্মপ্রকাশ করেছিল । এতে মহিলারচিত বিভিন্ন সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পেত ।

১৮৮১ সালের ২৯শে এপ্রিল 'এডুকেশন গেজেট' এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে লেখেন ঃ "খৃষ্টীয় মহিলা মাসিকপত্র - কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত । ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটি পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয় ।"[২০]

১৮৮৩ সনে কলকাতার টালা অঞ্চল থেকে 'বঙ্গবাসিনী' নামে বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের হতে থাকে । ১৮৮৩ সনের ২৮ শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২ই আশ্বিন ১২৯০) ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' 'বঙ্গবাসিনী'র একটি বিজ্ঞাপন বের করে । বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ "বঙ্গবাসিনী । সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১।।০ টাকা, মফঃস্বলে ২।০। আকার দুই ফরমা, ডিমাই এক শিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ, প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ

মূল্য দুই পয়সা মাত্র ।

নিম্নলিখিত লেখিকাগণের লেখা 'বঙ্গবাসিনী'তে নিয়মিত প্রকাশিতহবে। শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ প্রভৃতি ।"

বিজ্ঞাপনটিতে আরো লিখিত ছিল — 'বঙ্গবাসিনী' আগামী আশ্বিন (কার্তিক ?) মাস থেকে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হবে । এতেসাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাত্রি ভাল ভাল সংবাদপত্র থেকে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্‌ধৃত ও অনুবাদিত করা হবে ।[২১]

পরবর্তী ১৮৮৩ সনের ৩০ শে নভেম্বর তারিখে 'বঙ্গবাসিনী'র ১ম সংখ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' জানিয়েছিলেন — "বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশ্যে সম্পাদিত । কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই । বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে ।"[২২]

বিংশ শতকে নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল । এসময় মহিলাগণ বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে থাকেন । সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজসংস্কার প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল । পত্র-পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে জনমত গঠন করে মহিলা সমাজকে সুশিক্ষিত করে তুলতে তৎকালীন শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন করে রমণিকুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তারা স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের অন্নের সংস্থান নিজেরাই করতে পারেন, তারজন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়েছেন । ক্রমে ক্রমে মহিলাগণ আরো সক্রিয়ভাবে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন । সাহিত্যচর্চা, সমাজসংস্কার, রাজনীতি, পত্রিকা সম্পাদনা প্রভৃতি কাজে তাঁদের ভীরুতা কেটে গিয়ে দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল । এসময় থেকেই মহিলাগণ পুরুষের সম-অধিকার আদায়ের জন্য

তাদের জোরালো দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে লেখনী ধারণ করেছিলেন। নূতন উদ্যমে ও নবচেতনায় দেশের মহিলাসমাজকে প্রগতির বন্যায় ভাসিয়ে পাড়ে তুলবার জন্য সে সময় আরো বহু মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। সেসব পত্র-পত্রিকা শ্রেষ্ঠতায় উচ্চ আসনের অধিকারী ছিল। সমকালীন মনীষিবৃন্দ ও পাঠক পাঠিকা মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করে সম্পাদিকাগণকে ও লেখিকাগণকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

এতকাল বঙ্গরমণিগণ শিক্ষার অভাবে এবং সামাজিক উৎপীড়নের ফলে তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে বঙ্গরমণী প্রমাণ করল যে তাদের চিন্তাশক্তি যেমন প্রখর, হৃদয়ও তেমনি উন্নত। শিক্ষালাভের ফলে পরার্থপরতা ও সাধুচিন্তা তাদের মনকে অনেক প্রশস্ত করেছিল। যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে বঙ্গরমণীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরা আত্মসুখে মগ্ন না থেকে দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীনা ভগ্নীগণকে কু-সংস্কারের নিমজ্জিত পঙ্ক থেকে উদ্ধারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

'মুকুল' - বিংশ শতকের একখানি পত্রিকা। ইহা বালক বালিকাদের উপযোগী করে সচিত্র আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। শৈশব ও কৈশোরকাল জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ সময়। এইসময় মনের গঠন এবং গতি যেদিকে যাবে পরবর্তীকালে জীবন সেই ধারায় প্রবাহিত হতে থাকবে। 'মুকুল' এমন একখানি পত্রিকা যা পাঠে শিশু ও কিশোর কিশোরীদের মনের আনন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি করত। প্রথমে এই পত্রিকাখানি সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর। ষষ্ঠ বর্ষ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ থেকে শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী এর সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকাখানিতে শিশু ও কিশোর কিশোরীদের উপযোগী গল্প, কবিতা, নানা জন্তুজানোয়ারের সচিত্র বুদ্ধিমত্তার গল্পকাহিনী, হেঁয়ালি, ছড়া প্রভৃতি স্থান পেত। শিবনাথ শাস্ত্রীর বহু শিশু পাঠ্য রচনা 'মুকুলের পাতায় স্থান পেয়েছিল। তিনি মানব মুকুলদের হাতে জ্ঞানের মুকুল দেবার জন্য পত্রিকাখানির সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। উদ্দেশ্য মানব মুকুলগণ কৈশোরের লব্ধ জ্ঞান সহায়ে তাদের জীবনতরী ফলে ফুলে বিকশিত করে তুলবে। বহু মনীষীর লেখা দ্বারা 'মুকুলে'র গৌরব বৃদ্ধি

পেয়েছিল। 'মুকুল' যে আশা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে আশা যে পূর্ণ হয়েছিল তা বিভিন্ন পাঠকপাঠিকা ও কিশোর কিশোরীদের লিখিত পত্রাবলী থেকে জানা যায়।

শ্রীমতী সরোজবালা গুপ্তা 'মুকুলে'র একজন গ্রাহিকা ছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে ভগবান যেন ক্রমেই 'মুকুলে'র উন্নতি সাধন করেন।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন — 'মুকুল' দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। পরমেশ্বরের নিকট ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত দাস লিখেছেন — "মুকুল অতি চমৎকার মাসিক পত্রিকা হইয়াছে ; আমি 'মুকুলে'র গ্রাহক চিরজীবনের জন্য।"

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — "আপনার কবিতাটি পাইয়াছি। কবিতাটি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু ঠিক ছেলেদের উপযোগী না হওয়াতে 'মুকুলে' প্রকাশিত হইল না।"

বহু সংখক গ্রাহক গ্রাহিকা তাদের সুন্দর সুন্দর কচিহাতে কাঁচা পাকা অক্ষরে 'মুকুলকে ভালবাসি' — এই কথাগুলি লিখে তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিল।

কেউ কেউ লিখেছেন, "'মুকুল'কে প্রাণের সহিত ভালবাসি।" কেউ লিখেছেন — 'মুকুল পেতে বিলম্ব হলে বড়ই কষ্ট হয়,' আবার কেউ বা লিখেছেন "'মুকুল' মাসিক না হয়ে দৈনিক হলেই ভাল হত।' আর প্রায় সকলেই "'মুকুলে'র দীর্ঘজীবন কামনা করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছেন যেন তাদের আদরের 'মুকুল' আরও সুন্দর ও উপভোগ্য হয়।"

'চুড়ির চেয়ে মুকুল ভাল' — এক কিশোরী গ্রাহিকা বাবার কাছে চুড়ি চেয়ে আব্দার করেছিল। বাবা সময়মত তা দিতে পারেননি। সেই বালিকা 'মুকুল' পত্রিকাটিরও নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন। কোন এক মাসে মুকুল না আসায় বাবাকে প্রশ্ন করে বালিকা যখন জানতে পারল যে বাবা সময়মত টাকা না পাঠাবার জন্য সেই মাসে 'মুকুল' আসেনি। তাতে বালিকাটি দুঃখিত হয়ে বাবাকে টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানাতে জানতে পারল যে বাবার হাতে টাকা নেই। উত্তরে বালিকা জানায় —'কেন, সেদিন ত তুমি আমায় চুড়ি কেনবার জন্য একটা টাকা দিতে

চাচ্ছিলে ? আমি চুড়ি চাই না, তুমি সেই টাকাটা পাঠিয়ে দাও ।' "চুড়ি চাও না? সে কি, সেদিন না চুড়ির জন্য কাঁদছিলে ? 'চুড়ির চেয়ে কি মুকুল ভাল হল ?"

"হ্যাঁ, আমি মুকুল চাই, মুকুলকে আমি সকলের চেয়ে ভালবাসি, 'মুকুল' না এলে আমার বড় দুঃখ হয় ।" আচ্ছা মা, তোমার কোন ভাব্‌না নেই, আজই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব ।

তিনদিন পরে "বাবা, দেখো, দেখো, কেমন সুন্দর 'মুকুল' এসেছে । আহা কেমন ছবি । — এই দেখ, কত নূতন ধাঁ, ধাঁ । আমি কখনও 'মুকুল' ছাড়ব না। 'মুকুল' যতদিন বেঁচে থাকবে, আমি নেবো ।"

"আচ্ছা মা, এখন থেকে আমি মুকুলকে আমাদের বাড়ীর কাপড় চোপড়, গহনা পত্রের মত একটা খুব দরকারী জিনিষ বলে মনে করব । কিন্তু শুধু 'মুকুল' পেলে হবে না । 'মুকুল' পড়ে ভাল ভাল বিষয় শিখতে হবে, খুব ভাল হতে হবে," হ্যাঁ, বাবা, এখন থেকে আমি খুব ভাল হতে চেষ্টা করব ।"

মুকুল অফিসে আগে থেকে টাকা না পাঠালে সময়মত 'মুকুল' হাতে আসে না ।

ছোট ছোট বালক বালিকারা আমোদ খোঁজে । ঘরে যদি প্রচুর আমোদ আহ্লাদের জিনিষ থাকে তবে বালক বালিকার মন ঘরে পড়ে থাকে । বাইরের দুষ্ট ছেলেপিলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হবার ভয় থাকে না । 'মুকুল' এরূপ একখানি পত্রিকা যা বালকদের মনে আনন্দের খোরাক জুগিয়েছিল ।

দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে ভীত শঙ্কিত বাবা তার শ্যামাকে একখানা 'মুকুল' কিনে দিয়েছিলেন । "'মুকুল' পেয়ে শ্যামার আমোদের আর সীমা নেই । সে একবারও আর ঘরের বার হয় না ।"

'মাহিষ্যমহিলা' নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে উদয়পুর শান্তিনিকেতন থেকে (নদীয়া) প্রকাশিত হয়েছিল । মাহিষ্য-মহিলাদের উন্নতি, শিক্ষা ও সামাজিক বহুবিধ কু-সংস্কার দূর করে সমাজ জীবনে শক্তি সঞ্চার করাই ছিল এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য । যদিও পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয়নি, তথাপি পত্রিকাখানি মাহিষ্য-সমাজের অসার দেহে প্রাণসঞ্চার করেছিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই । ভারতের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এর উচ্চ প্রশংসা করে বহু পাঠক পাঠিকা পত্র দিয়েছেন। চিঠিগুলির বক্তব্য এরূপ ঃ— মালদহ থেকে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সাটিয়ার মহাশয় লিখেছিলেন — "মাগো কৃষ্ণভাবিনী ! তোমার লিখিত মাহিষ্য মহিলা পাঠে অত্যন্ত সুখী হইলাম।"[২৩]

শ্রীমতী বিধুবালা দেবী লিখেছিলেন — অসংখ্য গুণদায়িনী, মৎপ্রিয় ভগ্নি শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস, আজ আপনাকে বোন সম্বোধনে পত্র লিখিব। আপনার প্রেরিত মাহিষ্যমহিলা ১ম ভাগ, ১ম খন্ড হইতে ২য় ভাগ, ১২শ খন্ড পর্যন্ত আমার পিতার নিকট প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পাঠে পরম আনন্দচিত্তে পিতাঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ভগ্নি সম্বোধনে পত্র লিখ, তাই আজ ভগ্নি সম্বোধনে পত্র লিখিয়া জানাইতেছি যে জগদীশ্বর আপনার দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। আপনি আমাদের মাহিষ্য সমাজের মহিলাগণের মধ্যে মাহিষ্যমহিলা পুস্তকের গুণপ্রকাশ করিতে এবং আমাদের জাতীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া মাহিষ্য মহিলাগণকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া সকলের ধন্যবাদ লাভ করুন।[২৪]

নদীয়া বাঁশবেড়িয়া থেকে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চৌধুরী ভারতী মহাশয় লিখেছিলেন ঃ মহাশয়া ! আপনার পত্র প্রাপ্তে সাতিশয় সুখী হলাম। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলনের দিনে আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহৎ কার্য্যে প্রণোদিত হয়েছেন, আশাকরি তা সকলেরই বাঞ্ছনীয় হবে এবং মাহিষ্য শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনার সহায়তা করতে পরাঙ্মুখ হবে না। ১ম ও ২য় বর্ষের মাহিষ্যমহিলা ভিঃ পিঃ যোগে আমার স্ত্রীর নামে পাঠাবেন, তিনি আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করবেন।[২৫]

সিমলাশৈল থেকে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী দাস মহাশয় লিখেছেন — "আমি আপনার ২৯শে শ্রাবণ তারিখের ৮০৩ নং মাহিষ্যমহিলা নাম্নী পুস্তিকার বিজ্ঞাপন কার্ড প্রাপ্ত হয়ে সাতিশয় আনন্দিত হলাম। আনন্দলাভের প্রধান কারণ এই যে ঐ পুস্তিকা আমার মাহিষ্য সমাজের এক শিক্ষিতা মহিলার দ্বারা সম্পাদিত। আমার ক্ষুদ্র সমাজ ইদানীন্তন কালের অন্যান্য বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নিকট অতি নিম্নস্থানই অধিকার করে রয়েছে। ইহা লেখা বাহুল্যমাত্র যে সমাজের উন্নতি কুসংস্কার মুক্ত উন্নত জ্ঞান ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার উপরে নির্ভর করে। আপনি আপনার পুস্তিকার দ্বারা আমার ক্ষুদ্র সমাজের মহিলাগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা

করছেন জেনে আনন্দলাভ না করে থাকতে পারলাম না। মহিলাগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজ উন্নত হতে থাকে একথার সার্থকতার পরিচয় সকল সভ্য জগতই দিচ্ছে।

শিমলাশৈল, ইং ১৬ আগষ্ট

শনিবার[২৬]

'বঙ্গলক্ষ্মী'— সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র স্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাখানি বাংলার নারী সমাজের উন্নতিকল্পে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (ইংরাজীর ১৯২৫, নভেম্বর) প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় নারিগণ যাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের উন্নতি নিজেরাই করতে সমর্থ হন তার জন্য মিলিত চেষ্টা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রামে, শহরে মহিলা সমিতি স্থাপন করে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ও নারীজাতিকে স্বাবলম্বী করে তোলা এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল।

'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাখানি আগাগোড়াই মহিলাদের হস্তে পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহিলা এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। জার্ম্মনি থেকে তারকনাথ দাস লিখেছেন -

C/o Dentsche Bank
Munich, Germany,
March ২৪, ১৯২৮.

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজখানি শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর নিকট হইতে পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। আপনারা যেভাবে কাজ করিতেছেন, তাহাতে আশা হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপনারা যে 'দুইলক্ষ' টাকা তুলিয়া একটা অর্থ ভান্ডার সংস্থাপন করিবেন এবং উক্ত টাকার আয় হইতে আপনাদের কাজ চালাইবার এবং কাজ বাড়াইবার জন্য যত্ন করিবেন, ইহা খুব আশার কথা। ১০০্ টাকা দিয়া 'জীবনসভ্য' হওয়া যায় তাহাও জানিলাম। যদি সম্ভব হয় আমি শীঘ্র আপনাদের মত কর্ম্মীদের সেবাব্রতীদের সঙ্গে মিলিব অর্থাৎ সভ্য হইব। বাঙলার যদি ২০০০ (হাজার) লোক ১০০্ টাকা করিয়া দেয় তাহা হইলে আপনাদের দুইলক্ষ টাকা উঠিয়া

যাইবে। আশাকরি, আপনাদের টাকা উঠিয়া গিয়াছে।

আপনারা আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের সাহায্য লইবার জন্য গ্রামে গ্রামে মুষ্টিভিক্ষা প্রথাটা অবলম্বন করুন। প্রত্যেক সংসারে একটা ক'রে কলসী রাখিয়া দিবেন এবং মুষ্টিভিক্ষার চাউল মাসিক বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ২৫ বৎসব পূর্ব্বে আমরা কোন কাজের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। London Times হইতে দুটা cutting..... পাঠাইয়া দিতেছি এবং Princess Cannanght এর ছবি পাঠাইয়া দিতেছি। হয়ত এগুলি একটু কাজে আসিবে। আপনারা আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি —

সেবক তারকনাথ দাস"[২৭]

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিক মহাশয়া বলেন — 'নারী মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য ও শিক্ষা প্রণালী বর্ত্তমান সময়ে এদেশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ব'লেই আমার মনে হয়। আমি প্রবাসে থাকতে এই সমিতি পরিচালিত মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গলক্ষ্মী' হ'তে সমিতির কাজের সমস্ত সংবাদ পেতাম। এই কাজগখানি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে লক্ষ্য ক'রে আনন্দ অনুভব করছি।[২৮]

'প্রভাতী' — এখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাঁকুড়া থেকে সুধা ঘোষের সম্পাদনায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে মুক্তি লাভ করেছিল। তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকা উচ্চ প্রশংসা করে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন — "প্রভাতী সাময়িক পত্র হইলেও সুদুর পল্লীর সাহিত্য সেবীদের উৎসাহ উদ্দীপনার স্বাক্ষর এর প্রত্যেকটি লেখায় সুপরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান প্রগতির যুগে 'প্রভাতী'র লেখক ও পরিচালক বৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী অনস্বীকার্য। মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদশোভ্র আকর্ষণীয়।" দেশ ২১শে পৌষ, ১৩৬৩।[২৯]

"আয়তনে ছোট হইলেও সংখ্যাটি সুসম্পাদিত।"

আনন্দবাজার পত্রিকা — ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৬৫।[৩০]

"রচনার নির্বাচন মার্জিত রুচির পরিচয় হিসেবে প্রশংসনীয়।"

যুগান্তর; ২৮শে আশ্বিন ১৩৬৭।[৩১]

'জয়শ্রী' — পত্রিকাখানিও আগাগোড়া মহিলা হস্তেই পরিচালিত হয়েছিল। লীলাবতী নাগ (পরে রায়) এর সম্পাদনায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে এই

সচিত্র মাসিকখানি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

পরাধীন ভারতে সরকারী লাঞ্ছনার ফলে পত্রিকাখানিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'জয়শ্রী' আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল।

'জয়শ্রী'—তে মেয়েদের লেখাই প্রকাশ পেত। তবে এমন অনেক বিষয় আছে যাতে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে পুরুষ লেখকদের উপর নির্ভর করে তাদের লেখা গ্রহণ করতে 'জয়শ্রী'র কোন আপত্তি ছিল না। 'জয়শ্রী' আগাগোড়াই সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে মহিলাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লেখনী ধারণ করেছিল।

'জয়শ্রী' পত্রিকাখানিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ দিয়ে এইভাবে তার মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন —

"জ্বালো নব জীবনের নির্ম্মল দীপিকা,
মর্ত্ত্যের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা।
আঁধার গহনে রচো আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা।"[৩২]

'জয়শ্রী' তার কর্মের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাসনাকে পূর্ণ করতে পেরেছিল। পরাধীন ভারতের দুঃখ মোচনের কাজে 'জয়শ্রী'র ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'জয়শ্রী' ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় নির্ভীকচিত্তে লেখনী ধারণ করেছিল, এইজন্য দুঃখ লাঞ্ছনাও তাকে কম সইতে হয়নি।

'অর্চ্চনা' — ১৩১০ বঙ্গাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'অর্চ্চনা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। ৪০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) হতে চিত্রিতা দেবী এর সম্পাদিকা হন। এই মাসিক পত্রিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তখনকার অন্যান্য মাসিকপত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতায় প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদার অধিকারী। এর লেখক লেখিকা গোষ্ঠিতে যারা ছিলেন তাদের সকলের রচনাগুলিই সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত বঙ্গসাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল।

'অর্চ্চনা' পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নে সংক্ষেপে দেয়া হল ঃ— " 'অর্চ্চনা' সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা। 'অর্চ্চনা'র সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতেছিল। 'অর্চ্চনা' বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠপত্র-

সমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।" — হিতবাদী পত্রিকা।

"অর্চ্চনা সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনা সুপরিচালিত হইয়া মাসিকের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে। সাহিত্যে অর্চ্চনার উচ্চস্থান। অর্চ্চনার বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা। ইহার গুণ মূল্যের অনুপাতে পাঁচ টাকা অকিঞ্চিৎকর।" বঙ্গবাসী পত্রিকা।

"'অর্চ্চনা' পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য।" বসুমতী পত্রিকা।

..............এই উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 'অর্চ্চনা' আজ কয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্ভিকভাবে বঙ্গসাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আসিতেছে, যেরূপ অপক্ষপাতে ইহা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেরূপ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াও সময়ে প্রকাশিত হইতেছে, এরূপ পত্রিকা বর্ত্তমানে একখানিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। অর্চ্চনা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, সন্দেহ নাই,.............. ইহা প্রত্যেক সাহিত্য সেবীরই পাঠ করা উচিত।" সময় পত্রিকা।

"'অর্চ্চনা' কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 'অর্চ্চনা' অনেক মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে। 'অর্চ্চনা' ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। * * * এক সংখ্যায় এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢক্কানিনাদী মাসিক সমূহেও দেখিতে পাই না।" সাহিত্য।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম. এ., বি এল, মহাশয় লিখেছেন —"মাসিক সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা যাইতে পারে। যতগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত........অর্চ্চনা .... প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকাগুলি .... প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

"'অর্চ্চনা' মাসিকপত্রের ভিতর শ্রেষ্ঠতায় ইহা যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। 'অর্চ্চনা'র লোকবর্গের ভিতর কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব ? সকলেই সুপরিচিত সুখ্যাত সাহিত্যিক।......... অর্চ্চনা পড়িবার জিনিষ, পাঁচজনকে পড়াইবার জিনিষ। মাসিক প্রচারিত বাংলায় 'অর্চ্চনা'র আসন যে অনেক উচ্চে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" ভারতচিত্র *"'Archana' - The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. .... The Statesman & Friend of India.' "*

"'Archana - This monthly magazine is always interesting

reading was a large circle of readers" - The Indian Daily News

"'Archana' - It contains many valuable and interesting articles, ... this magazine can be recommended highly to the reading public" - The Telegraph.

"We are glad to find that The Bengali monthly Archana has an assured place among the vernacular periodicals of the country and among the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful, well-written, interesting reading and bear ample evidence of judicious editing. (Summary Of opinions)" - The Bengalee.

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত থেকে ইহাই উপলব্ধি হয় যে 'অর্চ্চনা' আকারে ক্ষুদ্র হলেও লেখনী ও পরিচালনায় তখনকার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে উৎকর্ষ ও সাহিত্যিক মূল্য বিচারে শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিল। উৎকর্ষতার বিচারে 'অর্চ্চনা' জনমানসে গভীর উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা মোটেই নগণ্য ছিল না ।এইসব পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তৎকালীন মহিলাগণ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন । 'মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়' একথা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে তাঁরা তাঁদের সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর যেভাবে রেখে গেছেন তা কোন অংশে পুরুষ পরিচালিত পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্য কীর্তি থেকে নিকৃষ্ট নয় । শতবাধা ও সমাজের উৎপীড়ন সহ্য করে যে ভাবে মহিলাগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা তাঁদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে । তাঁরা একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সুযোগ পেলে মহিলারাও পুরুষের সমকক্ষ কর্মক্ষমতার পরিচয় দানে সক্ষম । একদিন হয়ত এমন আসবে যখন মহিলারা সমান্তরালভাবে পুরুষের পাশাপাশি দেশের প্রতি কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম হবে । মনুর বিধান অনুসারে বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকার কথা চিন্তায় আসবে না । নারী পুরুষ উভয়েই সমানতালে পা মিলিয়ে চলবে সেদিনই আসবে দেশের, জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল । তার জন্য হয়ত আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না । বর্তমান সমাজের মেয়েরা দুই পায়ে ভর দিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে ভীরুতা, দুর্বলতা, লজ্জা, সংকোচ কাটিয়ে নিজেকে রক্ষার দায়িত্ব এখন অনেকটাই নিজেরা বহন করতে সক্ষম হয়েছেন । অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশী সংখ্যক মহিলা শিক্ষিত হয়ে

সমাজের বিভিন্ন দিকে তাদের কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর বহন করতে সক্ষম হবে — এআশা নিরাশা মাত্র নয় ।

জগদীশ্বর তাঁর কন্যা সন্তানদের যেদিন মানুষ হিসাবে দেশের পুরুষজাতির মত শিক্ষাদীক্ষা, সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল করে জগতের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, সেদিনই হবে আমাদের চরম আনন্দের দিন ।

এখনও নারী সমাজে তার যোগ্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়নি । যদিও শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক এখনও মনে প্রাণে পুরানো সেই সংস্কার আঁকড়ে আছেন । এঁরা বাইরে বড় বড় কথা বললেও যুগ যুগ সঞ্চিত কু-সংস্কারের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি পাননি । এক্ষেত্রে মহিলাদেরই সেই অক্টোপাশের বন্ধন মুক্ত করে সবেগে বেরিয়ে আসতে হবে । তাই বলে সমাজ সংসারকে অস্বীকার করলে চলবে না । মহিলাগণকে তাদের শিক্ষার আলোকে দেশকে, সমাজকে তাদের ভুলগুলি শুধরে নেবার জন্য বোঝাতে হবে যে, সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের মনের বিবর্তন তথা চিরাচরিত প্রথাগুলির সংস্কার সাধন একান্তভাবেই দরকার। তবেই তো নারী-পুরুষের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে। 'জয় মা, করুণাময়ী, তোমারী ইচ্ছা পূর্ণ কর এ ভব সংসারে। তোমার সৃষ্টির অর্দ্ধেক অংশ তুমি পঙ্গু করে রেখ না। তুমি প্রেমময় । তোমার প্রেম সুধা বর্ষণ করে মোদের দুঃখ হরণ কর ।' প্রেমময়কে আহ্বান করে লেখিকা বলছেন —

যখনই আকুল প্রাণে প্রকৃতির পানে চাই,
অনন্ত সুখের স্রোতে ডুবে যাই, ভেসে যাই ।
কার হাসি, কার গান, ঘিরে আছে বিশ্বময়,
তোমারি তোমারি সব তুমি দেব প্রেমময়
সংসারে চাহিয়া দেখি একি শোভা কি মধুর,
প্রেম প্রীতি দয়ামায়া সুবাসেতে ভরপুর ।
জীবনের যত ভার, যত দুঃখ পাইলাম,
প্রেমের জগত তব তুমি দেব প্রেমময় ।
হৃদয়ে যে ফোটে আলো, জাগে শুভ চিন্তারাশি
ছোট ছোট প্রাণভরা কত ভালবাসাবাসি ।
পরের ব্যথায় যে গো বুক ভেসে নদী বয়।
দাও প্রেমের কণা তুমি দেব প্রেমময় ।

তোমারি প্রেমেতে নাথ ত্রিভুবন মাতোয়ারা ।
তোমারি প্রেমের জয় গাহিছে তপন তারা ।
এত সুধা কেন দেব ছড়ালে ভুবনময়,
প্রেমের কাঙ্গাল আমি তাই তুমি প্রেমময় ।
তোমারে যে ভালবাসি তুমি প্রেমময় বলে,
সুধাস্বরে ডাক তাই প্রাণ মন যায় গলে ।
অনন্ত প্রাণের সাধ তোমাতেই তৃপ্ত রয়।
বিফল জীবন মোর তোমাতে সফল হয় ।[৩৩]

'আলোক' — ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে আলোক সঙ্ঘের মুখপত্র স্বরূপ 'আলোক' নাম্নী পত্রিকাখানি প্রকাশ পায় । প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবী যুগ্মভাবে এর সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন ।

তৎকালীন বহু মনীষী 'আলোকে'র সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে পত্র পাঠিয়েছিলেন ।—

"শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. বিদ্যাবিনোদ
আসানসোল
১৪ই মার্চ, ১৯৩৯
'আলোক' সম্পাদক মহাশয়েষু —
মান্যবরেষু,

আপনাদের সুন্দর চিঠিখানির জন্য ধন্যবাদ । নূতন মাসিক পত্রিকার 'আলোক' নাম রাখা যেন সার্থক হয় । অনেক দায়িত্ব লইয়াছেন । একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে যাত্রাপথ সুগম হইতে পারে ।

অর্থাভাবের অপেক্ষা দলাদলিকেই বেশী ভয় করি । 'কানু' ছাড়া গীত নাই, কিন্তু পলিটিক্স্ ছাড়া সাহিত্য সেবা সহজ বলিয়া মনে হয়না ।

দুঃখী বাঙ্গালীর কহিনুর বাংলাভাষা। সেই ভাষায় ইন্দ্রজাল আছে— যাহার পরশে সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিয়া উঠে, সকল দুয়ার আপনি খুলিয়া যায়।

আকাশের 'আলোকে'র সাহায্যে সাহিত্য ও কাব্যের মধ্য দিয়া সেই ভাষার চর্চ্চা সংযত ও স্থায়ীভাবে সম্ভব হইবে ।

আপনাদের সুখী সমাজের এই নব উদ্যমের সহিত আমার বিশেষ

সহানুভূতি আছে।

বিনীত —

শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবজজ্- আসানসোল। [৩৪]

আরো বহু মনীষীর পত্রগুলি এরূপ ঃ—

"'আলোক' মাসিক পত্রের নাম সার্থক হউক ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হউক, এই কামনা করিতেছি।"

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮.২.৩৯ [৩৫]

"আপনাদের কাগজের দীর্ঘজীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।"

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১৮.২.৩৯ [৩৬]

Rai Saheb
U.N. Mondal
Hony. Magistrate

Sanctoria
P.O. Dishergarh
Burdwan

Date - ১১.৪.৩৯

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বি. এ. বিদ্যাবিনোদ

মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

আপনাদের চিঠিপত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। আপনাদের নব উদ্যমে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। পৃষ্ঠপোষকরূপে আপনাদের 'আলোক' পত্রিকার উন্নতিকল্পে আমার অযোগ্য শিরে গুরুভার দিয়াছেন ব'লে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যথাসম্ভব যত্নের ত্রুটি হ'বে না। প্রার্থনা করি আপনাদের 'আলোক' পত্রিকার নাম সার্থক হ'ক এবং সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্র ফলে ফুলে সমৃদ্ধিমান হ'য়ে উঠুক।ইতি

বিনীত নিবেদক

শ্রী উপেন্দ্রনাথ মন্ডল [৩৭]

"আমার শুভ কামনা জানাচ্ছি।"

শ্রী কালিদাস রায় [৩৮]

"P. N. Mandal
General Contractor
Bus owner etc,

Sanctoria
Dishergarh P.O.
(Burdwan) Dated 12th April 39

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বি. এ. বিদ্যাবিনোদ (সম্পাদক)
ও শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ চৌধুরী (কর্ম্মসচীব)
মহোদয়গণ সমীপেষু
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের পর পর সব চিঠিগুলি পেয়েছি — সুন্দর ভাষা - সুন্দর ভাব। চিঠিগুলি প'ড়ে গভীর আনন্দ পেয়েছি।

সর্ব্বদা মনে রাখবেন গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়েছেন, বহু বাধা-বিঘ্ন আপনাদের সুপথের অন্তরায় হ'য়ে দাড়াতে পারে, হিংসাপরায়ণ বিরোধীদলের (অর্থাৎ যারা আপনাদের উন্নতি চায় না) টিট্‌কারি অট্টহাসি প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে বিচলিত ক'রে তুলবে — এসব দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হবেন। মহৎ উদ্দেশ্যের একমাত্র সহায় ভগবান আর আপনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

পত্রিকা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই ভূধরবাবু তিনশত গ্রাহক সংগ্রহ করেছেন শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি, এই অক্লান্ত কর্ম্মীকে ধন্যবাদ তৎসহ যোগ্য সম্পাদক প্রফুল্লবাবুকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্ছি।

আপনাদের 'আলোক' মাসিক পত্রিকার পরিচালক রূপে আমায় পাইবার যে অনুরোধ জানিয়েছেন — ইচ্ছা থাক্‌লেও এ অযোগ্য শিরে সে ভার বহনের শক্তি নাই। সাহিত্য রসিক হ'তে পারি বটে, কিন্তু সাহিত্যের ধার কিছুই ধারি না, তা ছাড়া সময়ের অভাব একান্তই। অতএব এ গুরুদায়িত্ব এ অযোগ্যশিরে অর্পিত না হলেই ভাল হয়।

আসানসোল কয়লার দেশ, বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা — এখানে হয়ত সাহিত্যিক বা সাহিত্য-রসিকের অভাব না থাকতেও পারে কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চা বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না - সেই সাহিত্যহীন অন্ধকার ভূমিকে 'আলোক' দ্বারা আলোকিত কর্ব্বার যে প্রয়াস পেয়েছেন এই সাধু প্রচেষ্টা আপনাদের সফল হউক,

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 'আলোক' বিকশিত হউক, আসানসোল সাহিত্য সাধনার কেন্দ্র হ'য়ে উঠুক এই আমার আন্তরিক কামনা।

বাণীমন্দিরের ভিত্তিকে দৃঢ় ক'রে গ'ড়ে তুলবার জন্য যৎসামান্য ২৫ পঁচিশ টাকা প্রেরণ কল্লেম। বাণী জননীর অকৃতী সন্তান ব'লে যেন মাতৃপূজার প্রেরিত অর্ঘ্য উপেক্ষিত না হয় এই আমার প্রার্থনা। আপনাদের এই সাধু উদ্যমের সহিত আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। ইতি—"

বিনীত নিবেদক —

শ্রী প্রমথনাথ মন্ডল [৩৯]

এরূপ বহু লেখক-লেখিকা মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলি সম্পর্কে তাদের অন্তরের ভালবাসা ও উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় বহুপত্র পত্রিকা অফিসে জমা হয়েছিল। সব পত্রগুলির উল্লেখ এখানে করা হল না। তবে যে কয়েকখানি প্রশংসাপত্রের উল্লেখ এখানে করা হল তাতে বোঝা যায় যে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকাগুলি জনমানসে একটা আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তথ্যসূত্র ঃ

১) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শক।
২) 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ পৃ: ১৬০।
৩) 'এডুকেশন গেজেট', ১২৮২, ২৯ শে শ্রাবণ।
3) 'বান্ধব', ১২৮২, ভাদ্র সংখ্যা।
৫) 'এডুকেশন গেজেট', ১২৮৪, ১৮ই ফাল্গুন।
৬) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ১৪শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬, পৃ: ৬৪১।
৭) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ১৪শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬, পৃ: ৬৪১ - ৬৪২।
৮) 'ভারতী', ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃ: ১৩১-১৩২।
৯) 'ভারতী', ৪০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃ: ১০-১৩।
১০) তদেব পৃ: ১৩।
১১) 'ভারতী', ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃ: ২৬।
১২) 'ভারতী', ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃ: ২৯।
১৩) 'ভারতী', তদেব পৃ: ২৩।
১৪) 'ভারতী', তদেব পৃ: ১৩৮।
১৫) 'ভারতী', তদেব পৃ: ১৩৯।
১৬) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ১৪শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬, পৃ: ৬৪৩।
১৭) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ১৪শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬, পৃ: ৬৪৩।

১৮) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ১৪শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬, পৃ: ৬৪৩।
১৯) 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ', ২৯ শে জুলাই, ১৮৮৭।
২০) 'এডুকেশন গেজেট', ২৯ শে এপ্রিল, ১৮৮১ ।
২১) 'এডুকেশন গেজেট', ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ।
২২) 'এডুকেশন গেজেট', ৩০ শে নভেম্বর, ১৮৮৩ ।
২৩) 'মাহিষ্য মহিলা', ১ম ও ২য় খন্ড, আশ্বিন, ও কার্ত্তিক, ১৩২০, ৩য় ভাগ।
২৪) 'মাহিষ্য মহিলা', ১ম ও ২য় খন্ড, আশ্বিন, ও কার্ত্তিক, ১৩২০, ৩য় ভাগ।
২৫) 'মাহিষ্য মহিলা', ১ম ও ২য় খন্ড, আশ্বিন, ও কার্ত্তিক, ১৩২০, ৩য় ভাগ।
২৬) 'মাহিষ্য মহিলা', ১ম ও ২য় খন্ড, আশ্বিন, ও কার্ত্তিক, ১৩২০, ৩য় ভাগ।
২৭) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, পৃ: ৫৩৬।
২৮) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪, পৃ: ২৩৯।
২৯) 'প্রভাতী' শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৮, দশম প্রকাশন, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংকলন ।
৩০) প্রভাতী, তদেব ।
৩১) প্রভাতী, তদেব পৃ: সূচিপত্র অংশ ।
৩২) 'জয়শ্রী', ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ১ ।
৩৩) 'অন্তঃপুর', ২য় বর্ষ, ১৭ ও ১৮ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ২য় ভাগ, ১ম কল্প, ইং- মে, জুন, ১৮৯৯, পৃ: ৯০ ।
৩৪) 'আলোক', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬, পৃ: ১৬।
৩৫) 'আলোক', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬, পৃ: ৩ ।
৩৬) 'আলোক', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬, পৃ: ২১ ।
৩৭) 'আলোক', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬, পৃ: ৮১ ।
৩৮) 'আলোক', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬, পৃ: ২১ ।
৩৯) 'আলোক', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬, পৃ: ৮৩।

—:—

৪র্থ অধ্যায়

সমসাময়িককালে পুরুষ-সম্পাদিত সাহিত্যপত্র ও মহিলা-সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার তৌল বিশ্লেষণ

ক. বিষয়বস্তুগত ঃ

উনিশ শতক ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী জাতিকে এনে দিয়েছিল দীর্ঘদিনের বন্ধন থেকে মুক্তির আনন্দ। এই শতকটিকে ইতিহাস চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখবে। বিগত শতাব্দীগুলিতে একটু একটু করে যে কু-সংস্কারের আবর্জ্জনা সমাজের বুকে স্তূপীকৃত হয়েছিল হঠাৎ পাশ্চাত্যের এক দমকা হাওয়া এসে সেই জমাট বাঁধা আবর্জ্জনার স্তূপে এক বিরাট ফাটল সৃষ্টি করে এবং সেই ফাটল উদ্‌গীরিত ধূমপুঞ্জের বিষবাষ্প থেকে মুক্তির জন্য কিছু লোক সচকিত হয়ে উঠেন ।

যিনি সবচেয়ে বেশী সচকিত হয়েছিলেন তিনি হলেন যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায় । তিনি ছিলেন জমিদার পুত্র । তাঁর সাহায্যকারী বন্ধুদের মধ্যে তখন অনেকেই ছিলেন জমিদার — যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির কালীনাথ রায়, তেলেনী পাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । রামমোহন রায় প্রথম পুরুষ যিনি অনুভব করেন যে দেশ তথা জাতি তথা সমাজ চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে । সমাজের এক অংশ ধীর গতিতে চললেও অপর অংশ একেবারেই গতিহীন, স্থবির । নারী ও পুরুষ নিয়ে সমাজ সংসার । পুরুষ যদি বা চলছে কিন্তু সমাজের অপর অঙ্গ একেবারেই চলচ্ছক্তিহীন বলে তার গতিও মন্থর । তিনি অনুভব করলেন, সমাজের অপর অঙ্গ চলমান না হলে দেশ তথা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এমনকি দীর্ঘদিনের পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি ও যন্ত্রণা থেকেও ভারতবাসী কোনদিন মুক্ত হতে পারবে না ।

রামমোহনের চেষ্টা ও অক্লান্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলেই সমাজের প্রথম

ও প্রধান যে আবর্জ্জনার স্তূপ দূর হল তা হল সতীদাহের মত নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে বন্ধ করা। স্ত্রি-শিক্ষার বিরোধিতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি সমাজজীবনে যে অধঃপতন ডেকে এনেছিল তা থেকে মুক্তির জন্য দেশের অনেকেই তখন সচেতন হয়ে ওঠেন। অনেক বাদানুবাদ ও আন্দোলনের পর পরবর্তী আর একটি সামাজিক বাধার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়। নারী শিক্ষিত হয়ে সমাজের বৈষম্যের প্রতি সোচ্চার হয়ে উঠেন এবং সামাজিক বিভিন্ন কু-প্রথাগুলি যা কেবলমাত্র মহিলাদেরই ভোগ করতে হত তার কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সাহিত্যচর্চ্চার সাথে সাথে নিজেদের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়েও সোজা হাজির হন জনতার আদালতে। মহিলাদের পক্ষ অবলম্বন করে সওয়াল করার লোকের অভাব হয়নি তখন।

শিক্ষা পেয়ে নারী উপলব্ধি করতে শুরু করছিলেন যে, সমাজের বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে অলসভাবে মুখ বুজে সব যন্ত্রণা সহ্য করলেই মুক্তি আসবে না, তাদের অধিকার কেউ এমনি এমনি দেবে না। এই অধিকার আদায় করতে হলে এরজন্য প্রতিবাদ চাই, প্রচার চাই, আন্দোলন চাই। যদিও অনেক নারী হিতৈষী সমাজ সংস্কারকগণ মহিলাদের সাহায্যের নিমিত্ত নিজেরাই আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কেবলমাত্র নারী হিতৈষী পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টাতেও নারীমুক্তি আসবে না। মহিলাদের নিজেদেরও সচেষ্ট হতে হবে। এরজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করে জনমত গঠন করা। এই উদ্দেশ্যে মহিলাগণ নিজেরাই পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে লেখনী ধারণ করেন। মহিলাকুলের উন্নতি ও শিক্ষা নিয়ে নারী হিতৈষী পুরুষগণও অনেক পত্র-পত্রিকায় প্রচার চালাতে থাকেন। একটি পত্রিকা একশত প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে পুরুষ-পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে অনেকেই তৎকালীন সামাজিক কু-সংস্কারগুলি দূরীকরণের জন্য যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন তেমনি সমাজ তথা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আনতে হলে দেশ কোন পথে অগ্রসর হলে মঙ্গল আসবে সেই উপায় নিয়েও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ও পত্র-পত্রিকায় জনমত গঠন করার মানসে লেখনী ধারণ করেছিলেন। দেশ তখন বিভিন্ন সমস্যার ঘাত- প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত। পুরুষ-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় দেশের সর্ববিধ সমস্যার বিষয় আলোচিত হত। সমস্যা কণ্টকিত সমাজে ভগীরথের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকাগুলি লেখনী দ্বারা ভগীরথের মর্ত্তে গঙ্গা আনয়নের মত দূরূহ কার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন ।

বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকে তাদের পুরানো প্রথাগত টোল বা চতুস্পাঠী ও মাদ্রাসায় সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী শিক্ষার বদলে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ অধিক উপযোগী বলে মনে করতেন । রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ভারতের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা উপলব্ধি করছিলেন যে চিরাচরিত শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা একেবারেই অল্প। রামমোহন রায় প্রাচ্য ন্যায়-দর্শন শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে অনুরোধ জানিয়ে তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্টকে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্র লেখেন ।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত রাজস্বের পরিমাণ থেকে বার্ষিক অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করবেন এই প্রতিশ্রতি দেন । ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস্' এই টাকা কিভাবে ব্যয় করা হবে তৎকালনী গভর্ণর জেনারেলকে একটি পত্রে তার বিশদ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা মানা তো হয়ইনি অধিকন্তু তা নিয়ে মতান্তর দেখা দিয়েছিল। একদল চেয়েছিলেন এই টাকা প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় ধরণের শিক্ষার পিছনে ব্যয়িত হোক এবং শিক্ষার মাধ্যম হোক ভারতীয় ভাষা । অপরদল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পিছনে এই অর্থ ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন । এর ফলে শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ব্যক্তিগণ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য তার আগেই কলকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুকলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এই মতবিরোধ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের আদেশক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের নীতি গৃহীত হয়েছিল । গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সদস্য মেকলে ভারতীয়দের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি মনে করতেন পশ্চিমী দেশগুলি আধুনিক ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে যেভাবে জীবনের বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, ভারতীয়গণও সেইরূপ

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা লাভ করুক। রামমোহন রায় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দিতে লর্ড আর্মহার্ষ্টকে তাই অনুরোধ করেছিলেন। তবে এর ফলে খুব অল্প সংখক ব্যক্তিই উপকৃত হয়েছিল। এর দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি ঘোষণা করেন যে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকারী কাজে অগ্রাধিকার পাবেন। ফলে যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারাই এর দ্বারা উপকৃত হন।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 'উডের শিক্ষাপত্র' (Wood's Education Despatch)। এই শিক্ষাপত্র অনুযায়ী ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াই হবে সরকারী শিক্ষা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে। কিন্তু উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাবে ইংরাজী ভাষাকেই উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। উডের শিক্ষাপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নীতির ফলেই ভারতীয়দের জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

এই শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের সাথে ভারতবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ইংরাজ সরকারের এর পিছনে যে অভিসন্ধিই থাক না কেন, এর ফলে ভারতবাসী উপকৃতই হয়েছিল। দূরদর্শী রামমোহন রায় এর গুরুত্ব অনুভব করেই একে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ইংরাজীভাষা শিক্ষা করে বহু ভারতবাসী পশ্চিমী উদার মানবিকতা ও সংস্কারমুক্ত যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অচিরেই বুঝতে পারছিলেন যে আধুনিক জগতে প্রবেশ করতে হলে নিজের দেশের যাবতীয় কু-সংস্কার ও গোঁড়ামি সর্বাগ্রে দূর করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই উনিবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। একেই বলা হয় উনিশ শতকের নবজাগরণ। এই নবজাগরণ বাংলাদেশেই বেশী লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে নব্য ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ এই নবজাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই নবজাগরণের ইতিহাসে বাংলার পরেই ছিল মহারাষ্ট্রের স্থান।

রামমোহন এই নবজাগরণের প্রথম ও প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন। অনেক

ঐতিহাসিক রামমোহনকে তাই আধুনিক ভারতের 'পিতা' আখ্যা দিয়েছিলেন। রামমোহন বুঝেছিলেন পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণ করলে ভারতীয়গণ উপকৃতই হবেন। পাশ্চাত্যের ভাবধারার মূল কথা ছিল মানবিক মূল্যবোধ। সবার উপরে মানুষ সত্য — এই ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র। দেবতার পরিবর্তে মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। উনিশ শতকের পূর্বে ভারতীয়দের জীবনে এই মানবিকতা বোধের উন্মেষ ঘটেনি। রামমোহন রায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে যুগপুরুষ বলা হয়। তবে সমকালে সম মতাবলম্বী আরো অনেকে — যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিগণ রামমোহনের সহায় হয়েছিলেন।

ভারতের সামাজিক কু-সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে রামমোহন সারাজীবন এককভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিঁনি 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভায় দেশের তৎকালীন বিভিন্ন সমস্যাগুলি কিভাবে দূর করা যায় তার উপায় আলোচিত হত এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা জনসাধারণকে অবহিত করানো হত। এগুলির মধ্যে প্রধান্য পেয়েছিল নারী সমস্যা।

ধর্ম সম্বন্ধেও রামমোহনের মতবাদে একটু ভিন্নতা দেখা যায়। তিনি বহু দেবতার পরিবর্তে একেশ্বরবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ছিলেন কু-সংস্কার মুক্ত উদার মূল্যবোধে বিশ্বাসী এক মুক্ত পুরুষ। তিনি তার মতবাদ যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন। তার চিন্তাধারা ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হত না বলে তৎকালীন সময়ে হিন্দুধর্মের কু-সংস্কার এবং খৃষ্টধর্মের গোঁড়ামিকে আক্রমণ করতে তিনি কোনভাবে কুণ্ঠিত হতেন না। এজন্য তাঁকে রক্ষণশীল হিন্দুদের সমালোচনা কম সহ্য করতে হয়নি। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতারও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মনে হত ব্রহ্ম উপাসনা সবচেয়ে শ্রেয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি ধর্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সভাই 'ব্রাহ্মসমাজে' পরিণত হয়েছিল। রামমোহনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল 'সতীদাহ প্রথা' নিরোধ আইন পাশ করানো। 'সতীদাহপ্রথা' বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষে প্রচলিত

থাকলেও রামমোহনের আগে আর কোন ভারতীয় এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেননি। ১৮১৮ সালে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে আপন মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন যে — এই প্রথা অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক। এই বই প্রকাশের পর বিরুদ্ধবাদীরা সোচ্চার হয়ে উঠলে তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করে বিরুদ্ধবাদীদের মত খন্ডন করেন। অবশেষে সরকারের সহযোগিতায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইন বলবৎ হয়।

উনিশ শতকের সূচনায় সমাজে নারীজাতির অবস্থা যে উন্নত ছিল না তার প্রতিও রামমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। মেয়েদের বুদ্ধি কম এই যুক্তি দেখিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখানো হত না। বালবিধবা মেয়েদের দুরবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে তাদের দুঃখ দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হন।

রামমোহন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভারতীয় সমাজজীবনে দুর্নীতি এমন ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছিল যার অবসান ঘটিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে এক অখন্ড ঐক্যসূত্রে বন্ধন করার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করেন।

ভারতীয় সমাজজীবনের খুঁটিনাটি নানা দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে জনমত সংগ্রহ ও সম মতাবলম্বী লোকদের একত্রিত করে সংঘবদ্ধভাবে সামাজিক কু-প্রথা ও কু-সংস্কারগুলি দূরীকরণের জন্য বাংলা, হিন্দি ও ফার্সি ভাষায় সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। রামমোহনের সমকালেই ভারতে সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগগুলি তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। রামমোহনের জন্মের মাত্র ছয় বৎসর বাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক ব্রিটিশ কর্মচারী জেমস আগাস্টাস হিকি প্রথম আমাদের দেশে সাংবাদিকতা সংস্কৃতির সূত্রপাত করেন। তাঁর চেষ্টাতেই 'বেঙ্গল গেজেট' নাম্নী পত্রিকাখানির আবির্ভাব ঘটেছিল ১৭৮০ সালের ২৯ শে জানুয়ারী। কলকাতায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র বসাবার কৃতিত্বও হিকির প্রাপ্য। যদিও গেজেট প্রকাশের ১৪ বৎসর আগে উইলিয়াম বোল্টস্ চেষ্টা করেছিলেন কলকাতা থেকে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের। কিন্তু কোম্পানির কাছে আবেদন জানিয়ে অনুমতি পাননি। তবে ভারতের

অন্যান্য প্রদেশ থেকে পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৭৮৫ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'মাদ্রাজ কুরিয়ার', ১৭৮৯ সালে বম্বে থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'বম্বে হেরাল্ড' এবং কলকাতা থেকে ১৭৮০ সালে দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে একখানি সাপ্তাহিক বের হয়। ১৭৯৯ সালের মধ্যে কলকাতা থেকে মোট ২৪ খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তদানীন্তন কালের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে রামমোহন চিন্তাভাবনা করতেন এবং জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেগুলি তুলে ধরতেন।

উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে ইয়ং-বেঙ্গলের নাম বিশেষভাবে জড়িত। ঐসময় হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রগণ ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যের দৃষ্টান্তে প্রবাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশের কু-সংস্কার ও যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাদের নেতৃত্ব দেন ঐ কলেজের এক তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই নবজাগরণ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই ছাত্রগণ ডিরোজিওর নেতৃত্বে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি সভা তৈরী করেন। 'এনকোয়ারার' নামক একখানি ইংরাজী পত্রিকা এবং আরো একখানি দ্বিভাষিক পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের পরিচালনায় প্রকাশিত হচ্ছিল। এইসব পত্রিকার পাতায় তৎকালীন সময়ের সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হত। নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি তার মধ্যে অন্যতম। এই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত তৎকালীন সময়ে সামাজিক নানা কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তখন দেশের অধিকাংশ লোক নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির বিরোধী ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র 'এনকোয়ারার' পত্রিকা এই কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ সালে 'Native Female Education' নামে স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি ইংরাজী রচনা লিখে পুরস্কার পান।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করে হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধুসূদন দত্ত প্রথম হয়ে একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । রামগোপাল ঘোষ ১৮৪২ সালে এই প্রবন্ধ রচনার জন্য সোনার ও রূপার পদক দুটি ছাত্রদের প্রদান করেছিলেন । ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করেন খৃষ্টীয় মিশনারিগণ। কিন্তু সেইসময় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন মিশনারিদের প্রচেষ্টার বাইরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল । তৎকালনী 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় লেখেন ঃ "কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয় লইয়া যে সমুদয় সমাচার পত্রে সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া স্ত্রী-বিদ্যার স্বপক্ষ-বিপক্ষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন । যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহারা নানাবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র .... করিয়া থাকেন । তদ্বিপরীতে যে সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তঁাহারা কেবল উপহাস করিয়াই আসিতেছেন। ফলতঃ কিরূপ উপায়দ্বারা দেশীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এ পর্যন্ত কেহই দর্শাইতে পারেন নাই । ..... আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রী বিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশহিতৈষী জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না, অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য্য বিষয়ে মনযোগী হউন ।"[১]

সমাজের একশ্রেণীর লোক অনুভব করতে শুরু করছিলেন যে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা কেবল সহানুভূতি প্রকাশ করেই স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে না, এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন । স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ইয়ংবেঙ্গলের উদারনৈতিক সদস্যরা সমাজ থেকে কু-সংস্কার দূর করতে যেমন বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন তেমনী উৎসাহী ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার, বহু বিবাহ রোধ প্রভৃতি সংস্কারমূলক আন্দোলনে । বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ইয়ংবেঙ্গলের প্রেরণাদাতা ডিরোজিও ছাড়াও আরো দুজন ডেভিড হেয়ার ও আলেকজান্ডার ডাফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ।

উনিশ শতকে ধর্ম নিয়েও বিরোধ দেখা দেয়। বহিরাগত খৃষ্টধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম সেসময় গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার পরিবর্তে ব্রহ্ম উপাসনা শ্রেয় মনে করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার গৌরব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে আরো বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় 'তত্ত্ববোধিনী সভার' জন্ম হয়। এই সভার মুখপত্র ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। খৃষ্টান পাদরিগণ এদেশীয়দের ধর্মান্তরিত করার অভিযানে মেতে উঠেছিলেন। 'ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অনেকে স্বধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাবশতঃ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন, আবার অনেকে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ধর্ম নিয়ে এইসময় প্রবল বাদানুবাদ চলতে থাকে। এই বাদানুবাদ চলছিল একদিকে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবৃন্দ ও অপরদিকে খৃষ্টান পাদরিগণ। এই বাদানুবাদ প্রবল আকার ধারণ করে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাউসে'র সরকার চোদ্দ বছরের উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁর এগারো বছরের স্ত্রী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মান্তরে দেবেন্দ্রনাথ খুব বিচলিত বোধ করতে থাকেন। তাঁর অনুরোধে অক্ষয় কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে লেখেন ঃ "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না ? আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব ?"[২]

কয়েকমাস বাদে আবার এই পত্রিকা লেখেন ঃ "নির্ল্লজ্জ মিশনারিরা শত বৎসরাবধি হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শত বৎসরাবধি খৃষ্টধর্ম্মে এ দেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্ন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে স্নেহের সন্তানকেও হরণ করিতেছে, তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না — তথাপি মিশনারিদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদুপায় ধার্য্য হয় না। সত্যের পথে যখন তাহারা কন্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা কি প্রকারে নীরব রহিয়াছেন ?"[৩]

এরপর গোড়া রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'ধর্মসভা' ও 'ব্রাহ্মসভা'র লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে গাড়ি করে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের ছেলেদের পাদরিদের স্কুলে না পাঠাবার অনুরোধ করেন। এদের মিলিত চেষ্টায় 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটি বিদ্যালয় খোলা হয় এবং তার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন ভূদেব

মুখোপাধ্যায়। এই স্কুলে হিন্দুদের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল । দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন — সেই অবধি খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল। এই প্রচার অভিযানে দেবেন্দ্রনাথ নিজে এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘ বারো বৎসরকাল এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের কার্যভার অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে ধর্ম ছাড়াও সামাজিক বহু বিষয় নিয়মিত আলোচিত হত। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলেও এতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হত ।

উনবিংশ শতকের চতুর্থদশক বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে ছিল জর্জ্জরিত। 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে দেশের প্রগতিশীল গোষ্ঠী সমাজের জটিল সমস্যাগুলি দূরীকরণার্থে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং কিভাবে এই সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতিকার করা যায় তার উপায় খুঁজতেন এবং তাদের মতামত পত্র-পত্রিকায় জনসাধারণের দরবারে তুলে ধরতেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরের' পাতায় তাদের বাদানুবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হত । সামাজিক সমস্যাগুলি দূরীকরণের ব্যাপারে সকলেই একমত ছিলেন । কিন্তু বিরোধ দেখা দেয় ধর্ম নিয়ে । ইয়ংবেঙ্গলের একটি গোষ্ঠী ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী ছিলেন। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি খৃষ্টধর্মের অনুরাগী ছিলেন । ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়ের বিরুদ্ধেই তিনি বিরূপ মনোভাব প্রচার করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্য ছিল—নব্যশিক্ষিত স্বধর্ম বিদ্বেষী যুবকদের মনোভাব পরিবর্তন করে স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগ্রত করা এবং পাদরিদের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী প্রচারের প্রতিবাদ করা । কিন্তু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের সমর্থকদের আচরণে পাদরিরা খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধা পেয়েছিলেন. ।

এই ধর্ম আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক অক্ষয় কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন বাস্তববাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তিনি কেবলমাত্র নিজেকে ধর্ম আন্দোলনের মধ্যেই ব্যাপৃত রাখেননি, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব

যথাযথভাবে পালন করলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে প্রধান্য দেবার চেষ্টা করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ধর্ম অপেক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ। ঈশ্বরচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমার এই দুজনেই ছিলেন যুক্তিবাদী পুরুষ, এঁদের দুজনের সহযোগিতা ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তৎকালীন সময়ের বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে উঠতে পারত না। খৃষ্টধর্ম প্রচারের উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া ছাড়াও সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী'র অবদান অসাধারণ। 'তত্ত্ববোধিনী'র গ্রন্থাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সাহায্য ছাড়া অক্ষয়কুমারও একা 'তত্ত্ববোধিনী'কে সঠিক পথে ধরে রাখতে পারতেন কিনা বলা কঠিন। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমাজে তার গম্ভীর ভাবের রচনা দ্বারা 'তত্ত্ববোধিনী'কে তিনি তৎকালীন সমাজের একখানি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকারূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তৎকালীন সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। হিন্দুরা প্রথমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের প্রগতিশীল অংশ বলে মনে করতেন। তিনি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিধবাবিবাহ, আন্তর্জাতিক পরিণয়, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ—তিনি এগুলির বিরোধী ছিলেন। এইসব বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ার ফলে নবীন ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি সভা তৈরী করেন। কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে কেশব সেনের বিরোধ দেখা দিলে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে ভক্তির পথ অবলম্বন করেন। আনন্দমোহন প্রভৃতি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের'র প্রতিষ্ঠা করেন। দলাদলি, মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে সমাজের বহু কু-সংস্কার দূর হয়েছিল। ব্রাহ্মগণ অবতারবাদ, গুরুকরণ, বহু দেব-দেবতার পূজা, জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিবাহের বয়স বর্ধিতকরণ, সামাজিক সাম্য, কন্যার স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রভৃতির পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রাহ্মগণ কিছুটা ভোগবিলাসে মত্ত থাকলেও সমাজকে আধুনিক স্তরে উন্নীতকরণের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

নিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করার জো নাই।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার দৌলতে বাল্যবৈধব্যের সংখ্যা যেমন তৎকালীন সময়ে সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তেমনি সতীদাহ প্রথা নিরোধের ফলেও সমাজে বিধবার সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এরা সমাজের বোঝা হয়ে উঠেছিল। এদের না ছিল শিক্ষা, না ছিল কোন আর্থিক সম্বল । স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন দাবী পর্যন্ত তখন ছিল না । স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়ভাবে এরা সন্তান-সন্ততি নিয়ে অপরের গলগ্রহ হয়ে নিদারুণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজের বোঝাস্বরূপ এই বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হন । অনেক বিচারবিতর্ক ও বাদানুবাদের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বাংলার সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে চিরকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। তাঁর যেমন ছিল যুক্তিবাদী মন তেমনি দুর্জয় সাহস। তখনকার সমাজের পতিহীনা নারীদের সামাজিক দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে সমসাময়িক সমাজের সহস্র বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে সাহসের জোরেই সমাজ-সংস্কারের কঠিন দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ আইন পাশ করানো ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান সৎকর্ম । ১৮৫৫ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয় । আইন পাশ করিয়েই তিনি সংগ্রামে ক্ষান্ত দেননি। নিজ অর্থে বহু বিধবার বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়েছেন । এজন্য বহু ঋণের বোঝাও তাঁকে সারাজীবন বহন করতে হয়েছিল ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারের কাজের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি । তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল বাংলা গদ্যভাষাকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করা । এজন্য বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য ভাষার জনক বলা হয় । বাংলা গদ্যভাষা বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম নতুন সাহিত্যের যোগ্য বাহনরূপে গড়ে উঠেছিল । তিনি যেমন বহু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন তেমনি তিনিই প্রথম বাংলাভাষাকে সংযত ও সুবিন্যস্ত করে শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দানের কথা স্বীকার করে বলেছেন—"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন । তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।

ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।"[৪] বাংলাভাষাকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে বিদ্যাসাগরের অবদান যে কি তা রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাষা শিল্পী তো বটেই সাহিত্য স্রষ্টা বলেও মনে করতেন।

তখন দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল নিরক্ষর। অল্প কিছু সংখ্যক নব্য ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া আর যারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন তাঁরা মাতৃভাষা বাংলা, আরবী ও ফার্সি ভাষাতে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তখন মাতৃভাষা বাংলারও ছিল করুণ অবস্থা। বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্য ভাষা এমন এক স্তরে ছিল যা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি দূরে থাক, মনের ভাব ঠিকমত প্রকাশ করাও ছিল কষ্টসাধ্য। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সেইভাষাকে নতুন সাহিত্যের যোগ্য ভাষারূপে সংযত ও সুবিন্যস্ত করে শিল্পরূপ দান করছিলেন।

বিভিন্ন সমস্যা ও নানা কু-সংস্কারের আবর্তে বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী তখন দিশেহারা। সমাজের আপামর জনসাধারণ অশিক্ষার অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কেবল যে মহিলাগণই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল তা নয়, সমাজের অধিকাংশ পুরুষগণেরও ছিলনা কোন শিক্ষা। কেবল দেশাচারের দ্বারাই তারা চালিত হতেন। মানবিকতার লেশমাত্রও ছিল না তাদের আচরণে। সমাজের এই দুর্জয় বাধা অতিক্রম করতে গোটা উনবিংশ শতক ধরেই সংগ্রাম চলছিল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে কিছু আলোর নিশানা দেখা দিলেও তারপরেও সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। পরাধীনতার গ্লানি ও শাসকগোষ্ঠীর অবিরাম অত্যাচার ও শোষণ সমানেই চলছিল গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। তবে বঙ্গদেশেই তার ব্যাপকতা ছিল অধিক। এই কারণেই হয়ত জাতীয় চেতনার স্ফুরণ প্রথমে বঙ্গদেশেই দেখা দিয়েছিল। গোটা বঙ্গদেশের সমাজজীবনে তখন একটা নৈরাজ্য বিরাজ করত। বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জালে এমনভাবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল যা থেকে মুক্তির কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। ইংরেজ শাসনের ফলে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী উদার মুক্ত ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বঙ্গবাসী তথা

ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল তাদের শোচনীয় অধোগতির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী-পুরুষ উভয়ের সমান শিক্ষার সুযোগ এবং সামাজিক কু-সংস্কারগুলি দূর করে এক মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজ ব্যবস্থার ভয়াবহ রূপটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পুরুষ পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় তৎকালীন সমাজের সর্ববিধ সমস্যা নিয়েই আলোচনা, বাক্‌বিতণ্ডা ও চাপান-উতোর চলত। 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে প্রগতিপন্থীরা ছাড়াও ব্রাহ্মগণ এই সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। যে আন্দোলন রামমোহন রায় শুরু করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাকে আরো জোরদার করেন। তাদের সহযোগিতা ও সংগ্রামের ফলে সামাজিক বাধাগুলি একে একে অপসারিত হয়েছিল। তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। তৎকালীন চিন্তানায়কগণ তাদের চিন্তার ফসলগুলি জনমত সংগ্রহের জন্য পত্রিকার পাতায় তুলে ধরতেন।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহিলাগণও সাহিত্য সাধনার সাথে সাথে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য তার অনেক পূর্ব থেকেই মহিলাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক কু-প্রথার বন্ধন হতে মুক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমাজ হিতৈষী পুরুষগণ প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। শিক্ষারাজ্যে প্রবেশ করে নারী তাঁদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে নিজেরাও পূর্ব অপেক্ষা অধিক সচেতন হয়ে উঠেন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে পুরুষ পরিচালিত পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় মহিলাগণ তাদের অভিযোগগুলি নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা রচিত পত্র-পত্রিকার প্রধান ও অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল - সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি, অবরোধ মোচন, শিক্ষার অধিকার, প্রকাশ্যস্থানে গমনাগমন, বিভিন্ন সামাজিক কু-প্রথাগুলির বিলোপসাধন (যা কেবলমাত্র মহিলাদেরই ভোগ করতে হত), পারিবারিক কঠোরতার হ্রাসসাধন, পুরুষের সাথে কথোপকথন, পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতি সাধন, গমনাগমন ও কথাবার্তায় স্বাধীনতা, আর্থিক স্ব-নির্ভরতা, স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন, সন্তান পালন বিষয়ে কিঞ্চিত স্বাধীনতা,

ভোটাধিকার, কর্মের অধিকার — এক কথায় সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের সম-অধিকারের দাবী নিয়ে আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনেও মহিলাগণ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে পুরুষের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

বিষয়বস্তুর গভীরতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে বিচার করলে পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকাগুলি ছিল অনেক বেশী সংগ্রামী ও ব্যাপক। নারী পরিচালিত পত্রিকাগুলি পুরুষ পরিচালিত পত্রিকার আদর্শে গঠিত হলেও রমণী কণ্ঠে রমণী সমাজের অভাব-অভিযোগ ও দাবী দাওয়ার কথাগুলিই তাদের পত্রিকার পাতায় ধ্বনিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিও সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

খ) রচনাশৈলীগত ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হবার ফলে মহিলাগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তদানীন্তন কালের মহিলাদের অনেকেই তখন নাম গোপন করে সমকালীন নামী পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ কৌমুদী'তে কিছু কিছু রচনা প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। তখন অনেকেই সেগুলিকে মহিলা-রচিত বলে বিশ্বাস করতে চাইতেন না। কারণ মাঝে মাঝে সম্পাদকের কাছে এমন সব উচ্চমানের লেখা আসত যা মহিলা রচনা বলে বিশ্বাস করতে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতেন এবং তা সত্যিই মহিলা-রচিত কিনা তার প্রমাণ পর্যন্ত দিতে হত। এভাবে সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অগ্রাহ্য করে শিক্ষিত মহিলাগণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাদের সৃষ্ট সাহিত্য যুগ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাহিত্যকর্মের সৌন্দর্য্য ও রচনাশৈলীর দিক থেকে বিচার করলে নিম্ন মানের ছিল না।

বাংলার তলিয়ে যাওয়া নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। নারীজাতির মধ্যে জ্ঞানের আলো, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্য নিয়েই এর আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সম্পাদনার দায়িত্ব ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। উপক্রমণিকাতে লিখিত হয়েছিল ঃ এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের

আবশ্যকীয় সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কু-সংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিসকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয় এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানসকল লাভ হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।"[৫] 'বামাবোধিনী'র হাত ধরেই পর্দার অন্তরালবর্ত্তিনী মহিলাগণ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কালি-কলম ধরতে সাহসী হয়েছিলেন । প্রথমে ভীরুতা তাঁদের শক্তিকে গ্রাস করলেও পরে সাহস সঞ্চয় করে তাঁরা পুরুষের তৈরী সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন । আপন শক্তিতে বিশ্বাস জন্মাবার ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে পত্র-পত্রিকার সম্পাদনাও শুরু করেন । সাহিত্যের জগতে তখনও মহিলাগণ শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে উপনীত হতে পারেননি, তা সত্ত্বেও তাদের রচনার ভাব, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির প্রশংসাই করতে হয়। বর্তমান বিচারে ব্যাকরণগত কিছু ত্রুটি থাকলেও ভাষার গতি ছিল সাবলীল । বক্তব্য বিষয় ছিল স্পষ্ট । পত্রিকা সম্পাদনার জগতে তুলনামূলক আলোচনা করলে বলা যায় যে পুরুষ পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার প্রকাশভঙ্গি মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার প্রকাশভঙ্গি থেকে ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। পুরুষের ভাষার ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য চোখে পড়ে। শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস প্রভৃতির দিক থেকেও কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় । পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে প্রকৃতিগত যে ভিন্নতা আছে তা তাদের লেখাতেও ফুটে উঠত ।

বহু স্বনামধন্যা লেখিকা 'বামাবোধিনী'তে লিখে তাদের মনের শক্তি বাড়িয়েছিলেন । অনেক অনামী-বেনামী গৃহবধূ তাদের মনের কথা, প্রাণের কথা লিখে নানা প্রশ্ন, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, সংশয়, জিজ্ঞাসা তুলে ধরতেন পত্রিকার পাতায়। সেই লেখাগুলি সবই ছিল মহিলাদের জন্য এবং সব মহিলারা তাঁদের প্রাণের কথাই ব্যক্ত করতেন তাঁদের লেখনীতে । তাই তাঁদের লেখার ভাষায় কখনও নম্রতা, কখনও ক্রোধ, কখনও আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রধান্য পেত । তৎকালীন মহিলাদের মনের কথার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন সমকালীন এক নারী, নাম কৈলাসবাসিনী দেবী । তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা' নামক গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে তিনি তাঁর মনের খেদ এইভাবে প্রকাশ করেছেন : 'ইহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন যে সকল সভ্যদেশীয় নারীগণাপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণেরাই অতি হীনাবস্থায়

অবস্থিতি করিতেছেন, আমাদিগের দোষাকর দেশাচারই ইহার আকর স্বরূপ হইয়াছে। এই দেশাচারের বশীভূত হইয়া আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মভিমানী মহোদয়গণ কি অপ্রিয় কার্য্যই না করিতেছেন ।..... হাঁ, জগৎপিতা, পরমবিধাতা পরমেশ্বর। আমাদের এই মনোবেদনা কতদিনে দূর হইবে ? কতদিনে এই বঙ্গদেশে জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইয়া অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিবে? হে বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণ! কতদিনে তোমরা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা হইয়া এই বঙ্গমাতাকে শোভিতা করিবে?"[৬] নানা কু-সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে মহিলাগণ তখন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় ছটফট করছিল। সমাজপতিগণের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না তাদের । অপরিসীম মনোবেদনা নিয়ে তাদের দিন যাপন করতে হত ।

সমকালীন মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অতি অল্প । বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে ছাত্রীসংখ্যা তেমন না হলেও ১৮৫৯ সালের পর থেকে বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল । প্রগতিপন্থী পরিবারের মেয়েরা স্কুলে আসতে শুরু করলেও যাঁরা বিত্তবান তাঁদের পরিবারের খুব অল্পসংখক বালিকাই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত স্কুলে আসত । তবে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারগুলিতে কোথাও কোথাও মেয়েদের গৃহশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বেথুন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা দেখে এই ম্যানেজিং কমিটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সরকারের কাছে তাঁরা যে রিপোর্ট পাঠান তাতে এই মন্তব্য করেন — বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রভাবেই অন্তঃপুরে গৃহশিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে । বাংলাদেশে নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে এইসময় এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যা বাংলা তথা ভারতের নারী প্রগতির ইতিহাসে লাল অক্ষরে খোদিত হয়ে থাকবে। নবীন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আচার্য পদে বরণ করে নেওয়া উপলক্ষে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই নবীন নেতা সস্ত্রীক তঁর কলুটোলার বাড়ী থেকে পাল্‌কি করে রওয়ানা দেবেন, এই সংবাদ আগে থেকে রটে যাবার ফলে কেশবচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনেরা বাড়ী ঘিরে ফেলে তার পথরোধ করেন। কেশবচন্দ্র অসীম সাহসিকতার সহিত বন্ধ ফটকের খিল ও তালা খুলিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেইদিন থেকেই

নারী প্রগতির রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়েছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর নারিগণই সবচেয়ে বেশী পরাধীন ছিল। পর্দা-প্রথার কড়াকড়িও বেশী দেখা যেতসমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে। অনেকেই মুখে স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করলেও মেয়েদের গৃহবন্দী করে রেখে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতাই তাঁরা করছিলেন। সমাজের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তাদের একদিকে ছিল বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কার এবং অপরদিকে ছিল নতুন শিক্ষা ভাবনার ফলে সামাজিক প্রগতি — এই দুই দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল তাদের।

'বামাবোধিনী' পুরুষ পরিচালিত পত্রিকা হলেও এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা ও নারীজাতির মঙ্গল সাধন করা। তৎকালীন আরো বহু পত্রিকা নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতির লক্ষ্যে জোরালো লেখনী ধারণ করেছিল। তখন ইংরাজী ও বাংলা মিলিয়ে অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটার', বেঙ্গলহরকরা', 'এনকোয়েরার', 'ফ্রেন্ডস্ অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হত। বাংলা ভাষাতেও দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক অনেক পত্রিকাই বিশের দশকে প্রকাশিত হচ্ছিল। বাংলা ভাষায় আদি পত্রিকার দাবী 'সমাচার-দর্পণ' কবলেও ঐ একই সালে ১৮১৮ তে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বঙ্গাল গেজেট'ও প্রকাশিত হচ্ছিল। তবে এ দুটির মধ্যে 'সমাচার দর্পণ' যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৭] ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দুগণ এতে বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার বিরোধিতা করে বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। আবার 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) পত্রিকাতে স্বদেশী রীতির বিরোধিতা করা হত। এই দুই ভাবধারার মধ্যবর্তী ছিল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (১৮৩১)।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদকত্বে 'সোমপ্রকাশে'র আবির্ভাব ঘটে। এই পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সমকালীন পত্র-পত্রিকার জগতে এর সমতুল্য আর কোন পত্রিকা ছিল না। এর পাতায় যেমন থাকত নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতির বিষয়ে নানা আলোচনা, তেমনি বিদেশী সরকারের শাসনের কুফল, ইংরাজ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হতাশা ও পেষণ প্রভৃতির দিকেও এই পত্রিকার নজর ছিল। ভাষার লালিত্য এবং যুক্তির তীব্রতায় দেশবাসীর মনকে

সহজেই আকৃষ্ট করেছিল এই পত্রিকাখানি ।

'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) এবং 'বামাবোধিনী' (১৮৬৩) দুটি পত্রিকাই প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল । ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী'র আবির্ভাব হলেও এতে ধর্ম ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, সাহিত্যালোচনা, নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতির প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছিল 'বামাবোধিনী'তে নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির বিষয় প্রাধান্য পেলেও ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিশু পালন, গৃহ চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হত ।

'বামাবোধিনী'র যুগে আরো অনেকগুলি নামজাদা পত্রিকার আগমন ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে 'ভারতী' (১৮৭৭), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' (১৯০১), জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' (১৮১৩), প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' (১৯১৪) প্রভৃতি । এগুলি সবই ভাব, ভাষা ও উৎকর্ষতার দিক থেকে ছিল 'বামাবোধিনী' অপেক্ষা অনেক আধুনিক। মহিলাদের পাঠোপযোগী 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭৫) ও 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। ক্রমে ক্রমে বনলতা দেবী সম্পাদিত 'অন্তঃপুর' (১৮৯৮), সরযূবালা দেবী সম্পাদিত 'ভারতমহিলা' (১৯০৫), কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদনায় 'সুপ্রভাতের (১৯০৭) আগমন ঘটে । 'সুপ্রভাত', 'ভারতমহিলা' 'জয়শ্রী' এগুলি ছিল রাজনৈতিক চেতনাপুষ্ট নারীবাদী পত্রিকা । ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত এইসব পত্রিকার বক্তব্য বিষয় ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি সুন্দর সাবলীল সংযত ভাষা এবং প্রবন্ধগুলিও ছিল গভীর ভাবোদ্দীপক । তৎকালীন এইসব পত্রিকাগুলির মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কার।

মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে নারী সমস্যা নিয়ে আলোচনা তো থাকতই অধিকন্তু এতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক রচনাও স্থান পেত ।

শিক্ষার সুযোগ পেয়ে মহিলাগণ প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁরা পুরুষের তুলনায় কোন অংশেই অযোগ্য নয় । এতকাল পুরুষ সমাজ নিজ স্বার্থে তাদের অন্ধকার জগতে রেখে দিলেও আজ ওরা মুক্ত হয়ে স্বমহিমায় নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে ব্যস্ত। শিক্ষারাজ্যে প্রবেশ করে নারী খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নিজেদের আসন পুরুষের

পাশে সমানভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । উৎকর্ষতার দিক থেকে নারীর রচনা কোন অংশেই পুরুষের অপেক্ষা নিম্নমানের ছিল না । সমকালীন পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত পুরুষ ও নারীর রচনার কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ "বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্মই নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয়না । এই অসার সংসারে মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র । অজাত এবং মৃত পুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খসন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্ত ক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে ? বিদ্যোপার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয় আকাশ জ্ঞানশশির আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমন্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না । তাহারা বিদ্যাবতী হইলে পিতৃ মাতৃ স্বামী প্রভৃতি গুরুজন সন্তানসন্ততি ও অন্যান্যের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতে হয় তদ্রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষমা হয়। পুত্র বিদ্বান হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃ কুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে, পুত্রী বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবলম্বী হইলে, সে যে তদ্রূপ পিতৃ এবং স্বামী উভয়কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি ?"[৮]

বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী বিবি তাহেরণ লেছা এই রচনাটি ১৮৬৪ সালের সম্ভবতঃ অক্টোবর - নভেম্বর মাসের আগেই 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশের জন্য পাঠান । কিন্তু লেখাটি এতই উচ্চমানের যে তা বামারচনা বলে সন্দেহ হওয়াতে তাহেরন লেছা সহ মোট পাঁচজন মহিলার উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় 'রচয়িত্রীরা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাল করিয়া প্রমাণ দিয়া পাঠাইলে' তবেই তাদের রচনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হবে । এরপর ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী - মার্চ সংখ্যার 'বামাবোধিনী'তে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল । মনে হয় লেখিকা ইতিমধ্যে প্রমাণ দিয়ে থাকবেন।

লেখিকা তাঁর রচনাতে বক্তব্য বিষয় জোরালো যুক্তির সাহায্যে একের পর এক উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন যে স্ত্রীলোককে শিক্ষাদান করা অবশ্য কর্তব্য। লেখিকা এমনভাবে তার বক্তব্য বিষয় পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন যে বিষয়বস্তু বোধগম্য নয় বলে কোথাও পাঠককে থমকে দাড়াতে হয়নি । বিদ্যাসাগরের রচনার অনুকরণে শ্বাস যতিএবং অর্থযতির মিলন ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায় . সামান্য একজন

বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীর পক্ষে এমন পরিমিত ভাষার ব্যবহার, অর্থবোধক জোরালো যুক্তি প্রয়োগ এবং রচনাশৈলীর চমৎকারিত্ব তখনকার অনেক গদ্য লেখকের তুলনায় ছিল পরিপক্ক। যুক্তিগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হিতোপদেশ থেকে ধার করে নিলেও প্রয়োগক্ষেত্র ছিল যথাযথ। এতে লেখিকার দক্ষতাই প্রকাশ পেয়েছে।

সমকালীন বাখরগঞ্জের সৌদামিনী দেব্যা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেন ঃ "পরমেশ্বর স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ ইহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে পুরুষগণ কেন আমাদিগকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন ? আমরা কি পরমপিতার সন্তান নই ? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসাস্বাদনে অনুরূপ সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কণামাত্রও প্রাপ্ত হইবনা। হে পরমাত্মন্‌। আমাদের এইরূপ দুরবস্থার কতদিনে অবসান হইবে, এবং কতদিনেই বা এই ঘৃণিত দেশাচারের বশীভূত হইয়া থাকিব। . . . . . . যিনি একবার বিদ্যার রস পান করিয়াছেন, বিদ্যা কি অমূল্য ধন, তিনিই বুঝিয়াছেন। হা বিদ্যা ! তুমি কি কেবল পুরুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছ ? না, আমাদেরও তোমার প্রতি অধিকার আছে।"[৯] ভাষার পারিপাট্য, শব্দের ব্যবহার এবং প্রকাশভঙ্গি তাহেরন লেছার মতই প্রশংসনীয় এবং সম কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

স্ত্রী-লোকদের বিদ্যাশিক্ষার মতো মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি নাই — এই মন্তব্যের প্রতিবাদে মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীদের উদ্দেশ্যে লেখেন ঃ—" বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিত ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যুনাধিক্য স্থাপন করে নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক ?" এমন এক শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন যারা প্রচার করতেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে দুশ্চরিত্র হবে তাঁদের উদ্দেশ্যে মদনমোহন আরো বলেন ঃ "যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখর দুশ্চরিত্র অহংকারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ বিহিত বোধ করিতেছি। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যানমধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্য পৃষ্ঠে উত্তানপাদ

হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন । ফলতঃ আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান মনুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈর আলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তি কারকেরা সেই সেই দেশ ও তত্তৎ সমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই।" যে যে মহাশয়েরা সবচেয়ে বেশী স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করে বলেছিলেন — মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে লাভ হবে না, তাঁদের কথার উত্তরে মদনমোহন আরো লেখেন — "আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল । কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত ।"[১০]

উনিশ শতকের মানুষ মনে করতেন ধনলাভের জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন । মেয়েরা তো আর পয়সা রোজগার করবে না, সুতরাং তাদের বিদ্যালাভের প্রয়োজন নেই । পন্ডিত মদনমোহন তাদের উদ্দেশ্যে সাহস করেই বলেছিলেন যে — প্রয়োজন বোধ করলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অর্থ উপার্জনেও নামবেন । তবে অফিসে চাকরীর কথা এতদূর তিনিও হয়ত ভাবেননি । মদনমোহনের এইরূপ বক্তব্যের উত্তর দেওয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল । এখানে ভাষার সঙ্গে শ্লেষ মিশ্রিত হয়ে তাঁর বক্তব্যকে জোরদার করেছিল বলা যায় । বলিষ্ঠ ভাষা, সুন্দর উপমা, নিপুণ রচনাশৈলী বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয় এই আপত্তির উত্তরে 'সুলভ পত্রিকা' মন্তব্য করেন — "এ প্রশ্নে আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না । কারণ বিদ্যার কি মারাত্মক শক্তি আছে ? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাঘ্র ? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয়, বিদ্যা তাহাকেই সংহার করিতে পারে । কিন্তু পত্নী পন্ডিত হইলে যে পতির প্রাণ বিয়োগ হয়, একথা অতি চমৎকার। 'চালে ফলতি কুষ্মান্ডং হরের্মাতুর্গালে ব্যথা ।' যদি নারী বিদ্যাবতী হইলে পতিহীনা হয়, তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে পুরুষ বিদ্বান হইলেও স্ত্রী-হীন হইতে পারে। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে যে বিধবা হয়, একথা কেবল হাস্যজনক মাত্র ।"[১১]

উপরের রচনাগুলি পাঠ করলে নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে প্রভেদ কতখানি তা বোঝা যায়। ধারালো যুক্তি প্রয়োগ, ক্ষুরধার তীক্ষ্ণভাষা এবং শ্লেষমিশ্রিত বাক্যের সাহায্যে আপন বক্তব্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। সমকালীন নারীরচিত সাহিত্যের ভাষার মধ্যে এতটা তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা যায় না। নারী রচিত প্রবন্ধে বক্তব্য বিষয় সহজ, সরল এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে একটা কমনীয় মাধুর্য্য লক্ষিত হয়।

তবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় পরে বেগম রোকেয়া ক্ষুরধার ভাষায় তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বাঙ্গালী চরিত্রের সমালোচনা করেছেন এইভাবে —"বাঙ্গালি নিরীহ, কোমল, দুর্বল এবং কাব্যিক, আরামপ্রিয় এবং কাপুরুষ; কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই তাঁদের উৎসাহ নেই।....

'কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিমা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা — এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে।" "যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা। যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী। যদি ভারতবর্ষকে একটা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা। ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা।" "আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুন্ঠন করা সহজ।" রোকেয়া পরিশ্রম বিমুখ, চাকুরিসর্বস্ব বাঙ্গালীজাতিকে আরো তীব্র ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি অনুকরণে ব্যঙ্গ করে লেখেন — "চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি মাথার মাণিক। চাকুরি বিনে বঙ্গবাসীর জীবনধারণ ধিক।"[১২] তিনি আরো বলেন বাঙ্গালী ইংরাজদের তোষামোদ করেন চাকরির জন্য। খেতাব অর্জনের জন্য। এটাও তাঁর কাছে ছিল উপহাসের বিষয়বস্তু। এঁরা ইংরেজদের পদলেহন; সংশোধন করে পুনরায় বলেন, জুতা লেহন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। বাঙ্গালী জাতিকে এই ধিক্কার এর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে করেছেন বটে, তবে তা ভিন্নতর ভাষায় ও ভিন্নতর মেজাজে। তবে লক্ষণীয় এই যে এই ধিক্কার দাতাদের মধ্যে রোকেয়া ছাড়া আর কোন মহিলা ছিলেন

না।

বিংশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলিতে নারী ও পুরুষের লেখনীতে ভাব, ভাষা ও রচনাশৈলীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কি চিন্তার ক্ষেত্রে, কি কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নারীর লেখাও ছিল পুরুষের মত বেশ পরিপক্ক। সমকালীন নারী ও পুরুষের লেখার কিছু অংশ তুলে ধরছি। যা থেকে উভয়ের লেখা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবেঃ "পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতি একে অন্যের পরিপোষক-বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ নিকৃষ্ট, একথা বলা চলে না। একদিকে মাতৃত্ব যেমন নারীকে দুর্ব্বল করে রেখেছে, অপরপক্ষে উহাই তো আবার শিশুশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছে। মাতৃত্ব নারীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এটা বলতে বড় ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেল্‌লে সমাজে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নিছক কল্পনা-বিজৃম্ভিত কথা শুনতে পাওয়া যায় যে, কানে তালা লেগে যায় এবং আমাদের দেশের পুরুষদের আত্মপ্রতারণা শক্তি দেখে' বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়।"[১৩]

মহিলা রচনার একটু নমুনা দিচ্ছি ঃ "কত আশা, উদ্বেগ, উল্লাস ও নৈরাশ্যে দ্রুত স্পন্দিত হৃদয় লইয়া বাঙলার নারী-সমাজ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিষাদ মলিন শঙ্কাকাতর নারী-জীবনের ভুম্যবলুণ্ঠিত মহিমা না জানি কোন স্পর্শমণির দিব্যস্পর্শে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। এস জাগরণ! তোমার অরুণালোকের পুলক -বন্যা নারী-জীবনের সমস্ত জড়ত্ব ও কু-সংস্কারের কালিমা ধৌত করিয়া ফেলুক। বিনম্রশ্রদ্ধা-প্রদত্ত নারী-হৃদয়ের অর্ঘ্য আজ তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু দ্বার তো একেবারে মুক্ত হইতেছে না। কতদিন আমাদিগকে পুরাতনের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা স্তূপ স্কন্ধে স্কন্ধে বহিয়া লজ্জাবনত শিরে তোমার দ্বারে কুণ্ঠিত করাঘাত করিতে হইবে? নিদ্রার আবেশ কি এখনও যায় নাই?"[১৪]

ঊনবিংশ শতক বাঙ্গালী জাতিকে পঙ্গুত্বের হাত থেকে রক্ষা করে মুক্তির দ্বারদেশে এনে উপস্থিত করেছিল। সমাজজীবনের অর্ধাংশ নারীজাতি বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী জাতিকে সজীব, সুন্দর এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথ নির্দেশ করে গিয়েছিল। এই শতকটি তাই বাঙ্গালী নারীর মুক্তির শতকরূপে ঘোষিত হোক। সমাজ জীবনের দুটি অঙ্গ—একটি নারী, অপরটি পুরুষ। উভয়ের সম-উত্থান ছাড়া জাতির মঙ্গল নাই। ঊনবিংশ শতক জাতির জীবনে এই

বোধোদয় এনে দিয়েছিল। ফলে মৃতপ্রায় জাতি সুস্থ, সবল হয়ে বিশ্বের দরবারে নিজের স্থান করে নিতে সমর্থ হয়।

তথ্যসূত্র :

১) 'বিদ্যাদর্শন' অগ্রহায়ণ, ১৭৬৪ শক।
২) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ৩য় ভাগ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৬৭ শক, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৩) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১৭৬৭ শক, ১ পৌষ।
৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর চরিত, পৃ: ৮ - ৯।
৫) উপক্রমণিকা, 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ভাদ্র, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।
৬) কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (কলিকাতা ১৮৬৩) পৃ: ১।
৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে' ১ম খন্ড, পৃ: ৯।
৮) বামাগণের রচনা, 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৭১, ফাল্গুন, ১৯ সংখ্যা, পৃ: ২৭৬।
৯) বামাগণের রচনা, 'বামাবোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ, ১২৭২, পৃ: নাই।
১০) 'সর্বশুভকরী পত্রিকা', আশ্বিন, ১৭৭২ শক।
১১) 'সুলভপত্রিকা', ২য় খন্ড, ১ - ২ সংখ্যা, ১২৬১ সাল।
১২) 'মতিচূর' — বেগম রোকেয়া, প্রথম খন্ড। 'নারীপ্রগতির একশো বছর' — গোলাম মুরসেদ, পৃ: ১৪০- ১৪১।
১৩) 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩০, ২৩শ ভাগ, ২য় খন্ড, ৫ম সংখ্যা, পৃ: ৬৭৫।
১৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ: ৫০৮।

—ঃ—

পঞ্চম অধ্যায়

সাময়িক-পত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে মহিলাগণের সাফল্য ও ব্যর্থতা

শিক্ষারাজ্যে প্রবেশ করে নারী নিজেকে সর্বক্ষেত্রেই সক্রিয় করে তুলতে বদ্ধপরিকর হল । জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থেকে এতদিন তারা শুধু পুরুষশাসিত সমাজে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার মধ্যেই নিজেদের জীবন তরীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল । আজ সে দিনের অবসান ঘটেছে । নারী নিজের মহিমা উপলব্ধি করতে শিখেছে । কোন কাজেই যে সে অক্ষম ও অপটু নয় এ কথার সত্যতা প্রমাণেও সে সফল হয়েছে । শিক্ষা মানুষকে সতেজ ও সবল করে । সেই শিক্ষার গুণেই নারী আজ তাব কর্মক্ষমতার জয়ধ্বজা দিকে দিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উনবিংশ শতক নারীকে এনে দিয়েছিল মুক্তির আনন্দ। সেই মুক্তির আনন্দে সে আর নিজেকে চার দেওয়ালের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয় দেবার জন্য বিভিন্ন কর্মে নিজেকে নিয়োজনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিল । এতকাল নারী নিজেদের অভাব-অভিযোগ পুরুষের মুখে শুনে আসছিল । কিন্তু শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে নারী নিজেদের অভাব অভিযোগ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল । শুধু তাই নয়, সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন।

এই প্রয়াসকে সার্থক করবার জন্য নিখিলভারত মহিলা সম্মেলন[১] ও নিখিল এশিয়া মহিলা সম্মেলন,[২] দেশের ও সমাজের মহিলাগণের কল্যাণ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের নিমিত্ত গঠিত হয়েছিল । বিভিন্ন প্রদেশের ও এশিয়া মহাদেশের মহিলা প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হয়ে সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকারের বৈষম্য দূর করতে এবং নরনারীর সম অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে স্থান লাভ করেছিল । (১) বার বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবী জানিয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট, লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট্‌বোর্ড প্রভৃতিকে অনুরোধ করে বলেন যে, গ্রাম, নগর ও নগরোপকণ্ঠে পাঁচ-বৎসরের মধ্যে বাধ্যতামুলক শিক্ষা এবং বিশ বৎসরের

মধ্যে সেই শিক্ষাকে সর্বত্র কার্যকরী করতে হবে। (২) নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, (৩) গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৪) অসাম্প্রদায়িক শিক্ষালয় স্থাপন, (৫) নারী পুরুষ উভয়ের শরীরচর্চ্চা, বয়স্কদের শিক্ষা ও ভোটাধিকার, (৬) সাম্প্রদায়িক মিলন, (৭) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, (৮) উত্তরাধিকার ও বিবাহ বিধির সংস্কার সাধন, (৯) অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অপরাধ মার্জনা করা, (১০) ভিক্ষুক সমস্যার সমাধান প্রভৃতি।[৩] নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল শিক্ষা, আর নিখিল ভারত এশিয়া সম্মেলনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা নারী পুরুষ উভয়ের সম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, পবিত্রতা রক্ষা করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করবার এবং অত্যাচারিতের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার মানসে নারী পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে অগ্রণী হয়েছিলেন। বাধা প্রতিপদেই তাদের উদ্যমকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছিল, তবু ভীত না হয়ে সেই বাধাকে অতিক্রম করতে নারী মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছিল।

যে কোন নূতন প্রয়াসের চেষ্টাকে চিরকালই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আর এতো দীর্ঘকালের বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত, লাঞ্ছিত নারীজাতির জাগরণ প্রচেষ্টা। নারীজাতির এই উদ্যমকে তৎকালীন সমাজের দীর্ঘ অংশই প্রথমে ভাল নজরে দেখেননি।

কোন কাজ শুরু করতে গেলেই প্রথমে চাই লোকবল, মনোবল, শিক্ষা, সাহস, উদ্যম ও সর্বোপরি অর্থবল। যতই মানসিক বল থাকুক না কেন অর্থ না থাকলে কার্যসিদ্ধি হয় না। মহিলাগণ তাদের লাঞ্ছনা বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি আনবার জন্য জনতার দরবারে তাদের অধিকারগুলি একে একে আদায়ের তাগিদে যেসব পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তার জন্য প্রথমে তো কিছু শিক্ষিত সমাজহিতৈষী পুরুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, এবং সে সাহায্য মহিলাগণ পেয়েওছিলেন। তবে তার সংখ্যা খুবই কম। 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে কিছু নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্যের উদার ভাবধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা, নারী জাগরণের কাজে সহায়তা যথেষ্ট করেছিলেন। কিন্তু সমাজের বিরাট অংশই ছিল এর বিরোধী। এমনকি মহিলাগণ নিজেরাও প্রথমে এর বিরোধিতা করেছিলেন।

পূর্বে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে— মহিলা-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা'। যিনি এর সম্পাদনার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি শিক্ষিত উদার ভাবধারায় বিশ্বাসী একটি পরিবারে জন্মেছিলেন এবং সেই শিক্ষা ও ভাবধারায় বর্ধিত

হয়েছিলেন। আগেই বলেছি, একটি পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শুধু একজনের শিক্ষা ও সাহস থাকলেই চলতে পারে না। সম-মতাবলম্বী লোকদের উৎসাহ ও অর্থসাহায্য একান্ত আবশ্যক। শিশু যেমন চলতে শেখার সময় বার বার আছাড় খায়, তাঁকে তখন নিরুৎসাহ না করে সাহায্যের জন্য পরিবারের অন্যরা এগিয়ে আসেন। পুনঃ পুনঃ এইভাবে আছাড় খেয়েও সে অন্যদের অনুপ্রেরণায় আবার চলতে শুরু করে ও পরবর্তীতে সফল হয়। এই সফলতার জন্য যেমন ছিল তার উদ্যম ও চেষ্টা একদিকে, অপরদিকে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তাকে উৎসাহ দিতে তাদের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তখনকার সমাজের একবৃহৎ অংশের ছিল নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরোধিতা। গেল গেল, সব গেল। নারী নাকি লেখাপড়া শিখবে, কানে কলম গুজে অফিসে কাজ করবে। যে নারীকে মনুষ্যের মধ্যেই ধরতেন না তাঁরা, সেই নারীর আবার লেখাপড়া। অবশেষে যখন নারী লেখাপড়া শিখে নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার দাবী জানাচ্ছে, পত্র-পত্রিকাতে তাদের মতামত সম্বলিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হচ্ছে, সভা-সমিতিতে যোগদান করে বক্তৃতা করছে, রাজনৈতিক আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে সব কাজে অংশ নিচ্ছে, তখন প্রাচীন পন্থীদের একটু টনক নড়েছিল একথা বলা যায়।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের উদারপন্থী প্রবল মুক্তবায়ু অন্দরের বিষাক্ত দুষিত বায়ুকে এমন সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি এত সহজে সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তখন বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং অনাথা রমণিগণ উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে দিন দিন ব্যক্তি ও সমাজের বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এদের সমাজের ভয়ে কিছু করবার ক্ষমতা না থাকায় অপরের গলগ্রহ হয়ে এরা সমাজজীবনে দুঃসহ অত্যাচার-গ্লানি সহ্য করে কালাতিপাত করতেন।

প্রথমদিকের মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি কেবলমাত্র নারীশিক্ষা, নারীর অবরোধ মোচন, প্রকাশ্যস্থানে গমনাগমন, পুরুষের সহিত কথোপকথন, পারিবারিক কঠোরতার হ্রাসসাধন, সামাজিক ক্ষেত্রের প্রাচীন কু-প্রথাগুলির দূরীকরণ - যেমন, সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা, বিধবা-বিবাহ চালু করা প্রভৃতি এগুলির বিরুদ্ধেই তাঁরা বেশী প্রতিবাদ

মুখর হয়েছিলেন। তবে তৎকালীন সমাজহিতৈষী পুরুষগণও এগুলির হাত থেকে নারীজাতির মুক্তির জন্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

বিংশ শতকের মহিলা-পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তৎকালীন নারীসমাজ সর্ববিষয়েই পুরুষের সমান অধিকার দাবী করেন। জ্ঞানে, কর্মে, দায়ভাগ বহনে, বিবাহাদি সর্ব বিষয়েই নারী-পুরুষের সমান অধিকার চাই। ঘর সর্বস্ব বাঙ্গালী মেয়েরা বুঝেছে যে কেবল ঘরকে নিয়ে থাকলেই ঘর বাঁচে না, ঘর এবং বাহির দুটোকেই একযোগে সুন্দর করে তুলতে না পারলে কোনটাই সুন্দর হয়ে গড়ে উঠে না। মেয়ের জায়গায় মেয়ে, পুরুষের জায়গায় পুরুষ, যে যার নিজের নিজের কাজ পুরোপুরি করতে পারলে তবেই দেশের আকাশে সুন্দর প্রাণের খেলা দেখা দেবে।

মেয়েদের মধ্যে যে প্রচ্ছন্নশক্তি লুকিয়ে আছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। কর্মের মধ্যেই আছে শক্তি, আর সেই শক্তি বৃদ্ধি পায় ব্যবহারে। ঘরে বাইরের কাজ একযোগে করবার সুযোগ পেলে তারা নিজের ঘরটিও সুন্দর করে তুলবে এবং বাইরেটাও সুন্দর হয়ে উঠবে। ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য ঘরের বাইরে যেসব স্কুল, কলেজ, সমিতি, আশ্রম ইত্যাদি আছে সেগুলি যে ঘরেরই এক একটা অঙ্গ এ বোধ মেয়েদের মনে জাগ্রত হলে মেয়েরা ঘর বাহির দুটোরই উন্নতি করতে সমর্থ হবে। ঘরের সঙ্গে সঙ্গে বাইরেটাও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। প্রত্যেক মহিলাকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, ঘরের জন্য তাদের যে কল্যাণ কামনাটি আছে, সেটা বাইরেও ছড়িয়ে দিতে হবে। বাইরের সমাজের উপর দরদ, ভালবাসা না জন্মালে, ঘরেরও মঙ্গল হয় না, বাইরেরও না। এই বোধটি মহিলাদের মধ্যে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত ঘর-বাহির দুটোর কোনটারই মঙ্গল নাই। মহিলাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করার মানসে তৎকালীন শিক্ষিত মহিলাগণ পত্র-পত্রিকায় উত্তেজক প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত করতে থাকেন। বিভিন্ন সভা সমিতির মধ্য দিয়েও শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে থাকেন।

একথা সত্য যে, শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব মাতার উপর বেশী পড়ে। মাতা যদি নিজেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তিনি পুত্র-কন্যাদের কি শিক্ষা দিবেন। কোন দেশের কোন জাতির উন্নতির আশা ভরসা ছেলেমেয়েরা। বাঙ্গলা দেশের ছেলেমেয়েরা ঠিকমত সুশিক্ষা পেলে তারাই দেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তাই দেশের গৌরব বৃদ্ধি করতে হলে জননীদের উপযুক্ত

শিক্ষিত করে তোলাই হচ্ছে প্রধান কাজ । কেননা দেশের শিশু শক্তির শিক্ষার চাবিকাঠী মায়েদের হাতে । নেপোলিয়নের কথা শুনেছি । তিনি বলেছিলেন — 'আদর্শ জননী তৈরী কর, আদর্শ জাতি গড়ে উঠবে ।' ছোট শিশুকে তার শৈশবে একমাত্র মাতাই পারেন তার মধ্যে একটি সৎশিক্ষার বীজ বপন করতে ।স্কুল কলেজের শিক্ষা ছেলেমেয়েদের মনুষ্যত্বের বিকাশকে সম্পূর্ণ করতে পারে না । সনাতন সেকেলে পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিয়ে দেশ-কাল ও পাত্রোপযোগী শিক্ষাদান করতে পারলে শিশু যৌবনে উপনীত হয়ে তার সেই শৈশবের বীজকে ফলে ফুলে বিকশিত করতে পারে । তাতে দেশ তথা জাতি উপকৃত হয় । এই উপকারটি পেতে হলে শিশুকাল হতেই কন্যাসন্তানকে উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশে সুশিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদর্শ জননীরূপে গড়ে তুলতে হবে ।নারীশিক্ষার বিরোধীদের জানতে হবে — তাদের কি চাই, দেশের উন্নতি, না অধঃপতন । সে কালের মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি নারীকে অন্দর থেকে বার করে উপযুক্ত শিক্ষিত করে গড়ে তুলবার কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । বাংলাদেশের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে নারীর মধ্যে যে বিশেষ শক্তি আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে । দেশের ভবিষ্যৎ শিশু । সেই শিশুদের গড়বার দায়িত্ব প্রথমেই পড়ে জননীর হাতে । তাই লক্ষ্মীস্বরূপা বঙ্গজননীদের কল্যাণময় হস্তে বাঙ্গালী যদি শৈশবে শিক্ষা ও কৈশোরে দীক্ষা পায়, তবে বাঙ্গালীজাতি আবার মানুষ হিসাবে জগতে আপন পরিচয় দানে সক্ষম হবে ।

সকলেরই শৈশব কাটে মাতার শিক্ষা ও আদরযত্নে । শৈশবের দিনগুলিতে শিশুর মধ্যে যে জ্ঞানের বীজ মাতার সাহচর্যে হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেই শিক্ষাই শিশুর আসলশিক্ষা । মাতার প্রভাবেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন শৈশবেই অঙ্কুরিত হয় ।মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে নারীহিতৈষী মহিলাগণ তৎকালীন সে কাজে সুফলও পেয়েছিলেন, যদিও বিনিময়ে তাদের সমাজের অনেক টিট্‌কারী, গঞ্জনা ও উপহাস সহ্য করতে হয়েছিল। এ গঞ্জনা তাঁরা নীরবে হাসিমুখে সহ্য করেই আরো দৃঢ়তার সঙ্গে সামাজিক বাধা সরিয়ে অগ্রবর্তিনী হয়েছিলেন ।

বিংশ শতকের মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ভারতী', 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'জয়শ্রী'র ভূমিকা অগ্রগণ্য । সরোজনলিনী দত্ত-সম্পাদিত নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র স্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছিল । নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষা এর মূল উদ্দেশ্য ছিল । এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের সর্বত্র মহিলা-

সমিতি স্থাপন করে বঙ্গের মহিলাদের শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধন ছিল এর মূল লক্ষ্য । বাঙ্গালীমেয়ে যাতে তার ঘরের আদর্শটি নিখুঁতভাবে বজায় রেখে সর্বপ্রকার জ্ঞান ও শিক্ষালাভে সমর্থ হয়, পল্লীবাসী মেয়েদের সঙ্গে শহরের শিক্ষিত মেয়েদের যোগসাধন ঘটে, শিক্ষার প্রসার ঘটে, মহিলাগণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে সেটাই ছিল এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতে বঙ্গের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃতী মহিলার সংবাদ প্রকাশ করে বঙ্গীয় মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ যেমন প্রদান করা হত, তেমনি বঙ্গীয় মহিলাগণের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টাও করা হত । সে কাজে পত্রিকাখানি যে সাফল্য লাভ করেছিল একথা বলা বাহুল্য মাত্র ।

অনেকের ধারণা ছিল সৃষ্টির কাজ নারীর নয় । নারীর কাজ রক্ষা করা ও পালন করা। পুরুষজাতি রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নারীরও যে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে তা তারা প্রমাণ করছে তাদের কাজে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকেই নারী কেবল সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, জাতিগঠনের ও সমাজগঠনের কাজে নিজের নৈপুণ্যের পরিচয় প্রতি পদেই দান করতে শুরু করেছিল। শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে এতদিন নারীকে পঙ্গু করে, অসার করে রাখা হয়েছিল । আজ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে নারীর মধ্যে এতদিনের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই নারী উপলব্ধি করতে শুরু করছে, সে কারোর অপেক্ষা ছোট নয়। তার মধ্যেও আছে মহামূল্য অনন্ত রত্নরাজি । এতকাল তাকে পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছিল, পুরুষের সার্থকে চরিতার্থ করার জন্য । এখন নিজের আত্মোপলব্ধি জাগ্রত হওয়ায় সে বুঝতে পারছে যে তার মধ্যেও আছে পুরুষের মত মণিমাণিক্য খচিত রত্নরাজির অফুরন্ত ভাণ্ডার । সেই লুকানো সুপ্ত রত্নরাজির সন্ধান পেয়ে, উৎসাহ পেয়ে, শিক্ষা পেয়ে নারী একে একে সেগুলি আবিষ্কার করে বিশ্বের দরবারে, দেশের দরবারে ও জনতার দরবারে হাজির করতে বদ্ধপরিকর । দীর্ঘকালের অনভ্যাসে ভয় তাকে গ্রাস করেছিল ঠিক, কিন্তু সেই ভীতিকে কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে আমাদের দেশের মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলি । প্রথমদিকে এজন্য নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁদের ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — . . . . নারীরাই সংসার সৃষ্টি করে তুলেছে । হৃদয়, সহজবুদ্ধি ও ত্যাগ দিয়ে নারীরাই গৃহ সৃষ্টি করেছে । প্রত্যেক সংসারই নারীর সৃষ্টি। সে সৃষ্টি কাব্য নয়, সঙ্গীত নয়, কলকারখানা নয় । মানুষের সঙ্গে

মানুষের যে জটিল ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ সত্যকার স্থান পেয়েছে গৃহে। সেই সম্বন্ধগুলিকে ঠিক করে মেয়েরাই সংসার রচনা করেছে। এতে ধৈর্য্য, বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা সহৃদয়তা কত আছে। সংসার গড়ে তুলবার পক্ষে যা প্রয়োজন নারীর সাধনা দ্বারাই সেগুলি সংসারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গৃহকে রমণীয় করে তুলেছেন রমণীরা।"[৪]

নারীর মধ্যে কি শক্তি লুক্কায়িত আছে তা হয়ত এতদিন সে নিজেও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু যখন প্রয়োজন হল সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নারী শুধু নিজে নয়, অপরকেও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ঐ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কৃতী শিক্ষিত মহিলার সংবাদ 'বঙ্গলক্ষ্মী'র 'ঘরে বাইরে' কলমে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলি পাঠ করে বঙ্গীয় মহিলাগণ অনুপ্রাণিত হতেন। তাদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগ্রত হত। বঙ্গদেশের নারী সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির উদ্দেশ্যেই 'সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' গঠিত হয়েছিল। আমাদের দেশের তৎকালীন বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট সর্বজন বিদিত। তাদের দুঃখময় জীবনের নিরুপায় অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস আমাদের জাতি ও সমাজকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল। তাঁরা তাদের নাবালক সন্তান-সন্ততি নিয়ে অন্যের গলগ্রহ হয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতেন। এই সমিতি থেকে সেইসব বিধবারা শিক্ষা গ্রহণ করে নানাপ্রকার গৃহজাত শিল্প, চারুশিল্প, বয়নশিল্প, চিত্রাঙ্কন, বিবিধতর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী আয়ত্ব করে তার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করে জীবিকা নির্বাহ করার একটা উপায় খুঁজে পেলেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষেরা নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে সাধারণতঃ উদাসীন ছিলেন। এই সমিতির মেয়েরা নিজেরাই উৎসাহ ও যত্ন নিয়ে কাজ করে এই সমিতিকে সাফল্যমন্ডিত করে দ্রুত এর সুফল পেতে থাকেন। এই সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার মাধ্যমে সমিতির কর্মকান্ডের বিবরণ বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল এবং মহিলাগণ ঐক্যবদ্ধভাবে নারীশিক্ষা ও নারীমঙ্গলের জন্য এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে অনেকটাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিলেন। 'সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি'র বিশাল বিস্তৃত কর্মকান্ডের বিবরণ বঙ্গদেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সরোজনলিনী দত্ত বঙ্গদেশের মহিলাগণকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার মাধ্যমে আহ্বান করে বলেছিলেন — "আমি তাই আমাদের দেশের মা বোন্‌দের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন, প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলাসমিতি স্থাপন করুন, স্ত্রীশিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তাছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করিনা কেন সবই বিফল হবে।"[৫]

একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পত্রিকাখানি মহিলাদের শিক্ষাদানে উৎসাহ দিয়ে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেকাজে তারা সফলও হয়েছিলেন বলা যায়।

তৎকালীন মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল মহিলাগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে লীলাবতী নাগের (পরে রায়) সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তখন দেশ পরাধীনতা মোচনের জন্য ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। দেশের এই সঙ্কটময় সময়ে মহিলাগণও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। পুরুষের পাশে দন্ডায়মানা হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। দেশের এবং জাতির এই দুর্দ্দিনে ভাইদের পাশে এসে বোনেরা দাঁড়ান। সুতরাং 'জয়শ্রী' এই পত্রিকাখানি কেবলমাত্র সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকাশিত হয়নি। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা ও নারী জাতির উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দিনে, নারীসমাজ ভারতকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সংগ্রামী ভাইদের পাশে এসে দাড়ান এবং তাদের কাজে অংশ নিয়ে একযোগে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে 'জয়শ্রী'কে অনেক লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়েছিল — একথা আমরা 'জয়শ্রী'র পাতায় জানতে পেরেছি।

তখন ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন পুরোপুরি শুরু হয়েছিল। আন্দোলন মানেই তো পরিবর্তন। সমাজে নারীর যে অবস্থান ছিল তার পরিবর্তন চাই। ভারতবাসী যেন বহুকাল পরে জীয়ন কাঠির যাদুস্পর্শে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্রোতের বন্যায় ভাসতে শুরু করেছে। সেই স্রোতের বন্যায় কেবলমাত্র পুরুষেরাই নয়, সেই বন্যাধারায় মেয়েরাও ভাসতে শুরু করেছিল।

সমগ্র ভারতের নারী জাগরণের আন্দোলনকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রাক্ মহাসমরের যুগ এবং মহাসমরের পরবর্তীযুগ । বিগত মহাসমরের পূর্ব পর্যন্ত নারী আন্দোলন বলতে বোঝা যেত, নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও সমাজিক উন্নতি । বিভিন্ন মনীষী এ-সময় নারীর শিক্ষা ও সামাজিক কু-প্রথাগুলি দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । ফলে নারী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল । কিন্তু মহাসমরের পরবর্তীযুগে অতুলনীয় প্রবল বেগে নারী আন্দোলন সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সম-অধিকারের দাবীতে বিশাল আকার ধারণ করেছিল ।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যে বীজ রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ ও মিসেস্ রাণাডে প্রমুখ বপন করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমাজ সেবক ও ধর্মপ্রবর্তকগণের হাতে আরো বর্ধিত হয়েছিল ।

মহা যুদ্ধের সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় তথাকার নারীগণ বিভিন্ন অধিকারের দাবিতে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সাফল্যলাভে সমর্থ হয়েছিলেন । তার অনুকরণে আমাদের দেশের নারী সমাজও অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবল আন্দোলন শুরু করলে আমাদের দেশীয় জনসমাজের নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে থাকেন । পুণার পন্ডিতা রমাবাইর কার্য্যকলাপে ভারতীয় মহিলাগণ উৎফুল্ল হয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন অধিকারের দাবীতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন । এ সংগ্রাম কোন ব্যক্তি বা জাতির বিরুদ্ধে নয়, এ সংগ্রাম সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ।

১৯১৭ সালে মাদ্রাজে 'ভারতীয় নারী সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছিল । ১৯১৮ সালে রিফর্ম বিলের আন্দোলনের সময় মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবীতে 'ভারতীয় নারী সংঘ' সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন । দক্ষিণ ভারতের নানা অংশে এর শাখা প্রসারিত হয়েছিল । সমগ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মহিলা গ্রাজুয়েট সমিতি' ইংলন্ডের য়ুমেন্স্ ইন্স্টিটিউসনের ন্যায় ভারতেরও নানাস্থানে ঐরূপে সংঘ গড়ে তোলেন ।

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৫ সালে ভারত একটি National council of women in India নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নারী আন্দোলনের কাজ সফল করার জন্য যতটা উদ্যোগ আয়োজন হয়েছে তার মধ্যে নিখিলভারত নারী-সম্মেলনের অধিবেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতিমধ্যে এর ৬টি অধিবেশন হয়ে গিয়েছিল । এই অধিবেশনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা বিস্তার । নারীগণের সামাজিক উন্নতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালে

একটি কার্যাবলী ঐ সম্মেলনের তালিকাভুক্ত করা হয় । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এমনকি পর্দানশীলা মহিলাগণ পর্যন্ত এসে ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ আন্দোলনের ফলে দিল্লীতে 'সেন্ট্রাল ট্রেইনিং কলেজ' স্থাপিত হয়েছিল। ঐ কলেজের চেষ্টাতেই বাল্য বিবাহ নিরোধ-আইন বলবত হয়েছিল ।

ঐ সময় পুরুষ ও মহিলাগণের সমবেত চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল । যেমন — পুণা, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে সেবাসদন, পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বম্বে, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের বনিতাশ্রম এবং আরো নানাস্থানের অবলা-আশ্রম, বিধবা-আশ্রম, শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবী সংঘ, শিল্পশিক্ষালয়, সরোজনলিনী দত্ত প্রতিষ্ঠিত মহিলাসমিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত প্রয়াসের ফলেই ভরতবর্ষের মহিলা জাগরণের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।[৬]

মহিলাগণ যাতে সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, উচ্চশিক্ষার বিস্তার, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাবিধি ভারতীয় অবস্থার অনুকূল হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে প্রাদেশিক নারী সমিতিগুলি নিয়তই প্রতিবাদ জানাতে থাকে । কিন্তু কেবলমাত্র মাদ্রাজ ও বম্বের কোন কোন জায়গায় বাধ্যতামুলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল মাত্র ।[৭]

মেয়েরা তখন ধীরে ধীরে তাদের কার্যক্ষমতার পরিচয় দিতে শুরু করেছে । শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ স্কুল কলেজের পরিচালকরূপে, শিক্ষয়িত্রীরূপে, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরূপে, মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য ও চিকিৎসকরূপে জন-সাধারণের কাজে ক্রমশঃই যোগ্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । সাহিত্যক্ষেত্রেও যোগ্যতার স্বাক্ষর দিচ্ছিলেন । তরু দত্ত, অরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু এবং অন্যান্য আরো অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বিনী হয়েছেন । শাসন ক্ষমতা পরিচালনা ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে মহিলাগণ তাদের কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় ক্রমশঃই দিতে থাকেন।

'প্রবাসী পত্রিকা'তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত কয়েকটি কৃতী মহিলার সংবাদ 'জয়শ্রী' আমাদের পরিবেশন করেছেন ঃ ''কুমারী যামিনী সেন কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নির্ভীক লেখক স্বর্গীয় চন্ডীচরণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা এবং কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের দ্বিতীয়া ভগিনী ছিলেন । তিনি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে দুইবার বিলাত গিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ

পারদর্শিতা লাভ করেন। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর রাজকীয় হাসপাতালে তিনি কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করেন।...তিনি উইমেন্স মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে শিকারপুর, আগ্রা, আকোলা প্রভৃতি শহরে কাজ করেছিলেন।...তাঁর মৃত্যুতে দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল।" —প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৩৮

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদে দুই বৎসরের জন্য অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি বি. এ. উপাধিধারিণী। এঁকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত নাবালক ছেলেমেয়েদের বিচার করতে হবে, রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার করতে হবে না।...... সন্তানের জননীরা বিচারক হলে ন্যায় বিচার অবশ্যই করবেন এরূপ আশা করা হয়। কিন্তু এ আশাও নিশ্চয় করা হয় যে তাঁরা মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দিয়ে দোষী ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের দিকেও দৃষ্টি রাখবেন। এই কারণে আমরা মহিলাদিগকেও বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। —প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৮

ছাত্রীরা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা কোন বিষয়ে ছাত্রদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এম. এ. পরীক্ষায় কয়েকটি ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংস্কৃতের একটি পাঠ্যসমষ্টিতে কুমারী কমলারাণী সিংহ এবং অন্য একটি পাঠ্যসমষ্টিতে কুমারী প্রীতিলতা গুপ্ত প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইংরাজী সাহিত্যে কুমারী ইলা সেন ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করেন। কুমারী প্রভাবতী বসু রসায়ন বিদ্যায় এম. এ. পাশ করেন। ইতিপূর্বে কোন ছাত্রী এ বিষয়ে এম. এ. হন নাই। কুমারী শোভা সেন বাংলা সাহিত্যে এবং শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরী দর্শনে এম. এ. পাশ করেছেন। এর আগেকার এম. এ. পরীক্ষায় কুমারী সুরমা মিত্র সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি. এ. পরীক্ষায়ও তিনি সংস্কৃত অনার্সে ১ম বিভাগে ১ম হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশীলনবৃত্তি পেয়ে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের শিক্ষাধীন থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানবাদের তুলনামূলক গবেষণায় ব্যাপৃত হন। ইতিপূর্বে ভারতীয় কোন মহিলা দর্শনশাস্ত্রে গবেষণাবৃত্তি পেয়েছেন বলে আমরা অবগত নই।"[৮]

শ্রীমতী পিলু এম্ বেসব বালা, লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাষ্টার অফ

এডুকেশন' এই উপাধি পেয়েছিলেন । লীড্‌সে যাবার পূর্বে তিনি ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন ।

শ্রীমতী মায়ালতা সোম - বাংলাদেশ থেকে ইনিই প্রথম ডাঃ কুমারী মন্তেসরীর শিক্ষা প্রণালীর ডিপ্লোমা নেবার জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন । কুমারী মায়ালতা সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান বংশের মেয়ে । পরলোকগত জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় এঁর পিতা । শ্রীমতী মায়ালতা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে ট্রেনিং বিভাগের শিক্ষয়িত্রীর কাজ অতি যত্ন ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করেছিলেন ।

নাগপুরের মরিস্ কলেজে শ্রীযুক্তা কুসুমাবতী দেশপান্ডে ইংরাজীভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন । নাগপুরে এই প্রথম একজন মহিলা অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । 'জয়শ্রী'র পাতায় এরূপ বহু মহিলার কৃতিত্বের সংবাদ প্রকাশিত হত ।[৯] এগুলি পাঠ করে বঙ্গীয় মহিলাগণ অনুপ্রাণিত হতেন ।

নারী আন্দোলন তখনও শৈশব অবস্থা অতিক্রম করেনি । কিন্তু নারী সর্বক্ষেত্রে সচল ও জীবন্ত হয়ে উঠতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল । তৎসত্ত্বেও সামাজিক বাধা পদে পদে তাদের গতিরোধ করছিল । শহরাঞ্চলে শিক্ষা যতটা বিস্তার লাভ করেছিল, গ্রামে তুলনায় তা একেবারেই নগণ্য ছিল । অথচ শতকরা ৮৫ জনের অধিক মেয়ে তখন গ্রামে বাস করত । তখন গ্রামগুলির যেমন শোচনীয় দারিদ্র্য ও অর্থাভাব ছিল, তেমনি মেয়েদের শিক্ষাদিবার ও প্রচার কার্য্য চালাবার লোকের অভাবও তদ্‌পেক্ষা ছিল অধিক । কিন্তু এতসব বাধা সত্ত্বেও মহিলা জাগরণের জোয়ার বইছিল শহরে তো বটেই, পল্লীগ্রামের কোনে কোনেও তার প্রভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'য়েছিল ।

শতবাধা ও সামাজিক বিধি নিষেধের গন্ডী অতিক্রম করে দেশের বড় বড় নেতাদের চেষ্টায় ও সরকারের সাহায্যে দেশের নানা স্থানে মহিলাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে । পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুরের মেয়েদের জন্য আর্টস্ কলেজ, ঝালন্দরের কন্যাবিদ্যালয়, ফিরোজপুরের শিখ-বিদ্যালয়, সেবাসদন সমূহ, লেডিবসুর নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুল সমূহ এবং নানাস্থানে মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে উঠেছিল ।[১০]

বাল্যবিবাহ প্রথা বিনাশের জন্য মহিলাগণ সেসময় প্রাণগণ চেষ্টা চালাতে থাকেন । 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে' বরোদার মহারাণী সাহেবা একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন । তিনি বলেন যে, মেয়েরা যদি সামাজিক জীবনে কাজে অংশ গ্রহণ

করেন এবং যদি তাদের ভিতরে সন্তানের শিক্ষার নিমিত্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলেন, তবেই পর্দাপ্রথা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে। বাল্যবিবাহ এবং পর্দা প্রথা নিবারণ শুধু যে লক্ষ লক্ষ মেয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে তাই নয়, — স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে দু'টি প্রধান বাধা দূরীভূত হবে।[১১]

নারীশিক্ষা বা নারীজাগরণ শুরু হলেও মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য ঐকান্তিক প্রয়াস খুব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। যদি বা কেউ সাধু ইচ্ছা বা উদারতা বশতঃ মেয়েদের মঙ্গলের জন্য কিছু করতে চাইতেন, কিন্তু অল্পদিন যেতে না যেতেই তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। যাঁরা উদারতাবশতঃ নারী কল্যাণের জন্য নূতন কিছু করবার উদ্যোগ নিতেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাদের অনেকের সখ মিটে যেত। নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদীরা শুধু কেবলমাত্র বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হতেন না, ভীতি প্রদর্শন ও লাঞ্ছনার দ্বারা তাদের নিবৃত্ত করতে বাধ্য করতেন। সাধারণ কাগজে মেয়েদের কথা বড় বেশী থাকত না। বেশ কিছুদিন বাঙ্গালা কাগজে 'মেয়েদের কথা' নিয়ে লেখার ছড়াছড়ি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে হুজুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আর তাছাড়া মহিলাদের সকল লেখা এক জায়গায় সুসংবদ্ধভাবে পাওয়া যেত না। সেই কারণেই মেয়েদের কথা বলবার জন্য, ভাববার জন্য এবং কিছু করার জন্য একান্তভাবে মহিলাদের জন্যই একখানা কাগজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

'জয়শ্রী' পত্রিকাখানি মহিলাদের বিভিন্ন অধিকার দাবী দাওয়া নিয়ে বাদানুবাদ ও আলোচনা চালাবার জন্যই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে মহিলাগণই লিখতেন। মহিলাগণ এতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা দ্বারা জনমত সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কিভাবে সেগুলি ফলবতী করা যায় তার উপায় নির্দেশ করতেন।

মহিলাদের উন্নতির জন্য যে সকল আইনকানুন হওয়া উচিত সে বিষয়ে মহিলাদের ও দেশের সকলকে অনুরোধ ও উৎসাহিত করা, মহিলাদের পক্ষে ক্ষতিকর কোন আইনের প্রস্তাব উঠলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, মহিলাদের স্বার্থের পরিপন্থী নূতন বা পুরাতন যে কোন আইন পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করা, শুধু তাই নয়, বিদেশেও মহিলাদের স্বার্থের প্রতিকূল কোন আইনকানুনের সংবাদ পাওয়া গেলে 'জয়শ্রী'র পাতায় তার তীব্র প্রতিবাদ জানান হত। ভারতবর্ষের অন্যপ্রদেশে, এমন

কি বিদেশেও মহিলাদের সভাসমিতির বিবরণ দান, এক কথায় নারীর সর্ববিধ কল্যাণ ছিল 'জয়শ্রী'র মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনে 'জয়শ্রী' সফলতা লাভ করেছিল।

এককথায় মহিলাদের সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবার জন্য যেভাবে অনুনয়-বিনয়, আলাপ-আলোচনা ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা কর্তব্য সেই লক্ষ্যে 'জয়শ্রী' পত্রিকাখানির আবির্ভাব ঘটেছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে লোকমত গঠন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কাগজখানি একান্তভাবেই মহিলাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া ও সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকারের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এতে পুরুষদের লেখা নেওয়া হত না এমন নয়, তবে মহিলাদের লেখাই ছিল এর প্রধান অবলম্বন।

দেশবিদেশের বিভিন্ন মহিলার কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ দিয়ে 'জয়শ্রী' আমাদের দেশের মহিলাদের অনুপ্রেরণা জাগাতেন। 'জয়শ্রী'র সৌজন্যে জানা যায় যে কয়েকজন ভারতীয় মহিলা দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইটালীতে শিক্ষালাভের জন্য গমন করেন — "ইহাদের নাম শ্রীমতী জামালুদ্দিন, শ্রীমতী কমলা বাকে, শ্রীমতী রূপকুমারী শিভপুরী, শ্রীমতী যমুনা পরমানন্দা। ইহাঁরা প্রত্যেকেই বিবাহিত্র — প্রায় প্রত্যেকেরই পুত্রকন্যা আছে — তাহা সত্ত্বেও নূতন ভারতকে গঠন করিবার কার্য্যে নিজেদের নিয়োগ করিবার আশায় সুদূর ইটালীতে শিক্ষা লাভার্থ গিয়াছেন জানিয়া মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়।"[১২]

হায়দ্রাবাদ নিবাসী মিসেস্ ঘুসিয়া জামালুদ্দিন শৈশবে মাতার নিকট থেকেই শিক্ষা লাভ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর হায়দ্রাবাদে কোন মহিলা কলেজ না থাকার জন্য তার পাঠ ঐখানেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৫ সনে হায়দ্রাবাদে মহিলা কলেজ স্থাপিত হলে তিনি ১৬ বৎসর পরে বি. এ. পর্যন্ত পড়ে সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে এক বৎসর ফ্রোবেলের কিন্ডারগার্টেন বিধি শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে মন্তেসরী বিধি শিক্ষালাভ করবার জন্য তিনি রোমে গিয়াছিলেন। ইনি ৬টি সন্তানের মাতা।[১৩]

তৎকালীন 'Women's Indian Association' গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নলিখিত মহিলা প্রতিনিধিদের পাঠাবার জন্য নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ডাঃ এনি বেশান্ত, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ মথুলক্ষ্মী রেড্ডি, মিসেস্ ব্রিজলাল নেহেরু, মিসেস্ আমদ আলম, মিসেস্ কমলাদেবী, ডাঃ সাড়ে এম. এল. সি, রাণী রাজওয়ারে,

মিসেস্ রুস্তমজী ফারদুনজী, মিস্ লিজারাস্, মিসেস্ মৌজুরুদ্দিন। দুঃখের বিষয় এঁদের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী মহিলার নাম নাই।[১৪]

'জয়শ্রী' আরো জানাচ্ছে — সম্প্রতি মিস্ ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু এম. বি. মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী বিদ্যাশিক্ষার্থে জর্ম্মান গভর্ণমেন্টের একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিঁনি চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের হাউস্ সার্জ্জন ছিলেন। তাঁর এই বৃত্তিলাভে আমরা আনন্দিত হয়েছি। আশাকরি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অধিক সংখ্যক মহিলা ডাক্তারী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করবেন।[১৫]

ভারতবর্ষে পুরাকালে কলাচর্চা যথেষ্ট ছিল। একটি জাতিকে বেঁচে থাকতে হলে কঠিন কর্ম সাধনার সহিত সুকোমল বৃত্তিগুলিরও অনুশীলন করতে হয় — তা না হলে জাতি আনন্দ ও সৌন্দর্য্যবিহীন হয়ে বার্দ্ধক্যের অচলতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের ভারতবর্ষের গৌরব যে উদয়শঙ্কর সে চেষ্টা দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করেছিলেন। "রসজ্ঞ ফ্রান্স তাঁর নৃত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, ইহা বাংলার গৌরবের কথা।"[১৬]

আমাদের দেশের সমাজে নারী পুরুষের অধিকারে বৈষম্য বিশেষভাবে নজরে পড়ত। সমাজে ও রাষ্ট্রের কাজে নারী তার আপন কর্মক্ষমতায় স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু পরিবারে এখনও তাদের অবস্থা পুরুষের সমকক্ষ হয়নি। স্ত্রীর কোন মন্দ স্বভাবের জন্য স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু স্বামীর মন্দ স্বভাবের জন্য স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার অধিকার পায় না। সমাজে একই অপরাধের জন্য স্ত্রী শাস্তি পান কিন্তু পুরুষের অপরাধ সমাজ তত লক্ষ্য করে না। আর্থিক স্বাধীনতা না থাকার জন্য স্ত্রী লোকদিগকে পুরুষের অনুগ্রহ ভাজন হয়ে থাকতে হয়। এটা একটা শিক্ষিত সভ্য জাতির পক্ষে লজ্জার ও অপমানের বিষয়।

ইউরোপীয় নারীগণকে পুরুষের সমকক্ষ অধিকার আদায়ের জন্য প্রচন্ড সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত ইংলন্ডে নারীর অধিকার উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় দেশের সকল সক্ষম পুরুষ যুদ্ধে যেতে বাধ্য হলে তাদের স্থান গ্রহণ করার জন্য মহিলাদের প্রয়োজন পড়ল। তখন দেখা গেল পুরুষের সব কাজই মেয়েরা দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে। এই স্পষ্ট প্রমাণের পরে আর নারীকে 'অবলা' বলে অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ১৯১৯ সালে ইংলন্ডে Sex Disqualification Removal Act পাশ হলে পর নারী সর্বপ্রকার কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।[১৭]

উনিশশতকে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী নারী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। বিভিন্ন দেশে আন্দোলনের ধারা আলাদা হলেও কোন কোন বিষয়ে মিলও ছিল। 'জয়শ্রী'র সৌজন্যে আমরা কয়েকটি দেশের নারী প্রগতির জন্য মহিলাদের আন্দোলনের কথা জানতে পারি।

বাল্যবিবাহ প্রথা দূর করার জন্য ভারতবর্ষে তখন 'উইমেন্‌স্ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রবল আন্দোলন করছিলেন। মাতা ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। সেজন্য ভারতীয় বহু মহিলা চীন ও আমেরিকা থেকে ডাক্তারী পাশ করে দেশে ফিরে হাসপাতাল ও শিশুমঙ্গলালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[১৮]

ইজিপ্টের মহিলাগণ অর্থ উপার্জ্জনের তাগিদে টাইপরাইটিং ও লাইব্রেরীর কাজ শিখবার স্কুল খোলার জন্য সেখানকার গভর্ণমেন্টকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন।[১৯]

ফরাসী মহিলাদের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আলজিরিয়াতেও নারী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল।[২০]

জাপান গভর্ণমেন্টের সীমাবদ্ধতায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে সেখানেও মহিলাগণের চেষ্টায় সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলন ভয়াবহরূপ ধারণ করে।[২১]

ভারতবর্ষেও গত জানুয়ারী মাসে প্রথম 'সমগ্র এশিয়া নারী সম্মেলন' হয়েছিল। ত্রিশ রকম বিভিন্ন ভাষায় তার নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হয়েছিল।[২২]

দামাস্কাসেও নারী সম্মেলনের মধ্যদিয়ে নারী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। সেখানকার মহিলাগণও সম-অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন।[২৩]

এইসব আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের বন্দীজীবন থেকে মুক্ত করে পুরুষের সমান শিক্ষার আলো প্রদান করা। তাছাড়াও জীবিকার্জ্জনের পথ নির্দেশ করা, দৈনিক জীবনে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যাতে না থাকতে হয় তার চেষ্টা করা, অপর সকলের সমকক্ষ কাজ করলে সমান বেতন লাভ করা, সমাজে পুরুষের সমান স্থান অধিকার করা এবং জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে মহিলাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা ইত্যাদি দাবীগুলি এই আন্দোলনে গ্রহণ করা হয়েছিল।[২৪]

মহিলাগণ সেই সময় নিজেদের উন্নতি কামনার লক্ষ্যে যেসব প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তা প্রশংসার যোগ্য।

ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাটপত্নী লেডী আরউইন তৎকালীন সময়ে লিখেছিলেন — " আমার স্থির বিশ্বাস যে ভারতের ভবিষ্যতের উন্নতি-অবনতি মেয়েদের শিক্ষা ও মঙ্গলের উপরই বেশী নির্ভর করিতেছে। এবং আমি দেখিয়াছি ভারতের বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী এই মনোভাব পোষণ করেন।"[২৫]

একথা অন্যদেশের নারী সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। জগতের উন্নতির চেষ্টা মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ছাড়া সম্ভব নয়। কোন জাতির পক্ষেই মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা ও সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করা সম্ভব নয়।

লন্ডনের মহিলা কনফারেন্সে তখন মিসেস্ পেথিক লরেন্স বলেছিলেন — ভারতীয় নারীগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বের সহিত যে অংশগ্রহণ করেছিলেন — এরূপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর একটিও ঘটে নাই। ভারতীয় নারীগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রচেষ্টায় যে কর্মকুশলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২৬]

মিসেস্ ব্রিজলাল নেহেরু বলেন — স্বরাজ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা চলতে পারে না যে পর্যন্ত না আমরা দেশ শাসনের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হব।[২৭]

মহিলাগণ শুধু শিক্ষা ও সামাজিক সমাধান চেয়েই ক্ষান্ত হননি। পুরুষের সঙ্গে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

মিসেস্ ডব্লিউ ইংহাম নাম্নী একজন মহিলা ঐ সময় বেংগলী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। এই প্রথম একজন মহিলার পক্ষে ব্যবসায়ী - সমিতির সভাপতি হওয়া নারীজাতির দক্ষতার পরিচয় বহন করে।[২৮]

শুধু তাই নয়, সমর বিভাগেও নারী অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। ম্যাডাম ষ্টানিলাস প্যালোলোগ পোল্যান্ডের সেনাবিভাগের একজন অধিনায়িকা (Lieutenant) ছিলেন। পরে তিনি ওয়ারস (Warsaw) মেয়ে পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। ওয়ারসর মেয়েপুলিস বিভাগে তখন ৫০ থেকে ৬০ জন মহিলা নিযুক্ত ছিলেন।[২৯]

চীনের 'চ্যাঙ মহিষী' (The widow chang of China) তৎকালে চীনের জাতীয় দলের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর নিজস্ব ৩০০০ সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়িকারূপে উত্তর চীন দলের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁকে সেনাবিভাগের ব্রিগেডিয়ার করা হয়েছিল।[৩০]

মহিলাগণ জাতিসংঘেও নারীপুরুষের সম-অধিকারের দাবী নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন।

তখন কেবলমাত্র ভারতীয় মহিলা জাগরণই শুরু হয়নি। পৃথিবীর সর্বত্র মহিলাগণ পুরুষের সকল কাজে সমান অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠায় সরব হয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বহু দায়িত্ব পূর্ণ কাজে অংশ নিয়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। জাগরণের উন্মাদনায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী মহিলাগণ তখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

'মহিলা দিবসের' সেক্রেটারী শ্রীমতী মালতী পাতোয়াদ্ধার্নি মাদ্রাজের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী 'সাংলী'র জমিদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ছয় বৎসর মাদ্রাজে বসবাস করছিলেন। চার বৎসর পূর্বে রোম নগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা সমিতির অধিবেশনে ইনি ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হয়েছিলেন। ইনি পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী। ইনি তাঁর মোটরকার নিজেই চালনা করতেন। টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়াতেও তাঁর চমৎকার পারদর্শিতা ছিল। বক্তৃতা শক্তিতে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।[৩১]

আমেরিকা থেকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, মিস্ মেয়ো দ্বারা প্রচারিত ভারতনারীর আংশিক কলঙ্ক মোচনও অন্তত এতে হবে — যদি শ্রীমতী নাইডু এই আমন্ত্রণ স্বীকার করে আমেরিকায় যান। তিনি তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতা প্রভাবে যেমন দক্ষিণ আমেরিকার হৃদয় জয় করে গোলটেবিলের পথ নির্দেশ করতে পেরেছিলেন, এযাত্রাতেও নিশ্চয়ই তেমনি আমেরিকার চিত্ত জয় করতে পারবেন।[৩২]

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে নরওয়ে দেশে একটি আইন কার্য্যকরী হয়েছিল যে, তথায় স্বামী যেমন মৃতা পত্নীর সম্পত্তির অধিকারী হবেন, বিধবা নারীও তেমনি মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হবেন।[৩৩]

শ্রীমতী ইষ্টার. এম. এণ্ড্রুজ নাম্নী একটি মহিলা সম্প্রতি ম্যাসাচুসেট্স প্রদেশের শাসন পরিষদে পারিষদ্ নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩৪]

আর্জ্জেন্টিনার সান্ জুয়ান প্রদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সর্বপ্রথম নারীর প্রাদেশিক ভোটাধিকার স্বীকার করেছিলেন।[৩৫]

বিলাতের রয়েল একাডেমিতে শ্রীমতী উড্ স্প্রোক্টার নাম্নী একজন মহিলার অঙ্কিত 'প্রভাত' নামক একটি চিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। 'সানডে-টাইমস্'

এ এই চিত্রটির পরিচয় ও প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'ডেলিমেল' পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ এই চিত্রটিকে ক্রয় করে সাধারণ চিত্রশালায় স্থাপিত করেছিলেন। 'স্কচ' পত্রিকা শ্রীমতীর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, চিত্রকর আর্ণেষ্ট স্প্রোক্টারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী উড্ তাঁর স্বামীর সহিত কর্ণওয়ালের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। বিবাহের পর প্যারিসেও তাঁরা কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তাঁরা কোন ব্যবসায়ীর গৃহ চিত্রিত করবার জন্য বর্ম্মায় যান। বিগত ১৯২৫-এ প্রথম রয়েল একাডেমিতে 'সিসি' নামক একটি চিত্র প্রদর্শন করে তিনি বিশেষ যশস্বিনী হয়েছিলেন।[৩৬]

ব্রিষ্টল সাধারণ হাসপাতাল একটি এত বড় প্রতিষ্ঠান যে এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এতদিন পর্যন্ত কোন মহিলাকে নিযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু সুখের বিষয় যে মিস্ হিলদা উইল্স তৎকালে নির্বাচনে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হয়েছিলেন। এতে তার যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়েছে।[৩৭]

'বঙ্গলক্ষ্মী' আমাদের আরো বহু কৃতীমহিলার সংবাদ পরিবেশন করেছেন। কুমারী জনককুমারী যুত্শী এলাহাবাদের ব্যরিষ্টার শ্রীযুক্ত এল. পি. যুতশী মহাশয়ের কন্যা। ইনি সম্প্রতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পাশ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম ছাত্রী— যিনি এরূপ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণা হলেন।[৩৮]

শ্রীমতী মাধবী আম্মা কোচিন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা মনোনীত হয়েছেন। এই ব্যবস্থাপক সভায় ইনিই সর্বপ্রথম নারী সদস্যা। এঁর কবি বলে প্রসিদ্ধি আছে এবং ইনি দরিদ্র বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।[৩৯]

কুমারী দা-মে-মি-খিন, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা বি-এল। ইনি রেঙ্গুন হাইকোর্টের সহকারী রেজিষ্টারের পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এপদে স্ত্রীলোকের এই প্রথম পদার্পণ।[৪০]

১৯৩১ সালে পৃথিবীর প্রথম মহিলা পুলিস কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হন অ্যাঞ্জেলিস্ নামকশহরের কেট স্মিথ নামক এক মহিলা। এরপর আমেরিকার অন্য শহরের অনেক মহিলাও এই পদ লাভ করেছেন। এদের মধ্যে নিউজার্সির অন্তর্গত লং ব্রাঞ্চ শহরের মিসেস্ কর্ণেলিয়া হপ্‌কিন্‌স্ বিশেষ খ্যাতনামা।

লন্ডনের নারী পুলিস জে বুল কিংস ক্রস দক্ষতার সহিত রাস্তার লোক চলাচল ও গাড়ীঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ করতেন। মিশর দেশের দুই নারী পুলিশের মধ্যে

একজন মিস্ হস্‌কীন্ । তিনি ভাষাবিদ্ শিক্ষয়িত্রী হয়েও জনকল্যাণকর কার্য্যে অধিক উৎসাহী ছিলেন বলে পুলিশের কাজ গ্রহণ করেছিলেন ।[৪১]

পারস্যের দুইশত নারী একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান করে দাসত্বের চিহ্ন বোরখা ও গাত্রাবরণীর সমাধি দিয়েছিলেন । এজন্য একটি কবর খোঁড়া হয়েছিল এবং তাতে সমস্ত পোষাক গোর দেওয়া হয় । তার উপরে একটি ফলকে লিখিত হয়েছিল — 'নারীর দাসত্বের মূর্ত্ত প্রতীক বোরখা ও গাত্রাবরণী এখানে সমাহিত হয়েছে । ঈশ্বরের অভিসম্পাত এর উপর পতিত হোক্ ।[৪২]

দেশের গণ্যমান্য সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যা করেন দেশের সর্বসাধারণ তাকেই আদর্শ বলে মেনে নেয় । বাঙ্গালা ও কাশ্মীরের পর্দাপ্রথা এই সত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিন মুসলমান প্রভাবের যুগে, যে পর্দা কাশ্মীর গ্রহণ করেছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে সে দেশের রাণী স্বহস্তে সে পর্দার উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন । তিনি পর্দা ত্যাগ করে স্বাধীন সহজভাবে সকলের সাথে মিশেছিলেন । তার এই দৃষ্টান্ত কাশ্মীরের নারী স্বাধীনতার নতুন যুগের সূচনা করেছিল সন্দেহ নেই। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধবার প্রয়াস সর্বক্ষেত্রে একান্ত ভ্রান্ত ও বর্বরোচিত বলে আমরা বিশ্বাস করি । অন্তরের সূচিতাই মানুষকে সত্যপথে চালিত করতে পারে । তার বিকাশ হয় উন্মুক্ত স্বাধীন আবহাওয়ায় — গন্ডীবদ্ধ পঙ্কিলতায় নয় ।[৪৩]

'বঙ্গলক্ষ্মী' জানাচ্ছেন —'হাবুল মাতিন' পত্রিকার সম্পাদকের কন্যা শ্রীমতী সাকিনা ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । ইনি ইন্টার মিডিয়েট আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ।[৪৪]

'সারদা' সম্পাদিকা মাদ্রাজ মহিলা শ্রীমতী কল্যাণী আম্মা কোচিন রাজদরবার থেকে 'সাহিত্য সখী' পদবী ও একটি পদক লাভ করেন । শ্রীমতী 'সদগুরু' নামক অন্য একখানি ধর্ম্মমূলক পত্রিকারও অন্যতমা সম্পাদিকা । এঁর প্রণীত কতিপয় পুস্তক মাদ্রাজ ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল । ইনি 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির' সভ্যা ও কোচীন নারী সভার অবৈতনিক সম্পাদিকা । ইনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা এবং জনহিতকারিণী মহিলা ।[৪৫]

কুমারী জি. এ. নাইরন গর্টন বিদ্যায়তনের স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন । কুমারীর বয়স ২১ বৎসরের বেশী নয় ।[৪৬]

জাতির জীবনে গতি আনয়নের জন্যও মহিলারা সচেষ্ট হন । পৃথিবীর

অন্যান্য দেশের মহিলাদের মত ভারতীয় মহিলাগণও খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন । ব্যরিষ্টার মিঃ এ. কে. হাজরার পত্নী শ্রীমতী নিভাননী দেবী ১৫ মিনিটে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চাত্‌রায় উপস্থিতহয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন । জাতীর জীবনকে সজীব আনন্দময় করে তুলতে খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের বিশেষ প্রয়োজন ।[৪৭]

প্রসিদ্ধ নারী বৈমানিক মিস্ এমি জনসনের মতই মিসেস্ ভিক্টর ব্রুস অসম সাহসিকতার সহিত ১৪৭ ঘন্টায় বিমান চালনা করে ইংলন্ড থেকে জাপানে পৌঁছান । এ পর্যন্ত আর কোন ইংরাজ বৈমানিক এ-সাহসের পরিচয় দেন নাই ।[৪৮]

এমন কোন দিক নেই যেদিকে নারী সচেতন হননি । সমাজসেবার কাজেও মহিলাগণ এগিয়ে আসেন । যেসব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কেউ দেখবার নেই, তাদের সাহাযার্থে স্টক হল্‌মে 'Flower Home' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে বিখ্যাত আবিষ্কারক শ্বেন হেডিনের ভগ্নী মিস্ আলমা হেডিন এগিয়ে আসেন । মানুষের মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধাদি ও পারলৌকিক কাজের জন্য যে অর্থব্যয় কবা হয় তা ঐভাবে নষ্ট না করে অসমর্থ বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সাহাযার্থে ব্যয় করার একটা পরিকল্পনা মিস্ আলমা হেডিনের মনে জাগ্রত হয়েছিল । সুইডেনের শ্রমিক নেতা ঝালমার ব্রাটিং এই প্রস্তাবের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুষ্পের পরিবর্তে বহু অর্থ 'Flower Home Fund' এ জমা হয় । ঐ অর্থ দ্বারা আটশত অসমর্থ লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল ।[৪৯]

পানদোষ নিবারণেও নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য । আমেরিকার ২৪টি নারী প্রতিষ্ঠানের সভ্যাগণ মিলিতভাবে পান দোষ নিবারণ সম্বন্ধীয় একটি কমিটির সামনে বিক্ষোভ দেখান । যাতে পান দোষ নিবারণ আইন উঠে যায় । কাবণ মদ্যপানের ফলে সবচেয়ে বেশী কষ্ট ভোগ করতে হয় নারীদের । আমাদের ভারতীয় মহিলাগণও মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছেন ।[৫০]

প্রাচ্য জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র জাপানই পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমতালে চলছিল যে নির্বাচন-অধিকার লাভ করার জন্য ইংলন্ডের রাণীকে পর্যন্ত কারাবরণ, অনশন গ্রহণ করতে হয়েছিল, জাপান গভর্ণমেন্ট সেই নির্বাচন-অধিকার তাদের দেশের মেয়েদের স্বেচ্ছায় দান করেছিলেন। ২৫বৎসর বয়স্ক সকল নারীই মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য শাসন প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে

পরবে। কিন্তু জাপানী নারীরা একে যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট হননি ।[৫১]

পৃথিবীর নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন ব্রহ্মদেশের মেয়েরা । 'বঙ্গলক্ষ্মী' জানাচ্ছেন, কিছুদিন পূর্বে ব্রহ্মদেশে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল, মেয়েরাই ছিল সেই আন্দোলনের অধিনেত্রী । একবার এক ইংরেজ পুরুষ পাদুকা পরিধান করে তাদের ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করলে মহিলাগণই তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন দেশ মুখর করে তুলেছিলেন । তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি । এখনও কোন ইংরাজপুরুষকে তাদের ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করতে হলে পাদুকা খুলেই প্রবেশ করতে হয় ।[৫২]

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না'। বিশ্বকবির এই কথা দুটি মনে রেখে নির্ভয়ে কাজ করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান সহজ হয় । কিন্তু আমরা ভয়কে ভয় করতে শিখি. সাহস করে এগোতে পারিনা সব-সময় । কিন্তু ভয়কে তুচ্ছ করে একবার এগিয়ে গেলে ভয় আর ভয় থাকে না । আসুকনা যত বাধা বুক পেতে সহ্য করে এগিয়ে যেতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন হয় না । মিসেস্ মার্গারেট স্যাঙ্গার নারী মঙ্গলের মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করবার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন । মায়েদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শিশু যাতে মাতৃহীন না হয় এজন্য 'গর্হিত জন্মসংযম' কাজের জন্য অসুস্থ শরীর নিয়েও কতবার, কত অপমান, লাঞ্ছনা, উপহাস ও কারাবরণ করেছেন । চক্ষু লজ্জার ভয়, সমাজের ভয়, 'একঘরে' হবার ভয়, পুলিসের ভয়, কারাগারের ভয়, দেশদ্রোহিতার ভয়, এসব তিনি অগ্রাহ্য করে নারীর কঠিন সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । তাঁর চিন্তা ছিল যেমন করেই হোক অল্প বয়সে মাতৃত্ব গ্রহণ করে মৃত্যুর কবল থেকে নারীকে মুক্ত করতেই হবে ।[৫৩]

বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে মহিলাগণ ক্রমশঃই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হন । তবে মহিলাদের সংগঠন ও চেষ্টার ফলে বহু জায়গায় অনেক দুরূহ সমাজসংস্কার সংশোধন হয়েছিল । বাল্যবিবাহ প্রথা সমাজের অমঙ্গল স্বরূপ । একে রোধ করবার জন্য মহিলারা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন । এ সম্বন্ধে 'সহবাস-সম্মতি কমিটি' (Age of consent committee) তাদের রিপোর্টে বলেন যে, শিশুকালে মাতার আসন গ্রহণ করা মহাপাপ । ইহা মা এবং সন্তানের উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার

পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর ও মারাত্মক। শিশুকালে মা হবার কুফল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এত ব্যাপক যে এর নিরাকরণ দুঃসাধ্য। তবে সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথা যখন বিলোপ করা সম্ভবপর হয়েছে তখন শিশু-মাতৃত্বের নিরাকরণও শীঘ্রই সংসাধিত হবে। এছাড়া মহিলাদের আরো একটি বড় বাধা ছিল পর্দাপ্রথা। শিক্ষিত সমাজ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হলেও একমাত্র উত্তর ভারতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ অর্থাৎ ভারতের এক তৃতীয়াংশ নারী তখনও পর্দার আড়ালে নিজেদের লুক্কায়িত রেখেছিলেন।[৫৪]

জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভারতের মেয়েরা যখন একযোগে সমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারবে তখনই নারী প্রগতির দ্বার আপনা থেকে উন্মুক্ত হবে এবং সেবা, কল্যাণ ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। নারী প্রগতির উদ্দেশ্য নিয়ে ঐসময় অনেকগুলি প্রাদেশিক নারীসমিতি (Provincial women's council) গঠিত হয়েছিল। এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন প্রদেশের নারী সংঘগুলিকে সম্মিলিত করে সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণ সাধন ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা।

নারী উন্নতি মূলক বিভিন্ন প্রাদেশিক নারী সমিতিগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে একত্র করে এবং আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৫ সালে 'ভারত নারীর জাতীয় সংঘ' (National council of women in India) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। 'জয়শ্রী'র পাতায় আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদগুলি জানতে পারি। — হার্টগ কমিটি লিখেছেন, — ভারতে শিক্ষা বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রাখলে মেয়েদের দাবীকে পুরোবর্ত্তী করতে হবে। কাজেই জাতীয় উন্নতির জন্য মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে সকলেই অগ্রণী ও সহায়ক হবেন।[৫৫]

চীনা নারী সমাজে মাত্র ১০/১২ বৎসরের মধ্যে বিপ্লবকারী পরিবর্তন হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা এত দ্রুত সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তা চীনা-নারীর ঐকান্তিকতার পরিচয় বহন করে। সেই যুগে এশিয়া মহাদেশের আর কোন নারীসমাজ এত দ্রুততার সহিত অগ্রসর হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তবে এই ব্যাপারে চীনা-পুরুষ সমাজ তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আর তাছাড়া গৃহস্থালীর কাজ চালাবার লোকের কোন অভাব হয় না সে দেশে। চীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রী বলে কোন ভেদাভেদ নেই। প্রায় সর্বত্রই তখন সহঃধ্যাপনার প্রচলন ছিল। চীনা মহিলাদের যুগযুগব্যাপী

আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও জড়তা কাটতে বেশী সময় লাগেনি । যখন গোটা বিশ্ব জুড়েই নারীমুক্তি, নারী প্রগতির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, তখন কোন কোন দেশের মহিলাগণ দ্রুত সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, আবার কোন কোন দেশের মেয়েদের কিছু বিলম্বে হলেও নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা ও পুরুষের সম অধিকারের দাবী আদায় করতে বেগ পেতে হয়েছিল । তবে 'চীনে দেশ সেবার কাজে যে নিবিড় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল তার মূলে ছিল স্ত্রী-পুরুষের সহাধ্যাপনা ।"[৫৬]

দীর্ঘকালের শিক্ষা ও সংস্কারের ফলে নারী তার স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছিল । পুরুষ নিজের সুবিধার জন্য নারীর প্রাণশক্তিকে একেবারে জড় পদার্থে পরিণত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করত । আর নারী তার বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য, প্রয়োজন অপ্রয়োজন সবই বাড়ীর পুরুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য উৎসর্গীকৃত করত । নারীর কাছে সমগ্র জগৎ তার আশপাশের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত । সুতরাং তার সংসার ও স্বামী-সন্তানদের নিয়েই তার জগৎ । এই ক্ষুদ্র সংসার জগতের বাইরে যে বৃহৎ পৃথিবী আছে, তার কোন খবরই সে রাখেনি বা রাখতে দেয়নি তার সামাজিক পরিবেশ । এই অস্বাভাবিক অবস্থাই তাকে স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি করে তুলেছে বলা যায় । সে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে 'মানুষ' আখ্যা পাবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল ।

গৃহই নারীর একমাত্র কর্মক্ষেত্র নয়, সমগ্র পৃথিবী হচ্ছে তার কর্মক্ষেত্র । নারী তার যোগ্যতার প্রমাণ বহুক্ষেত্রে দিয়েছে । উপযুক্ত শিক্ষা এবং স্বাধীনতা পেলে সে অনেক লোকহিতকর কাজে যোগ দিয়ে জগতের প্রভূত উপকার সাধন করতে পারে, সেইজন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা । নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের সমকক্ষ এই জ্ঞান উভয়ের পক্ষেই আবশ্যকীয় । কেউ একজন ছোট, আর কেউ বড় নয় । পুরুষ নিজের আত্মম্ভরিতায় নিজের শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশকে নষ্ট করে ফেলেছে, আর নারী বহুকালের সংস্কারের চাপে নিজের ব্যক্তিত্বকেই হারিয়ে ফেলেছে।

নারী জাগরণ শুরু হয়েছে । সাম্য ও স্বাধীনতার যুগ শুরু । ভারত আজ জগতের সকল জাতির সঙ্গে সমান আসন দাবী করছে । নারীকে পুরুষের পাশে তার যোগ্য আসন গ্রহণ করতে হবে, ঘরে বাইরে সর্বত্রই তার কাজ আছে । কেবল গৃহকোনে বদ্ধ থেকে সমান অধিকার আদায় করা যায় না। এ অধিকার অন্যে দেবে না, নিজেকেই করে নিতে হবে । পরের অধীনে থেকে কেউ কখনও

স্বাধীনতার আস্বাদন করতে পারে না। সংহিতাকার মনু নারীকে বলেছিলেন . . . মহাভাগাঃ পূজার্হাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ।' রমণী মহাভাগ্যশালিনী, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা।

রমণী গৃহের লক্ষ্মী, তিনিই গৃহকে রক্ষা করেন। গৃহের সমৃদ্ধি ও আনন্দ রমণীর গুণের উপর নির্ভরশীল। পূর্বে রমণিগণকে বলা হত দাসী, অথবা একটু সম্মান দেখিয়ে দেবীও বলা হত। কিন্তু আধুনিক রমণিগণ পুরুষের সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী হয়ে সকল কাজে সমকক্ষতা অর্জনের দাবী জানাচ্ছেন। তারা দাসী বা দেবী কোনটাই হতে চান না।

বহুকালপূর্বে ভবিষ্যৎদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রাঙ্গদাকে দিয়ে বলিয়েছিলেনঃ—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে
রাখ মোরে সঙ্কটের পথে দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে-দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

এই যোগ্যতা অর্জনের সোনার কাঠি হল বিদ্যা। তৎকালীন সমাজে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলাগণের গুরুদায়িত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা দুঃখিনী অনাথা ভগ্নীগণকে উদ্ধারের জন্য তাদের মধ্যে জ্ঞানালোক দানে সাহায্য করতে অতিশয় কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরা কান্ডারী হয়ে সঠিক পথ নির্দেশ দান করেছিলেন। আমাদের অভাগা দেশমাতা দুঃখিনী কন্যাগণকে বিশ্বসভায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন। দুঃখিনী কন্যাগণকে অনাদর, অবহেলা, অশিক্ষার অন্ধকার ও কুসংস্কারের নিগূঢ় বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্তিদান করুন। প্রার্থনা করি একাজে ঈশ্বর তাদের সহায় হোন।

বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় 'ভারতী'র দান অপরিসীম। বঙ্গমহিলাগণকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন 'ভারতী'। বাংলা সাহিত্য 'ভারতী'কে

কেন্দ্র করে কেবল সমৃদ্ধই হয়নি, তাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠআসন পাবার পথ করে দিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'কে আরো সমৃদ্ধ করে সাহিত্যের বিভিন্ন পসরা নিয়ে বিশ্বের দরবারে, দেশের জনতার দরবারে হাজির হয়েছিলেন। তবে তাঁর লেখা 'ভারতী' ছাড়াও অন্য পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত ও সংকলিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য চর্চা বিশেষ করে মহিলাদের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবেশে 'ভারতী' যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে বঙ্গরমণীর খ্যাতিলাভে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মহিলাগণ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এজন্য তাদের চিরকাল 'ভারতী'র কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

বিংশ শতকের প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত মহিলা সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না। বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে পত্রিকার পাতায় আলোচনা হলেও মূল লক্ষ্য ছিল সেই মহিলাগণের শিক্ষা, স্বাধীনতা, সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার, দেশশাসনে, রাষ্ট্রীয় কাজে পূর্ণ অধিকার, ভোটাধিকারে পুরুষের মত সম-অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, সমাজজীবনে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করে চলার অধিকার, গৃহক্ষেত্রে ও সন্তান পালনে সম-অধিকারের দাবী নিয়ে পত্রিকাগুলি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। **'নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলন'** ও **'নিখিল এশিয়া সম্মেলন'** ভারতীয় সামাজিক প্রথাগুলির সংস্কার সাধন করে নারীর উপযুক্ত মর্য্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এগুলি আদায়ের জন্য পত্র-পত্রিকার ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে বলতে গেলে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে মহলাগণ সাফল্যই লাভ করেছিলেন। বাধা তো থাকবেই। দীর্ঘদিনের সংস্কার তো এক ফুৎকারে উবে যাবার নয় বা যায়ও না। অসীম সাহসিকতা, মনোবল, উদ্যম, শিক্ষালাভের ফলে মানসিক শক্তি ও ধৈর্য, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল মহিলাদের মধ্যে।

প্রথমদিকে যতই বাধা পাচ্ছিলেন ততই মহিলাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে তাঁরা আনন্দে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। যে আনন্দের স্বাদ তারা একবার উপভোগ করতে শুরু করেছিলেন, তা হারাতে কোনমতেই আর রাজি নন। তাই সামাজিক বাধাগুলিকে তখন তারা সাফল্য লাভের অন্তরায় মনে না করে একান্ত তুচ্ছ বিষয় মনে করে অবজ্ঞাই করতে শুরু করেছিলেন। এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে তখন তারা এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

তবে একথা সত্য বহু পত্র-পত্রিকা যে উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, নানা কারণবশতঃ তা দীর্ঘ পরমায়ু পায়নি। প্রথম বাধাই ছিল আর্থিক সঙ্কট। একটি পত্রিকা পরিচালনা করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করে উঠতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীকালে তা রক্ষা করেননি।

তাছাড়া দলাদলি ঈর্ষ্যা এতো বাঙ্গালী মাত্রেরই মনের ভূষণ, জীবনের সার বস্তু। একে উপেক্ষা করা সমসময় সম্ভব হয়নি। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করতে বাঙ্গালীজাতি চিরকালই সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময়ে মিলের পরিবর্তে অমিলই দেখা দিত বেশী। অধিকন্তু সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতির অভাবও ছিল। সেইসব কারণে বহু মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয়নি। তবে যারা সাহস ভর করে, বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করে সম্মুখে অগ্রসর হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তারা শত লাঞ্ছনা স্বীকার করেও সম্মুখবর্তী হয়েছিলেন, কোন বাধাই তাদের গতিপথ রুদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি। বিংশ শতকের প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলি নারীর ভাগ্যাকাশে উদিত হয়ে আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে নারীকে পৌঁছে দিয়েছিল সেই লক্ষ্যে যেখানে নারী সমাজজীবনে পুরুষের সব অধিকারগুলি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব বোধ করি এখানেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৮, পৃঃ ৫২। 'চয়ন' অংশ
২) 'জয়শ্রী' তদেব, 'চয়ন' অংশ।
৩) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ২১-২২।
৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৪ পৃঃ ২২১।
৫) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪ পৃঃ ২৩৫।
৬) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ১১৯।
৭) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ১২০।
৮) 'জয়শ্রী', 'বিশ্বগ্রহ সংবাদ', ১ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩৮, পৃঃ ৭৯৩ - ৭৯৫

৯) 'জয়শ্রী', 'বিশ্বনারী সংবাদ', ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ: ৪৮৫।
১০) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ১২০।
১১) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ১২১।
১২) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩১৭।
১৩) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩১৭।
১৪) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩১৮।
১৫) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩২১।
১৬) 'জয়শ্রী' তদেব পৃ: ৩২৩।
১৭) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ: ৭৬৮
১৮) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
১৯) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২০) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২১) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২২) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২৩) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২৪) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২৫) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪২ ।
২৬) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪৪ ।
২৭) 'জয়শ্রী' তদেব, পৃ: ১৪৫ ।
২৮) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ: ১৪৫ ।
২৯) 'জয়শ্রী', পৃ: ১৪৫ ।
৩০) 'জয়শ্রী', পৃ: ১৪৫ ।
৩১) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,'ঘরে বাইরে কলম', ফাল্গুন, ১৩৩৪ পৃ: ২৮৮।
৩২) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,'ঘরে বাইরে কলম', ফাল্গুন, ১৩৩৪ পৃ: ২৮৮।
৩৩) 'বঙ্গলক্ষ্মী', তদেব, পৃ: ২৮৮।
৩৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী', তদেব, পৃ: ২৮৮।
৩৫) 'বঙ্গলক্ষ্মী', তদেব, পৃ: ২৮৯।
৩৬) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,'ঘরে বাইরে কলম', ফাল্গুন, ১৩৩৪ পৃ: ২৮৯ ।
৩৭) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষে, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩২১ ।
৩৮) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃ: 'ঘরে বাইরে কলমে' ।
৩৯) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃ: 'ঘরে বাইরে কলমে' ।
৪০) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃ: 'ঘরে বাইরে কলমে' ।
৪১) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষে, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ: ৭৯৫ ।
৪২) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষে, ১১শ সংখ্যা ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ: ৭৯৪ ।
৪৩) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩১৯ ।
৪৪) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃ: 'ঘরে বাইরে কলম' ।
৪৫) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃ: 'ঘরে বাইরে কলম' ।
৪৬) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃ: 'ঘরে বাইরে কলম' ।

৪৭) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩২২।
৪৮) 'জয়শ্রী', তদেব ।
৪৯) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ: ৩২০।
৫০) 'জয়শ্রী', তদেব পৃ: ৩১৯ ।
৫১) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৮, পৃ: ৫৯
৫২) 'বঙ্গলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪ পৃ: ২৯৬ 'নানাকথা প্রসঙ্গ'।
৫৩) 'জয়শ্রী', 'বিচিত্রা', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ৯১।
৫৪) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ১২১।
৫৫) 'জয়শ্রী', বৈশাখ, ১৩৪০, পৃ: ১২০।
৫৬) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ: ৪৮৭।

—ঃ—

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলোচিত বিষয়বস্তুর সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একদিন নারীকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করে বলেছিলেন—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ?
কেননা ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা পাশে ?
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ ?[১]

আজকার দিনের নারী বিশ্বকবির এ প্রত্যাশা পূরণ করেছেন অনেকাংশে ।

সময় গতিশীল । নিরন্তর তার পরিবর্তন হচ্ছে । সদা পরিবর্তন শীলতাই জীবনের লক্ষ্য । এই পরিবর্তনশীল জগতে মানুষ অপূর্ণ । মানুষের সর্বকর্মই অসম্পূর্ণ। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এই অসম্পূর্ণ কর্মকে ক্রমাগত সংশোধন ও পরিবর্তন করে চলাতেই আছে মানুষের গৌরব । সেই মান্ধাতার আমলের সামাজিক বিধি বিধান মনুর আমলে বদল হয়েছিল, আবার মুশার আমলের বিধি বিধান মহম্মদের আমলে পরিবর্তিত হয়েছিল । এইভাবে মানুষ ক্রমাগত নিজের কর্ম সংশোধন করতে

করতে এগিয়ে চলেছিল সম্মুখের দিকে । যে জাতি যত বেশী কালধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছে সে জাতিই তত বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের অধিকারী হয়ে জগতের নিয়ন্তা হয়ে বসেছে ।

এই বিশ্ব সংসারে নারী-পুরুষ একই ভগবানের সৃষ্ট জীব । নারী-পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টাতে এই জগৎ সংসার চলছে । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সমাজে নারীর জন্য এক বিধান, পুরুষের জন্য অন্য । গতিশীলতাই সমাজের ধর্ম । সমাজ বিবর্তনের প্রকৃতি বা ধারা অনুসারে মানুষের শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধ ক্রমাগতই রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলার সমাজ জীবনেও সেইরূপ বিভিন্নযুগে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটেছে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ। প্রাচীন সামাজিক বিধি বিধানগুলি ক্রমাগতই পরিবর্তিত হতে হতে রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। মনুর আমলের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ক্রমশঃই সমাজ তার গতিপথ বদলাচ্ছে ।

রাজা রামমোহনের আমল থেকে আমাদের সমাজেও বহুবিধ পরিবর্তন শুরু হয়েছে । আমাদের পূর্ব পূর্ব পিতামহগণ কতশত মা, মাসি, বোন, স্ত্রী প্রভৃতিকে স্বামীর জলন্ত চিতায় আহুতি দিয়েছেন। আমাদেরই পূর্ব পিতামহী মাতামহীগণ তাদের সন্তানকে নদীতে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন — এসব কথা এখন গল্প বলে মনে হয় । তাঁদের এইসব নিষ্ঠুর আচরণে এখন আমরা লজ্জা ও দুঃখবোধ করি। দেশে যখনই কোন পুরাতন বিধি বা প্রথার সংস্কার সাধনের চেষ্টা শুরু হয়েছে তখনই মহাকোলাহলে একদল লোক তাকে বাধা প্রদানের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। যে দেশে যত বেশী চিন্তাশীল ব্যক্তি বাস করতেন সে দেশে সমাজসংস্কার তত বেশী সহজ হতো। শিক্ষা ও বিদ্যালাভের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেলে সমাজ জীবনের জীর্ণশীর্ণ বিধানগুলিরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জীবন গতিময়। অনবরত পরিবর্তনই জীবন ।

মানুষ সমস্ত জীবনই কিছু না কিছু শেখে । কথায় বলে - যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি । শৈশবের শিক্ষা একপ্রকার, কৈশোরে অন্যরকম, আবার শৈশবের জ্ঞান বা বোধ যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে তার অন্যরকম তারতম্য ঘটে । বয়সের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কাজ কর্ম ও রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটে । দেশের শিক্ষিত চিন্তশীল ব্যক্তিদের উপর সমাজের উন্নতির অনেক গুরুদায়িত্ব নির্ভর করে। সেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ক্রমশঃই অনুভব করতে শুরু করছিলেন যে নারীকে পশ্চাতে

রেখে সমাজ বা দেশের উন্নতি বিধান করা একেবারেই অসম্ভব ।

পুরুষ ও স্ত্রী নিয়ে এই সমাজ সংসার । নারী হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রশক্তি। নারীর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া কোন কর্মই সুসম্পন্ন হতে পারে না। সেই নারীশক্তিই এতদিন আমাদের দেশে ছিল অবহেলিত । আমাদের দেশে উনিশশতকের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার একেবারেই ছিলনা বললে কিছু অন্যায় বলা হবে না। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জিত হয়, নিজেদের ভালমন্দ নিজেরা বুঝতে পারে । পরিবারের ও সমাজের কল্যাণ কিসে হয় তা উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্যই মানুষ পশু থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতে পারে । নারীর ভিতরে ঐহিক সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছিল । তার না ছিল শিক্ষা, না ছিল কোন স্বাধীনতা। এই কারণে নারী নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল ভীত শঙ্কিত হয়ে।

শিক্ষা দ্বারাই মানুষ কুসংস্কার মুক্ত হয় । নিজের স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা দূরীভূত করতে পারে । সুতরাং সকলের অগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শিক্ষার প্রসার ঘটান । আমাদের দেশের নারীসমাজ সেই শিক্ষার আলো থেকে ছিল বঞ্চিত । না চাইলে কিছু পাওয়া যায় না । প্রধান কথা হচ্ছে — আমি কিছু চাই । যীশুখৃষ্ট তাই বলেছিলেন — Ask, and it shall be given to you; Seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. - St. Mathhew.7.7.[২]

বৈদিক যুগে আমাদের দেশে বিশ্ববারা, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী ও বিদ্যাবতী খনা প্রভৃতিকে নিয়ে যত গর্ববোধই আমরা করিনা কেন তাঁরা ছিলেন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম । বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশের রমণিগণ কখনই সমাজে সম্মানের অধিকারী ছিলেন না, গৃহ বা সমাজে কোথাও তাঁদের বিশেষ অধিকার দেয়া হয়নি । ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত বঙ্গীয় রমণিগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার দাবী তখনও তেমন প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি ।

ভারতবর্ষে প্রথম নারীশিক্ষার প্রচলন হয় ঊনবিংশ শতকে । তার আগে কয়েকজন রমণীর কালি কলমের সঙ্গে যোগ থাকলেও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় তারা কেউ দিতে পারেননি ।

কন্যাসন্তানকেও পুত্রের ন্যায় উপযুক্ত শিক্ষা ও আদরযত্ন দিয়ে লালন পালন করা পিতামাতার কর্তব্য। মনু বলেছিলেন — 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতু যত্নতঃ' । মহাত্মা বেথুন সাহেব যখন কলকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

করছিলেন তখন বিদ্যালয়ের গাড়ীর গায়ে মনুর এই শাস্ত্র বচনটি লিখিত ছিল ।

সম্ভবতঃ মহিলাগণের জীবনে অভিশাপ নেমে আসে মুসলমান রাজত্বকালে। সাত শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে নারীর জীবনকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত করে একেবারে চালান করে দেয়া হয়েছিল অন্দরমহলে । তখন থেকেই সম্ভবতঃ পর্দাপ্রথা চালু হয়েছিল ।

মুসলমান আমলে দেশের রাজনৈতিক জীবন ছিল ঘাত- প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ । ১৭৫৭ অব্দে বাংলার শেষ স্বাধীনতা সূর্য সিরাজউদ্দৌল্লা অস্তমিত হলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ও সমাজজীবনে শুরু হয় ঘৃণ্যতম অনাচারের কাহিনী । পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক ও দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে লোভ-লালসা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তার ফলে বাঙ্গালী তার সাহস ও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল । বাঙ্গালীর চরিত্রে হীনতা, পঙ্কিলতা এই সময় থেকেই বেশী করে দেখা দেয় । তখন থেকেই নারীর উপর বর্ষিত হয় বিধাতার অভিশম্পাত । তখন থেকেই নারী শিক্ষাবিহীন অবস্থায় অন্দরমহলে বন্দীদশায় আবদ্ধ হন । এরজন্য দায়ী মুসলমান আমলের অত্যাচারী শাসকদের নারীদেহের প্রতি পৈশাচিক লালসা ।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার ফলে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে । এই বিচ্ছেদের ফলে আধুনিক যুগের সূচনা হয় । মধ্যযুগের সমাজ ছিল একটা 'rigidly graduated system' । সমাজে মানুষ তখন টাকার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত । এই টাকার জোরে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছিল । ব্যবসা - বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও টাকার সচলতার জন্য ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ বিশেষ করে কলকাতা মহানগরে এক অভিজাত ধনিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল । তাদের অধিকাংশেরই টাকার ধান্দায় কলকাতায় আগমন ও বিপথে কুপথে যে কোন কৌশলে টাকার আমদানী করাই ছিল উদ্দেশ্য। যদিও বাণিজ্যের স্বাধীনতা ছিল কেবলমাত্র ইংরেজদের । করিতকর্মা বাঙ্গালীরা ইংরাজদের অধীনে যে কোন অর্থকরী কর্মে নিযুক্ত হয়ে বহু অর্থ উপার্জন করে বিত্তবান হয়েছিলেন । অনেকেই কুলগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে নতুন টাকার মর্য্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । সিরাজের পতনের পর ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্যের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হয় । ইংরাজ বণিকগণ অপ্রতিহত গতিতে নিরীহ বাঙ্গালী জাতির উপর নানাবিধ উৎপীড়ন শুরু করেন। অর্থলোলুপ

বাঙ্গালী ইংরেজদের অধীনে কর্মগ্রহণের মানসে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন।

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের সংস্কার আন্দোলন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও মূল অর্থনৈতিক গঠনের পরিবর্তন ছাড়া সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়, এটা তাঁরা অনুভব করছিলেন । উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনেকাংশে ব্যর্থতা ও ট্র্যাজিক পরিণতির অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার এটাই প্রধান কারণ বলে মনে হয় । বাংলার নবজাগরণ মূলতঃ নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মস্তিষ্কের আন্দোলন। দেশের মানুষের আন্দোলন নয়। সমাজে তখন অজস্র ধর্মীয় কু-সংস্কার, আচার বিচার, বাহ্য অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা ও বহু দেবতাবাদ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এতে রামমোহন রায় গভীর ব্যথিত হয়ে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করে হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপ সমগ্র দেশবাসীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। রামমোহন রায় শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারকদের পথ অনুসরণ করলেও একাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন । যদিও বিদেশে তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য সে ব্যর্থতা তিনি অনুভব করতে পারেননি । তবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব কিছুটা বজায় থাকলেও তার আদর্শ অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ১৮৪৩ সালে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মধর্মের নতুনরূপ দান করেন এবং বলেন যে পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হল ।

উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্যের উদারমুখী ভাবধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকগণ বিদেশী ইংরাজ শাসকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সব কাজকর্ম, এমনকি তাদের আচারবিচার এবং বিশ্বাসকে পর্যন্ত প্রগতির উপায় বলে মনে করতে থাকেন । সেই নব্যশিক্ষিত যুবকগণ দেশীয় আচারবিচার, ধ্যানধারণা ও ধর্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা করে আংশিক বা সম্পূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে নূতন সমাজ গড়ার ভাবনায় মন দেন । রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় এই সময় একে একে সমাজের বিষবৃক্ষস্বরূপ সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতির মত সামাজিক দুর্নীতিগুলির বিলোপ সাধনে সক্ষম হন । মহাত্মা রামমোহন বেণ্টিকের সহায়তায় সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথাকে আইন করে বন্ধ করেন । বিধবাগণ যাতে সমাজে

স্বাভাবিক নিরাপত্তালাভে সমর্থ হন এবং যাতে সমাজে সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন তার জন্য নারীশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করে মহিলাদের পক্ষ নিয়ে শিক্ষাবিস্তারকল্পে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লোকের মনে যে হীন ধারণা ছিল তার উত্তরে স্ত্রীজাতির উকিল হয়ে তিনি বলেন ঃ—

"স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারেন, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?"[৩]

রামমোহনের এই যুক্তির সত্যতা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল । যে সময় রামমোহন রায় সমাজের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাকারে উক্ত তিরস্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঠিক সেই বৎসরেই কলকাতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে এক মিশনারি মহিলা-সমিতি কলকাতার নন্দনবাগানে ১৮১৯ সালের জুনমাসে (বর্তমান গোরীবেড়ে অঞ্চল) 'ফিমেল জুভেনাইল স্কুল' এবং পরে গোরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর এলাকায় যথাক্রমে 'লিভারপুল স্কুল', 'সালেমস্কুল' ও 'বার্মিংহাম স্কুল' নামে আরও তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । তাছাড়া মিস্ মেরী অ্যান কুক নাম্নী বিদ্যানুরাগিণী এক ইংরেজ মহিলার উদ্যোগে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লেডিজ সোসাইটি' ও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন' এর মাধ্যমে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ কুকের প্রযত্নে কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল — 'ঠনঠনিয়া স্কুল', 'মির্জাপুর স্কুল', প্রতিবেশী স্কুল', 'শোভাবাজার স্কুল', 'কৃষ্ণরাজার স্কুল', 'শ্যাম বাজার স্কুল', 'মল্লিক বাজার স্কুল' ও কুমারটুলি স্কুল' প্রভৃতি ।

এরও পূর্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির যাজক রবার্ট মে হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে প্রথম ১৪ জন এদেশীয় ছাত্রী নিয়ে একটি বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন । সেটি ছিল এদেশের প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়।

এরপর কলকাতা ও তার আশেপাশে ধীরে ধীরে বহু বিদ্যালয় গঠিত হতে থাকে । তবে বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' পরবর্তীকালে বেথুনস্কুল

প্রতিষ্ঠার দু-বৎসর পূর্বে ১৮৪৭ সালে বারাসাতে একটি স্কুল প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল । এটি ছিল বে-সরকারী স্কুল ।

যে যুগে বাঙ্গালি পুরুষের ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয় — সেই যুগেই মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এ কি কম সাহসের কথা! নারীশিক্ষার দ্বার আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হয় । 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপনের এক পক্ষকাল পরে রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় তার শোভাবাজারের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ।

কিন্তু এতসব বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও মেয়ে ছাত্রী জোগাড় করা ছিল সে যুগে কষ্টসাধ্য ব্যাপার । অনেকেই নিন্দার ভয়ে মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে চাইতেন না । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সাহসী মনস্বীর প্ররোচনায় তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তাঁর দুই কন্যাকে বারাসাতের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন । এছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে সৌদামিনী, হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে বেথুন স্কুলের প্রথমদিকের ছাত্রী ছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় ১৮৫৭-৫৮ সালে বেশ কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ ।

কেবল বিদ্যালয় স্থাপিত হলেই তো হয় না । সমাজের লাঞ্ছনার ভয়ে বহু অভিভাবক বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে অস্বীকার করতেন । তাছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার কতকগুলি প্রধান অন্তরায় ছিল । তারমধ্যে প্রধান অতি অল্প বয়সে বিবাহ্ হওয়া । 'সারদা আইনে'র কল্যাণে বাল্যবিবাহ্ অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হলেও হিন্দ-মুসলমান মিলে সেআইন বন্ধকরারজন্য মহা কোলাহল সৃষ্টি করেছিল সেইসময়। তবে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর হয়েছিল। সেখানে মেয়েদের বিবাহও একটু অধিক বয়সে হত ।

সাধারণতঃ তখন সমাজে কোন একটি কন্যা সন্তানের ১০/১২ বছর বয়স হলে বিবাহ দেয়া হত । শৈশবে বিদ্যাশিক্ষা শুরু হলেও বিবাহের পর অধিকাংশ মেয়েদের ক্ষেত্রেই শিক্ষা ঐখানেই সমাপ্ত হত । তবে কিছু কিছু মহিলা বিবাহের পরেও স্বামীর ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্নে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন । তবে তার সংখ্যা খুবই নগণ্য ।

তাছাড়া স্ত্রীশিক্ষার আর একটি বড় বাধা ছিল পর্দ্দাপ্রথা । আমাদের দেশের মেয়েরা এতদিন নীরবে তা সহ্য করে এসেছিলেন । শুধু তাই নয়, অনেকে একে গৌরবের বিষয় বলেও মনে করতেন । দীর্ঘদিনের অভ্যাসে অপমানও আর তাদের মনকে তত পীড়িত করত না। কোন এক সময়ে 'মাঞ্চুজাতি' চীনদেশ অধিকার করে দাসত্বের চিহ্ন স্বরূপ চীনাদের দীর্ঘ বেণী ধারণ করতে বাধ্য করেছিলেন । এই হীনতার চিহ্ন তাদের শেষ কালে গৌরবের বিষয় হয়ে উঠেছিল । মনস্বী সুন-ইয়াং-সেন দেশের জনমনে তাদের হীনতা সম্বন্ধে যখনই চেতনা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, তখনই তারা একদিনে বেণী কেটে মুক্ত হলেন ।[8]

সে সময়ে বধূ বা স্ত্রীলোকদের পুরুষজাতিকে দেবতা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া এবং তাদের যাবতীয় অত্যাচার, অবহেলা, নির্যাতন স্বীকার করে যন্ত্রণাময় জীবনে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা । আর তাছাড়া বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকাব না থাকার জন্য স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাদের একমুষ্ঠি অন্নের জন্য পরাশ্রিত হয়ে কত যে অপমান গ্লানি সহ্য করতে হত তার পরিসীমা করা দুষ্কর। অনেক বিধবা তাদের শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে অন্যের গলগ্রহ হয়ে আত্মীয় স্বজন বা পরের সংসারে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হতেন, একথা গল্প নয়। বহু বালবিধবা বাপের বাড়ীতে বা স্বামীর আত্মীয় স্বজনের গৃহে রাঁধুনী হয়ে কখনও বা অন্যান্য দাসদাসীর সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে দিনাতিপাত করতেন। আর এছাড়া সামাজিক কতকগুলি বিধিনিষেধের জন্য তাদের সংসারের অন্য পাঁচজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত । যে নারী স্বামী বর্তমান থাকা অবস্থায় সংসারের বহুবিধ দায়দায়িত্ব ও সুখসুবিধা ভোগ করতেন, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতি একেবারে সম্পূর্ণ উল্টে যেত ।

বিধবা মহিলাদের স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার ফলে দুঃখের বোঝা তাদের আরো বৃদ্ধি পেত । সতীদাহ থেকে নিষ্কৃতি পেলেও দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্যে তাদের জীবন কাটাতে হত । তখনকার দুঃখ বঞ্চনার অনেক কাহিনীর মধ্যে একটির কথা এখানে উল্লেখ করছি । সারদাসুন্দরী ছিলেন দেওয়ান রামকমল সেনের মধ্যমপুত্র প্যারীমোহনের স্ত্রী। গরীবের মেয়ে হলেও সুন্দরী ও সদ্‌বংশজাতা ছিলেন । তাঁর সবই ছিল । সব পেয়েও ছিলেন । কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই হারালেন । শুরু হল শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হৃদয়হীন অত্যাচার, সারদাসুন্দরীর খাবার অভাব না থাকলেও মনের আঘাত কম সইতে

হয়নি। প্যারীমোহনের মৃত্যুর দিনপনেরোর মধ্যেই তার দেবর দরজা ভেঙ্গে প্যারীমোহন যে খাটখানিতে শুতেন তা নিয়ে যান । এমনকি প্যারীমোহনের দামী শাল দোশালাগুলিও একে একে সিন্দুক খুলে বার করে নিতে লাগলেন তার দেবরেরা। সারদাসুন্দরীর মতামতের কোন মূল্যই তাঁরা দিলেন না । এই হতভাগিনী ছিলেন ব্রম্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জননী ।

এইরূপ আরো কত দুঃখিনী বিধবার দুঃখকাহিনী আছে যা তৎকালীন সমাজে কোন পশুর উপরও বোধ হয় করা হত না । সারাজীবন আত্মীয় স্বজনের অশ্রদ্ধায়, অবহেলায় সোনার বর্ণে পড়ত তাদের কালি, চোখের সামনের দিনগুলির আলো ঝাপসা হয়ে যেত । তখনকার সমাজপতিদের বক্তব্য ছিল — ভাগ্যবানের বউ মরে, তামা পিতলে ঘর ভরে । আর নারীর বেলায় হতো তার উল্টো ।

তখনকার শাশুড়ীরাও বধূদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন । তবে অনেক শাশুড়ী ছিলেন যারা ছোট ছোট বালিকা বধূকে আদর ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনেও আনতেন । তবে সংখ্যায় তা ছিল খুবই কম ।

সমাজে সকলেই ছেলে কামনা করতেন । ছেলে ভূমিষ্ঠ হলে ঢাক, বাদ্য, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হত, আর কন্যা সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ পাওয়া মাত্র গোটা পরিবার দুঃখে শোকে ভেঙ্গে পড়ত ।

অনুরূপা দেবীর 'জীবনের শ্রুতিলেখায়' জানা যায় যে তিনি ভূমিষ্ঠ হবার পর পরিবারে আনন্দবর্ধন করার বদলে নিরানন্দই ডেকে এনেছিলেন। তবে দুই এক ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছে । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী জন্মাবার পর গোলকমণি উচ্চরবে কেঁদে উঠেছিলেন নাতনি হয়েছে বলে । শিবনাথের বাবা হরানন্দ শর্মা গিন্নীকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন — আমাদের একমাত্র সন্তান শিবনাথের প্রথম সন্তান, ওই আমার নাতি হয়েছে, এখনই অলক্ষুণে কান্না থামাও ।

তখনকার সমাজে মেয়ে হলে মনে হত ঈশ্বরের অভিশাপ যেন গোটা পরিবারটির উপর বর্ষিত হয়েছে । পুত্র সন্তানের জন্মদিলে বধূদের জীবনে আদর বৃদ্ধি পেত । আর কন্যা সন্তানের জন্মদিলে বধূর অনাদর শুরু হত । এমনকি মা পর্যন্ত কন্যা সন্তানকে অনাদরে কোলে নিতেন না । আতুরঘরে নুন খাইয়ে তাকে মেরে ফেলতে চাইতেন । অবশ্য এটা মনে হয়, কন্যাসন্তানের জন্ম দেবার ফলে সংসারে বধূর নির্যাতন বেড়ে যেত তাই ।

কি ভয়ঙ্কর সামাজিক চিত্র । যে নারী নিজের শরীর পাত করে সন্তানের

লালন পালন ও মাতৃস্নেহের করুণা দিয়ে সমাজ সংসারকে বর্ধিত করতেন সেই নারী জাতির ছিল এই অনাদর।

সেকালে সমাজকে অগ্রাহ্য করা বড়ই কঠিন ছিল। কেউ সমাজকে মানছে না এর একমাত্র শাস্তি ছিল 'একঘরে' করে দেওয়া। সে শাস্তি ছিল ভয়ঙ্কর নিদারুণ। মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে, বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ সব বন্ধ। গুরু, পুরুত, ধোপা, নাপিত কেউ তার কাজ করবে না। এমনকি কেউ মারা গেলে পর্যন্ত গ্রামের কেহ মড়া পোড়াবার জন্য আসত না। বাসি মড়া হবার ভয়ে প্রিয়জনের মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে পুড়িয়ে আসতে হত। সমাজপতিদের এ অত্যাচার ছিল ফাঁসীর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সমাজের আর একটি দুরূহ ব্যাধি ছিল - কৌলীন্য প্রথা যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রেঅশান্তির আগুন ছড়িয়েছিল। কুল রক্ষার তাগিদে মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধের গলাতেও দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা মালা পরাতেন। তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখা গেছে যে কেউ কেউ ষাট-পঁয়ষট্টি জন কন্যার কুলরক্ষা করছেন। এক একজন একশতর বেশীও বিয়ে করতে দ্বিধা করেননি। কুলীনদের এই বিবাহ ব্যবসা হয়ে দাড়াল সমাজের পক্ষে অমঙ্গলস্বরূপ। বল্লাল সেন যেসব কুল লক্ষণ মিলিয়ে কৌলীন্য প্রথার জন্ম দিয়েছিলেন কালে তা হয়ে দাড়াল এক শূন্যগর্ভ সামাজিক মর্য্যাদা। কুলনীপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিলে কুল রক্ষা পাবে, বংশগৌরব বৃদ্ধি পাবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু মেয়ের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছিল। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব এই কুলীন পাত্রের ছিল না। অধিকন্তু কুলীন জামাতা শ্বশুরালয়ে ঘুরে ঘুরে টাকাকড়ি আদায় করতেন এবং এক নববিবাহিতা পত্নীকে রেখে আর একটি বিবাহে অগ্রসর হতেন। অধিকাংশ কুলীনই নানা রকম বাজে নেশার বশীভূত ছিলেন। কুলরক্ষা ও বংশগৌরব বৃদ্ধি করা নামক বিবাহ-ব্যবসা বেশ ভালরকম ফুলেফেঁপে উঠেছিল সেইসময়। বহুবিবাহরূপ পাপাচারের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে জনমত জাগ্রত করার মানসে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে এর কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করেছিলেন। সেই পুস্তিকার একাংশে বহু বিবাহ সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান পেশ করেন — তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭০	৬৪	দেশমুখ
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালী
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	চিত্রশালী
তিতুরাম গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই [৫]

তালিকায় মোট ১৩২ জনের নাম আছে। শেষ নাম দন্ডিপুরের মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮ বৎসর বয়সেই ৫টি বিবাহ করেছিলেন । এছাড়া ঐ সময় বহু রাজা মহারাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজেদের ভোগ চরিতার্থ করার জন্য এবং ঐশ্বর্যপ্রাবল্য প্রমাণ করার জন্য বহু বিবাহ করতেন। বহু বিবাহ নারীর জীবনে অভিশাপ, বহুবিধ দুঃখ ও নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের মধ্যভাগে দেশের নানা অঞ্চল থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল । "হুগলী জেলার স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথম 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উহার পক্ষ হইতে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় সুতরাং ইহা রহিত করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক আবেদন প্রেরণ করেন ।"[৬]

তবে রাজশক্তির সহায়তা নিয়ে সমাজসংস্কার বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কেহই সমর্থন করেননি । বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিপক্ষতা করেছেন। বিধবাবিবাহ মনে প্রাণে সমর্থন করেননি । পছন্দ করে বিয়ে করা এবং শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ।

বহুবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে বহুলোকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন সরকারের কাছে জমা পড়লেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসে কোন রকম আঘাত করবেন না বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন । তাই তৎকালে বহু বিবাহ নিরোধ আইন পাশ করা সম্ভব হয়নি ।

মহিলাদের পক্ষে কোন সামাজিক প্রতিকারের প্রথম পদক্ষেপ সতীদাহ প্রথা

নিবারণ আইন পাশ করা। ঢাক ঢোল বাজিয়ে একটা জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারার মত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধনী স্বামীর স্ত্রীকে 'সতী' হবার লোভ দেখিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারলে সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক সুযোগ লাভ করা সহজ হত। সেইজন্য সম্পন্ন পরিবারের বিধবাকেই সতী হবার জন্য বেশী করে প্ররোচনা দেয়া হত। আর গরিব ঘরের বিধবা আত্মীয় স্বজন বা অপরের সংসারে দাসীবৃত্তি করে বাকী জীবন অতিবাহিত করতেন। তিল তিল করে এরা জ্বলে পুড়ে মরতেন। তার চেয়ে একবারে পুড়ে মরা তাদের কাছে মনে হত অনেক শ্রেয়।

ইংরেজ শাসনে আমাদের যত ক্ষতিই হোক্‌না কেন, একটা বড় উপকার সাধিত হয়েছিল তা হল আমরা যুগযুগান্ত পরে আবার দুনিয়ার সভ্যতা স্রোতের মাঝখানে এসে দাড়াতে পেরেছিলাম। ইংরাজী ভাষা আয়ত্ব করে আমরা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ জ্ঞান ভান্ডার থেকে রত্নরাজি সংগ্রহ করতে সমর্থ হই এবং আমাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে, যার ফলে আমরা দীর্ঘদিনের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পেরেছিলাম। অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কু-সংস্কারের আবেষ্টনীর জাল কেটে মুক্ত আঙ্গিনায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। এটা কি কম লাভ হল? আমরা বাঙ্গালীজাতি নানা কুসংস্কারের বন্ধনে এমনই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে তার থেকে মুক্তির পথ দেখাবার কেউ ছিল না। ইংরেজগণই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে একে একে আমাদের ত্রুটিগুলি চোখের সামনে তুলে ধরতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের দৈন্য কোথায়। আমরা সৃষ্টির অর্দ্ধাংশ নারীজাতিকে পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়ে দেশের ও জাতির সর্বনাশের পথ তৈরী করেছিলাম। বঙ্গনারীর শিক্ষা বা স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা কিছুই ছিল না। তারা গৃহমধ্যে বন্দিনীর জীবন যাপন করতেন। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা তাদের জীবনকে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করে তুলেছিল। তার উপর সমাজে ছিল অস্পৃশ্যতা নামক আর একটি কাল ব্যাধি। একই ভগবানের সৃষ্ট মানুষ আমরা। ধর্মগত এবং জাতিগত বিভিন্নতার জন্য আমাদের মাঝখানে একটা মস্ত প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছিল। যদিও বিংশ শতক থেকে আমরা প্রাচীন পন্থীদের সে প্রাচীরে ফাটল ধরাতে শুরু করেছিলাম। এতে আমাদের মনের মলিনতা কেটে গিয়ে উন্মুক্ত সামাজিক পরিবেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস পেয়েছিলাম কতকটা।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ পাশ্চাত্যের শিক্ষা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের স্ত্রীজাতির যুগ যুগ ব্যাপী অসহনীয় সামাজিক ও পারিবারিক লাঞ্ছনা

ও অপমানের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেও স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার সহযোগীরা হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চাইলেও জাতিভেদ প্রথা ভেঙ্গে দেওয়া এবং স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথা উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বর্ণকুমারীর লেখায় আমরা জানতে পারি অবরোধ প্রথা ঠাকুর বাড়ীতেও কতটা জাঁকিয়ে বসেছিল। তিনি বলেন—মা কখনও গঙ্গাস্নানে যেতে চাইলে বেহারারা পাল্‌কি সুদ্ধ জলে ডুবিয়ে আনতেন। পাল্‌কির বাইরে বেরিয়ে সকলের সমক্ষে গঙ্গাস্নান করার অনুমতি ছিল না। তবে পরবর্তীকালে অবরোধ প্রথা ভঙ্গ করার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুচরেরা জাতিভেদ প্রথা তুলে দিলেন এবং আইন করে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ যাতে বন্ধ করা যায় তারজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ চালু করলেন যা ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে দেখা যায়নি। কিন্তু এতটা প্রগতিবাদী উদার মনোভাবাপন্ন হয়েও কিন্তু তাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।[৫]

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাত গিয়ে 'ভারতী'তে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে লিখতে শুরু করেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে বহুদিন তর্কযুদ্ধ চলেছিল। প্রথমদিকে ব্রাহ্মমন্দিরে পর্দাপ্রথা চালু ছিল। মহিলাগণ পর্দ্দার ভিতরে বসে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন। শুধু তাই নয়, যখন মহিলাগণ বন্ধ গাড়ীতে মন্দিরের দরজায় এসে উপস্থিত হতেন তখন মন্দিরের প্রবেশ পথের দুধারে ভৃত্যেরা পর্দা তুলে ধরতেন। এই নিয়ে দুর্গামোহন দাস প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের দলাদলি এমন বেড়ে গিয়েছিল যে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরে অবশ্য কেশবচন্দ্র পর্দ্দার বাইরে সপরিবারে বসবার ব্যবস্থা করে বিরোধ তখনকার মত মিটিয়ে ফেলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বহুকাল ধরে তাঁদের লেখা এবং বক্তৃতাদিতে স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধ মতবাদই প্রচার করেছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল দেশের পুরুষ সমাজের চরিত্র এখনও বিশুদ্ধ হয়নি এবং তাদের দৃষ্টি কামলিপ্সায় পরিপূর্ণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পর্দাপ্রথা একেবারে উঠে যায়। যে ব্রাহ্মরা এতটা প্রগতিশীল তাদের মনোভাবের জন্যও মহিলাদের কম লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করতে হয়নি। সেকালের নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্ম মহিলাদের উপলক্ষ করে কত যে বিদ্রূপবাক্য ও অপমানকর কথাবার্তা বর্ষিত হয়েছিল তা বলায় নয়। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেও ব্রাহ্ম মহিলাদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হত । তবে অতি অল্পকালের ব্যবধানে সমাজের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল । সেকালের সমাজ সংস্কারকেরা মহিলাদের উন্নতি করতে গিয়ে তাঁরাও সমাজের অনেক নির্যাতন, অপমান সহ্য করেছেন তা কালপ্রভাবে সার্থক হয়েছে বলা যায়।

বিংশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা আরো ব্যাপক আকারে দেশের সর্বত্র প্রসারিত হতে থাকে । শুধু বঙ্গদেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বহু কৃতী মহিলার সংবাদ যেমন পাওয়া যেতে থাকে তেমনি বঙ্গদেশেও বহু কৃতী মহিলার সন্ধান পত্রপত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। মহিলাগণ শিক্ষা লাভের ফলে দেশ বিদেশের বিভিন্ন সম্মান জনক পদে অংশ নিতে থাকেন।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাগণ যেভাবে অংশ গ্রহণ করে ভারতবাসীকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। মহিলাগণের সাহায্য ছাড়া দেশের স্বাধীনতা কোন দিনই আসত না । কোলের শিশু সন্তানের বন্ধন পর্যন্ত উপেক্ষা করে মহিলাগণ দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এমনকি যে নারী কোনদিন নিকট আত্মীয়ের সামনে পর্যন্ত বের হতেন না, তারা পর্যন্ত লজ্জা আবরু উপেক্ষা করে পতাকা হস্তে সভাসমিতিতে উপস্থিত হয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগানে মুখরিত হতেন ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহিলাগণ প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যের আসরে এসে উপস্থিত হন । বঙ্গনারী রচিত প্রথম নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তবিলাসিনী' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । লেখিকা কৃষ্ণকামিনী দাসী ।[৮]

এরপর একে একে বহু মহিলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে থাকেন । পরবর্তী দশ বৎসরে সাতজন মহিলা লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল । বামাসুন্দরী দেবীর "কি কি কু-সংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে ?" ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । হরকুমারী দেবীর — "বিদ্যা দারিদ্র্য দলনী কাব্য" (১৮৬১) । কৈলাসবাসিনী দেবীর — "হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা" (১৮৬৩)। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক — 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫।

মার্থা সৌদামিনী সিংহের—'নারীচরিত' (১৮৬৫)। রাখালমণি গুপ্তের—'কবিতামালা' (১৮৬৫)। কামিনীসুন্দরী দেবীর—'উর্ব্বশী' নাটক (১৮৬৬)। বসন্তকুমারী দাসীর —'কবিতা মঞ্জরী' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয় ।এরপর বহু লেখিকার গদ্যে পদ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মহিলাগণ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনেও ব্রতী হন । সমাজের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের সম-অধিকারের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছিলেন । পুঃনরুক্তি দোষ ঘটলেও আবার বলছি, বঙ্গমহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র 'বঙ্গমহিলা' । ১৮৭০-এ প্রকাশিত হয়েছিল । শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হবার ফলে মহিলাগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কর্মদক্ষতার পরিচয় দান করছিলেন। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও নারী তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। তৎকালীন সময়ে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে যিনি চিন্তাভাবনা ও কর্মজীবনে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী । তাঁর প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ । উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ঠাকুর বাড়ীর কোমল পরিবেশে তাঁর প্রতিভাকে তিনি সাহিত্যের বিভিন্নক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম উপন্যাস রচনা করেছেন । 'ভারতী' পত্রিকা তাঁর হাতেই পল্লবিত হয়ে বঙ্গনারীর সাহিত্য প্রতিভার যশঃগৌরব বৃদ্ধি করেছিল । পুরুষ সমাজে তৎকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তার তুলনা চলে । তাঁর সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় তখন বহু বাঙ্গালী মেয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ।

শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নারী সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষের সম দক্ষতার পরিচয় দানে সক্ষম হয়ে উঠেন । নারীকে অবলা বলা হলেও সে যে অবলা নয়, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সে সবলা হয়ে উঠেন তার প্রমাণ নারী অনেক ক্ষেত্রেই রেখেছেন । পঞ্চতন্ত্রে আছে — 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্' — শারীরিক বলই শ্রেষ্ঠ বল নয় । হাতির চেয়ে ত মানুষের শারীরিক বল বেশী নয়, অথচ হাতী মানুষের দাসত্ব করে । দৈহিক বল দ্বিতীয় স্থানীয়, মানসিক বা আত্মিক বলই শ্রেষ্ঠ বল। দৈহিক শক্তি প্রয়োজনীয়, তা তুচ্ছ নয়। তবে আত্মিক শক্তির মধ্যে যে শক্তি মানুষের আধ্যাত্মিকতায় অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক চিন্তা, সাধনা ও আচরণে প্রকাশ পায়, তাই শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। যদি আধ্যাত্মিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে নারীর দৈহিক বল পুরুষের দৈহিক বল অপেক্ষা কম বলে মনে করলেও নারীকে অবলা বলা ঠিক নয়। যুদ্ধে ও রাজনীতিজ্ঞতায় নারী অনেক সময়

পুরুষকেও পরাস্ত করেছেন । আমাদের এই ভারতেই অনেক রণ-রঙ্গিণীর নাম সর্বজনবিদিত। ভারতের রাজশক্তিধারিণীদের মধ্যে রাণী অহল্যাবাঈ তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন । বর্তমান যুগের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাওয়ায় ভারতে ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলঙ্কায় সিরিমাভো বন্দরনায়েক, ইসরায়েলে গোল্ডা মায়ার প্রধানমন্ত্রী হয়ে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন । এছাড়া বাঙ্গালী মেয়েরা এখন ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়া, প্যারাসুট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া, দক্ষিণমেরু অভিযান করার মত দুঃসাহসিক কাজেও অংশ নিয়ে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন । তবে জনসংখ্যার অনুপাতে এদের সংখ্যা খুবই কম। মহিলা জনসংখ্যার অনুপাতে বাইরে একটা বিরাট অংশ এখনও নিরক্ষর । নারী-আন্দোলন সফল করতে হলে এই পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারী সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে । তা না হলে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সর্বশ্রেণীর নারীর মধ্যে একটা ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপিত হবার সম্ভাবনা কম। নারীমুক্তি আন্দোলন সফল করতে হলে এই পিছিয়ে পড়া নারীদের কথা ভাবতে হবে ।

হিন্দুর আদ্যাশক্তির নাম স্ত্রী-লিঙ্গবাচক । তাঁর রূপ নারীর মতই কল্পনা করা হয়েছে । হিন্দুর জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারী, ঐশ্বর্য্যের দেবী নারী, অসুর বিনাশকারিণী যিনি তিনিও নারী। সর্বপ্রকার দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যার আরাধনা করা হয় তিনিও নারী। মানুষের প্রার্থনীয় যা কিছু সবই দান করেন কোন না কোন দেবী, সুতরাং নারী। অথচ সেই নারীর হিন্দু নাম অবলা। কেন এমন হল তা বলা শক্ত।

নারী যে অবলা নন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তিনিও সবলা হয়ে সর্বকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তা বিংশ শতাব্দীতে সংখ্যায় কম হলেও নারী তা দেখাতে শুরু করেছেন । নারীরাই সংসার সৃষ্টি করে তুলেছে । সহজ হৃদয়বুদ্ধি ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে সংসারকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলেছে । প্রত্যেক সংসারই নারীর সৃষ্টি । স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি যে সকল নৈতিক গুণ মানবের মধ্যে থাকা উচিত সেগুলি নারীর মধ্যে সহজে বিকাশলাভ করে । নারী তার সৃজনশক্তি দিয়ে গৃহকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে । নারী ছাড়া গৃহ লক্ষ্মীছাড়া। অথচ যে নারী গৃহকে রমনীয় সুন্দর করে তোলে সেই নারীশক্তিই এতদিন সমাজে ছিল অবহেলিত । যে নারী তার প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে সংসার সাজিয়েছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে সংসার গড়ে তুলেছে, সেই নারীশক্তি যখন অবজ্ঞায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, তখনই দেশের অধঃপতন অনিবার্যভাবে এসে পড়েছিল । সেই

জন্য দীর্ঘকাল ধরে পরপদানত হয়ে অপরের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল ভারতবাসী তথা বাঙ্গালীজাতিকে । যখনই নারী তার আপন মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হল দেশের দাসত্ব মোচনের জয়ধ্বজা তখনই বেজে উঠল । নারীর শিক্ষা ও নারীর লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে চাই নারীকে যথাযোগ্য মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা । বিংশ শতকের শুরুতে গোটা পৃথিবী জুড়েই সেই রণদামামা বেজে উঠেছিল। ভারতবর্ষও বাদ পড়েনি । বঙ্গদেশও তার হারানো রত্নকে খুজে বার করে বিশ্বের দরবারে হাজির করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল । নারীশক্তি আজ তার বিজয়পতাকা নিয়ে তার অধিকারকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

বিংশ শতকের শুরুতে পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে রোকেয়া বেগম ধারালো ভাষায় এবং তীব্র ব্যঙ্গে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তা ঐসময় অন্য কোন নারীর মুখে উচ্চারিত হয়নি । ভারতনারী তথা বঙ্গনারীর শিক্ষাবিহীন পরধীনতা ও সমাজের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছিলেন । তৎকালীন সামাজিক নিয়মে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যে নারী স্বামী এবং সংসারের সেবায় আত্মত্যাগ করেন, সমাজের চোখে সেই নারীই আদর্শ । কিন্তু রোকেয়ার চোখে নারীমুক্তির অর্থ পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করা । তিনি বলেন — জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলবার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প থাকা চাই । আমরা পুরুষের গোলাম নই । পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যা করা দরকার তাই করব । এত বড় উক্তি ঐ সময় অন্য কোন নারীর মুখে ধ্বনিত হয়নি । আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কবি কামিনী রায়, কৃষ্ণভাবিনী দাসী অথবা সরলা দেবী প্রভৃতি নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের কথা বলেছেন । নারী লেখাপড়া শিখে আরো সুন্দরভাবে যাতে সংসারধর্ম পালন করতে পারেন তার উপর জোর দিয়েছিলেন । কিন্তু রোকেয়ার মত পুরুষের সমকক্ষতা লাভের কথা বলেননি । রোকেয়ার বক্তব্য — সংসারে নারী পুরুষের বোঝা না হয়ে পুরুষের সহচরী, সহকর্মী ও সহধর্মিণী হতে পারেন । তাঁর মতে নারী পুরুষের *Partner, better half* হতে পারেন কিন্তু স্ত্রী নন, জীবনসঙ্গী । তাঁর মতে পুরুষের কাছে দয়া ভিক্ষা করে নয়, ক্রন্দন করে নয়, অধিকার জোর করে আদায় করতে হবে। সমকালীন কবি মানকুমারী বসু নারীর করুণ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিলেন — "কাঁদ তোরা অভাগিনী । আমিও কাঁদিব, আর কিছু নাহি পারি কফোঁটা নয়নবারি ভগিনী ! তোদের তরে বিজনে ঢালিব।" রোকেয়ার বক্তব্য — এরূপ কাঁদবার সুরে সুর মেলাতে পারব না । রোকেয়া দাবী করেছিলেন —

আমরা পশুও নহি, আসবাবও নহি, লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ রাখার মত জড়াউ অলঙ্কারও নহি, আমরা মানুষ । সুতরাং মানুষের অধিকার চাই, যা-পুরুষ ভোগ করছে আমরাও তার সমভাগী ।

শিক্ষার ফলে নারী মুক্তিলাভ করবে এই ভয়েতেই হয়ত পুরুষ সমাজ তখনকার দিনে নারী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন । শিক্ষা পেলে নারী হয়ত আর পুরুষের বশ্যতা স্বীকার নাও করতে পারে । এই ভয় পুরুষ জাতিকে ভীত করেছিল হয়ত। তৎকালীন সমাজের অনেক কথাই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর নির্ভর করে বলা হল অতি সংক্ষেপে ।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহিলাগণ কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রে, এক কথায় শিক্ষার বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে আজ বিংশ শতকের শেষ পাদে এসে পৌঁছেছে । বর্তমান সময়ে দেশে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে । নারীর আত্মোপলব্ধি জাগরিত হয়েছে। সঙ্গীত, নৃত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিচারালয়, অধ্যাপনা, চিকিৎসাবিদ্যা, ক্রিয়াজগৎ সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশে নারী ব্যস্ত । দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ সকলেই নিজের নিজের জীবন সম্পর্কে আলাদাভাবে ভাবতে শুরু করেছেন । মহিলাগণ তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষিতা মহিলাগণ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা লাভের জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন । সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা ভোগের জন্যও বটে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক ।

বিংশ শতকের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মহিলাগণের মধ্যে চাকুরীর মাধ্যমে স্বনির্ভরতা লাভ করা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল । রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের শেষদিকে মনে করতেন মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা একান্ত প্রয়োজন । একটি চিঠিতে রাণী চন্দকে তিনি লিখেছিলেন — "সমস্যাটা হচ্ছে অর্থনৈতিক । তোমাদের উপার্জন করতে দেওয়া হয়নি । পুরুষেরা নিয়েছে সেই ভার । তারা উপার্জন করে আনবে । তোমরা থাকবে পরম নিশ্চিন্তে । ঘরকরনা করবে, গোবর ছিটোবে, ইতুপূজো করবে, মূঢ়তার চূড়ান্ত করে সংসারে তলিয়ে যাবে ।"[৮]

রবীন্দ্রনাথের অভিমত ছিল — বিশ্বস্ত সেবাদাসী, ভালো রাধুনি, শর্য্যা-

সঙ্গিনী বা পতিব্রতা সতী হয়ে জীবন অতিবাহিত করাই নারী জীবনের চরম সার্থকতা নয়। নারী এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি আর তার সত্তাও পৃথক। নারীসত্তা পুরুষের দ্বারা বহুভাবে বহুদিন লাঞ্ছিত হয়েছে ।এর প্রধান কারণ, পুরুষের কাছে নারীর সর্বপ্রকার নতিস্বীকার। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ নারীকে প্রতিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহিলাগণ পুরোপুরি না হলেও পুরুষের সম-অধিকার লাভে সমর্থ হয়েছেন। শিক্ষালাভের বাধা দূর হয়েছে ।আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যও মেয়েরা তৎপর হয়েছেন। প্রত্যেক নারীরই আর্থিক স্বাবলম্বন লাভ করবার মত শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে বিনা প্রয়োজনে সংসার ও স্বামীপুত্র সব অবহেলা করে অর্থোপার্জ্জনের জন্য দৌড়াদৌড়ি কাম্য নয় ।অর্থলোভ যেন আমাদের আদর্শচ্যুত না করে। বাঙ্গালী নারী গৃহলক্ষ্মী হয়ে পাক্শালায় আবদ্ধ থাকুক এ কাম্য নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে অর্থোপার্জ্জনের লালসায় সন্তানগণের অবহেলা করা উচিত নয়। সন্তানের বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে মাতার সাহচর্য সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন।

অর্থোপার্জ্জনের নেশা যেন সন্তানের জননীকে কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত না করে। টাকার একটা মোহ আছে, ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা যেন লোভের আকার ধারণ করে আমাদের মায়েদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের বিপথগামী না করে ।অর্থলালসায় অনেক পুরুষ বিপথগামী হয়েছেন ।আমাদের মহিলাদের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে, অপ্রয়োজনে লোভের বশবর্তী হয়ে আমরা যেন আমাদের কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত না হই ।নারী শিক্ষালাভ করুক ইহা একান্ত প্রয়োজন ।জননীর শিক্ষার উপরই শিশুসন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ।আদর্শ মাতাই পারেন আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের, বাঙ্গালী বলি কেন, সকলদেশের মেয়েদেরই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য সংসার রক্ষা ও সন্তান পালন। রমণীই সংসার গড়ে এবং তাকে রক্ষা করে আনন্দের নীড়ে পরিণত করে। আবার সেইরূপ অশিক্ষিত রমণিগণ সংসার ভেঙ্গে স্বর্গনীড়কেও নরকের দ্বারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে ।

পাশ্চাত্যদেশের মায়েরা অর্থোপার্জ্জনের লালসায় সন্তানকে পর্যন্ত অবহেলা করে। দাসী বা চাকর বাকরের হাতে সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মায়েরা অর্থপার্জ্জনে ব্যস্ত । কিন্তু আমাদের বঙ্গরমণীর এ আদর্শ মোটেই সুখকর হবে না। মা-বাবা দুজন মিলে অর্থোপার্জ্জন করলে তারা তা দ্বারা চাকর বা দাসদাসী রেখে সন্তানের দেখাশুনার ব্যবস্থা করতে পারেন, অধিক আরামে রাখতে পারেন ঠিকই, কিন্তু দাসদাসীর সান্নিধ্য

অপেক্ষা মায়ের সান্নিধ্য সন্তানের অধিক আনন্দ ও চরিত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়। সন্তানকে একটু অভাবের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণু করে মানুষ করলেও মাতৃসঙ্গ সন্তানের কাছে অধিক আনন্দের । স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বাড়ী গাড়ী করে বহু অর্থ সঞ্চিত করে রাখলেও সন্তান যদি উপযুক্ত স্নেহ ভালবাসার অভাবে বড় হয়ে কুপথ গামী হয়, তবে ঐ অর্থ কিছুকালের মধ্যেই নিঃশেষ হতে সময় লাগেনা । স্নেহের বাছাধন আজীবন কষ্ট পায়, সেটা কাম্য নয় । কষ্টের মধ্যেও যদি উপযুক্ত আদর্শ নাগরিক হয়ে আমাদের ভাবী বংশধরগণ উঠতে পারেন তবে নিজের যেমন সুখ সমৃদ্ধি আনন্দ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি দেশের ও জাতির মঙ্গলসাধন করতেও তারা সমর্থ হবে। আমাদের মায়েদের কোনটা কাম্য, এ বিচার আমাদের মায়েদেরই করতে হবে।

তবে যেখানে প্রয়োজন, একের উপার্জনে সংসারের সকল দায়দায়িত্ব পালন করা যায় না সেক্ষেত্রে স্ত্রীকেও স্বামীর সহায়তার জন্য উপার্জনে নামা উচিত। পিতাকে সাহায্যের জন্য কন্যারও অর্থ উপার্জন করা একান্ত জরুরী । শিক্ষা অবশ্যই নারীকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা প্রয়োজন হলে শিক্ষা না থাকলে অর্থোপার্জ্জনের পথে নামা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি সন্তানের সুশিক্ষার জন্যও মাতার সাহায্য মিলবে না। সকলের অগ্রে নারীপুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আধুনিক নারীর শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাধীনতা লাভের যে ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে এটা আনন্দের বিষয়। নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা অর্জন করে রাখতে হবে। কেননা প্রয়োজন হলে সময়মত সে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অর্থোপার্জ্জন করা যাতে সহজ হয়। অনেক বাবা-মাকেই বলতে শোনা যায় — যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে গাড়ী, বাড়ী সবই করেছি কিন্তু একটি সন্তানকেও আপন করতে পারিনি। মাতৃকর্তব্যের ত্রুটিই এর কারণ বলে মনে হয় ।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই । যেখানে স্বামীর উপার্জ্জনে সংসার ভালভাবে চলার পরও প্রচুর অর্থ সঞ্চিত থাকে, সেখানে অযথা সন্তানকে কষ্ট দিয়ে মায়ের অর্থোপার্জ্জন কি না করলেই নয় ? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনেপ্রাণে একাত্মবোধ থাকলে স্বামীর অর্থের উপর নির্ভর করাও স্ত্রীর পক্ষে অপমানকর বলে মনে হয় না। শিক্ষিত বুদ্ধিমান স্বামীও স্ত্রীর আর্থিক অধীনতার সুযোগ নিয়ে পত্নীর উপর জোর খাটাতে চান না । সেক্ষেত্রে সন্তানবতী রমণীগণ সন্তান পালনের অবসরে দেশের ও সমাজের বিভিন্ন কাজে সাধ্যমত সাহায্য করতে পারেন । সারাদিন গৃহবন্দী জীবনও

যাপন করতে হয় না। এইরূপ নিঃস্বার্থ কাজে প্রচুর আনন্দও আছে। তবে যে ক্ষেত্রে সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে মহিলাদের অবশ্যই অর্থোপার্জ্জনের রাস্তায় নামা উচিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সে অর্থ যেন নিজের আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে না আসে।

মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতার প্রতি মনে হয় সকলেই পক্ষপাতী। কিন্তু তা প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত বলে মনে করি। ক্ষমতা আছে বলেই বিনা প্রয়োজনে অর্থোপার্জ্জনের লালসায় ও বাইরে স্ফূর্তি করার মানসে স্বামীপুত্র ও প্রিয়জনকে কষ্ট দিয়ে, অবহেলা করে সারাদিন বাইরে পরিশ্রম করে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ঘরে ফেরা, তাতে না আছে নিজের আনন্দ ও স্ফূর্তি না আছে সংসারের শান্তি ও সমৃদ্ধি।

গৃহই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ স্থান। গৃহের সুখকর আবেষ্টনী শিশুকে যে আনন্দ দান করে তা থেকে তাকে বিনা প্রয়োজনে বঞ্চিত করা উচিত বলে মনে হয় না। ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে উপযুক্ত শিক্ষা ও মাতৃস্নেহ দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে মাতার মত যোগ্য আর কেউই নেই। অতএব মাতার শিক্ষা ও স্বাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন এবং প্রয়োজন বোধে উপযুক্তক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

তবে এক্ষেত্রে আমাদের সরকারের উচিত, যেন প্রয়োজনের সময় মহিলাদের কর্মসংস্থানের পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তা দেখা। মহিলাদের জন্য উপযুক্ত কর্মবিভাগ রাখা উচিত। তবে আমাদের দেশের ক্রম-বর্দ্ধমান বেকার সমস্যার যুগে এটা কতটা কার্যকরী করা সম্ভব সেটাও ভাববার বিষয়। মহিলাদের জন্য অর্দ্ধেক কর্মবিভাগ সবসময় খোলা রাখা উচিত। নারীপুরুষের সম-অধিকারের দৃষ্টিতে প্রয়োজনে যেন মহিলাদের অন্যের মুখ চেয়ে পরাধীনতার শিকার হতে না হয়।

তবে আধুনিকা মহিলাদের আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনতাবোধ এতই প্রবলভাবে জাগ্রত হয়েছে যে মহিলারা অর্থের প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিবেচনা করার কথা ভাবেন না। তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজে অর্থ উপার্জ্জন করে জীবিকা অর্জনের পক্ষপাতী। আজকের নারীর অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে যে মানসিকতা কাজ করছে তা হল দীর্ঘকাল ধরে নারীর উপর যে অবিচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা চলছিল তাদের জীবনে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এই ভীতিই তাদের অপ্রয়োজনেও অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে ধাবিত করেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে দীর্ঘ সংগ্রামের পরে নারী পুরুষের জগতটাকে গ্রাস করতে পেরেছে তা যাতে কোন অবস্থাতেই আর হাতছাড়া হয়ে না যায় এই ভীতি মহিলাদের মনোবলকে শক্তিশালী করতে

সাহায্য করছে। আজ নারী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল হবার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে শারীরিক অসংযম সব অবস্থাতেই অপরাধের। সমাজে আজকাল শারীরিক অসংযমের যে নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করি, তা বরদাস্ত করতে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। পুরুষের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতার যুগে মেয়েদের মধ্যে যে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল সতীত্ব। শারীরিক সতীত্ব রক্ষা করার উপরে তখন শৈশব থেকেই কড়া নজর রাখা হত মেয়েদের উপর। মেয়েদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ হল শারীরিক সতীত্ব রক্ষা করা। সেকালের মেয়েদের মত আধুনিক মেয়েদের যাতে লাঞ্ছনাময় করুণ জীবন কাটাতে না হয়, তার জন্য আধুনিক যুগের মেয়েদের মধ্যে সতীত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, এটা লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনেক উদার, আধুনিক ও পাশ্চাত্যপন্থী বলে মনে হয়।

লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে সংযম অভ্যাস করা যেমন বিশেষ জরুরি, তেমনি কথাবার্তা, চালচলনে শৃঙ্খলা ও শালীনতা রক্ষা করাও আবশ্যক। প্রাচীনকে অস্বীকার করা মানেই আধুনিকতা নয়, প্রাচীনের ধ্যানধারণা, রীতিনীতির ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে যেগুলি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল সেগুলি সংস্কারের মাধ্যমে সময়োপযোগী ধ্যানধারণা ও নূতন ভাবাদর্শ গড়ে তোলাই যথার্থ আধুনিকতার সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাঙ্গালী মেয়েরা অন্তঃপুরের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে বিশেষকরে বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হবার ফলে ছিন্নমূল পরিবারের মেয়েরাই প্রথম জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পুরুষের অধিকার ও কর্মজগতের ক্ষেত্রকে অধিকার করতে শুরু করেন। যদিও তার পূর্বেও বহু মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কর্মজগতে প্রবেশ করছিলেন।

বর্তমান যুগের মহিলাগণ সব রকম পেশায় ছাড়পত্র পান। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যঙ্ক-অফিসার, আইনজীবী, গ্রন্থাগারিক প্রভৃতি পেশা মেয়েরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। কতকগুলি কাজ যা মহিলাদের পক্ষে একটু কঠিন ছিল এখন সেগুলিও আধুনিক মহিলারা গ্রহণ করতে দ্বিধা করছেন না —যেমন মহিলা ডাক পিয়ন, মহিলা ট্রাফিক, মহিলা পুলিস, নার্স, হোটেলের কাজ, ক্লাব থিয়েটারে অভিনেত্রী, এমনকি

দোকান, বিভিন্ন ব্যবসা-বানিজ্যের কাজেও এখন সর্বত্রই পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে মহিলাগণ কর্ম প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়েছেন।

এভাবে ঘরে বাইরে কাজ করতে গিয়ে মেয়েরা এখন এমনই বেসামাল যে শিশুর দেখাশুনার জন্য উপযুক্ত আত্মীয় স্বজন না থাকলে মাইনে করা অপরিচিত লোক দিয়ে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব লোক বিশ্বাসী হয় না এবং শিশুর খাদ্য চুরি করে নিজেরা খেয়ে শিশুকে বঞ্চিত করছে। শিশুর শৈশব আজ মাতৃ সান্নিধ্যের অভাবে নিঃসঙ্গ ও নির্মম হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর পিছনে আর্থিক বাধ্যবাধকতা আছে।

একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাবার ফলেও শিশুর জীবনে মাতৃসান্নিধ্যের অভাব ছাড়াও ঠাকুরমা, দিদিমা, মামা, মাসি, পিসির আদর হতেও শিশু বঞ্চিত। আধুনিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ শুধু শিক্ষাপ্রাপ্ত বলছি কেন, শিক্ষাবিহীন মহিলাগণও বিবাহের পর স্বামীকে নিয়ে পরিবার পরিজনবর্গ থেকে ভিন্ন সংসার বাঁধেন। যেখানে বাড়ীতে জায়গায় সঙ্কুলান হয় না সেক্ষেত্রে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে বা নিজে বাড়ী করে চলে যান। বৃদ্ধ বাবা-মা ও ছোট ছোট ভাইবোন যার উপর নির্ভরশীল ছিল এতদিন, তাদের কেমন নির্বিকার চিত্তে অবহেলা করে নব পরিণীতাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন। আবার যেখানে বাড়ীতেই স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা থাকে সেক্ষেত্রে বাড়ীতেই আলাদা সংসার পাতেন। যেখানে বাবা-মায়ের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা থাকে না, তাদের কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতে হয়। বৃদ্ধ-পিতামাতার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা থাকলেও বৃদ্ধ বয়সে দেখাশুনারও প্রয়োজন হয়। আধুনিক মহিলাদের অধিকাংশই এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তাই বিভিন্ন ছুতানাতায় সংসারে অশান্তি বাধিয়ে নিজে কষ্ট পান এবং অপরকেও কষ্ট দেন।

অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ নৈতিক মূল্য-বোধ একেবারেই বিসর্জন দিয়ে আপন আপন সুখসুবিধা ও বিলাসিতা চরিতার্থ করার জন্য পরিবারের অন্যদের সঙ্গে নির্মম আচরণ করেন। অনেক সময় দেখা যায়, আধুনিকা রমণিগণ তাঁদের পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ হুল্লোড়ে মত্ত এবং প্রয়োজনে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব প্রকাশ করছেন, যত নির্মমতা তাঁদের শ্বশুরকুলের আত্মীয় বান্ধবদের প্রতি। 'শ্বশুর-শাশুড়ী' এই শব্দটির প্রতিই যেন তাদের এলার্জি। পূর্বে যেমন ছিল বধূ-নির্যাতন, এখন তেমনি হয়েছে শাশুড়ী নির্যাতন। শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে এবং স্বাধীনতা পেয়ে মহিলাগণ সকলের অগ্রে

পূর্ব পূর্ব জন্মের এই প্রতিশোধ স্পৃহাটি চরিতার্থ করতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না । তাই বর্তমান যুগের বধূমাতার শ্বশুর-শাশুড়ীদের প্রতি আমার বক্তব্য - যেমন কর্ম তেমন ফল, মশা মারলে গালে চড়.।

শিক্ষা যে এমন নির্মম ও ভয়ঙ্করী হতে পারে তা কি সমাজ সংস্কারকগণ কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন ! প্রাচীনা অশিক্ষিতা শ্বশ্রূমাতাগণের যে কাজ করতে তাদের দংশন করেনি, শিক্ষার আলোকে আলোকিত মহিলাগণ তার চেয়ে কম নির্মম বলে মনে হয় না । শিক্ষা মানুষকে এমন বিবেকহীন করে একথা ভাবতে কষ্ট লাগে। শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী, নম্র ও বিবেকবান করে, শিক্ষালাভের ফলে হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা নরমুন্ডঘাতক ব্যাঘ্রের চেয়েও কত নির্মম। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজে । তবে ব্যতিক্রম তো আছেই । ভালয় মন্দয় মিলিয়ে জগৎসংসার। ভাল একেবারেই না থাকলে জগৎ তো চলতে পারত না । তবে অধিকাংশ নারীই আজ ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে বিবেকহীন হয়ে পড়েছেন । নিজেদের উপার্জ্জনের পয়সায় যেন কেউ অংশীদার না হতে পারে এই অনেকের অভিপ্রায় । বর্তমানে উপার্জ্জনশীলা কোন রমণীর স্বামী যদি দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও স্ত্রীর মত অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম না হন তবে সেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর লাঞ্ছনা ও অত্যাচার কখনও কখনও সভ্য সমাজকে অতিক্রম করে বর্বরতার যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। খুব কম সংখ্যক লোকই এই ধরণের ঘটনার সাক্ষী। তবে তার সংখ্যাও নগণ্য নয়। মেয়েরা তাদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী যেমন লোকের কাছে বলতে লজ্জাবোধ করেন না। পুরুষ সমাজ কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্ত্রীর অত্যাচারের কাহিনী লজ্জায় লোকসমাজে বলতে সঙ্কুচিত হন । এমন অনেক নারী আছেন যারা যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেই তাদের সমরে ক্ষান্তি দেননি, স্বামীর উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন নিজের ভোগ লালসা চরিতার্থ করার জন্য। লালসা এমনই যে তাকে বিবেক দ্বারা টেনে না ধরলে সে তার লেলিহান জিহ্বা বার করে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। অনেক স্ত্রীলোক স্বাধীনতার নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই । এটাকে তারা আধুনিকতা বলে প্রমাণ করতে চান। যে সব শিক্ষিতা নারী তা পারছেন না, তাদের গেঁয়ো প্রভৃতি নানাবিধ সম্মানিক আখ্যায় ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না কিছু সংখক নব্য শিক্ষিতা আধুনিকা ।

স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্ব-অর্থাৎ সত্তার অধীনতা । বিশ্বব্যাপী নারী

স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙ্গালী মেয়েরা আজ যে স্বাধীনতা ভোগ করছেন তা কতখানি সার্থক ও ফলপ্রসূরূপ নিচ্ছে, একবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রাচীন নারী সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা বিশ্বের কল্যাণসাধন । বর্তমান আধুনিক বাঙ্গালী নারীর একাংশ শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন চর্যায় সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের অনুকরণে ব্যস্ত। সমাজের ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তের হাতে উপচেপড়া টাকাকড়ির আমদানী হবার ফলে এইসব পরিবারের মেয়েরা উৎকট বিলাসিতায় আধুনিকতার নামে ব্যালে ডিস্কো ইত্যাদি নাচের মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে জীবনকে আরো উপভোগ্য ও মোহময় করে তুলতে ব্যস্ত।

আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী মহিলা কৃষিক্ষেত্রে, মাঠে, কলকারখানায়, অফিসে সারাদিন পরিশ্রম করে জীবনে সার্থকতা আনার জন্য লড়ে চলেছেন । এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কেউ কারোর খোঁজ রাখেন না । বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের সূচক সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে অতি নিম্নে ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর শোচনীয় অধোগতির কথা বলা হলেও অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে আজও শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত অশিক্ষা, অপুষ্টি ও অসাস্থ্য পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী । প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী নারী এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, পুরুষ প্রথম শ্রেণীর ।

অধিকাংশ নারীর বিবাহোত্তর জীবন এখনও অনিশ্চিত । বধূহত্যা ও বধূনির্যাতন দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না । ওসেনটেসিস নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চবিত্ত পরিবারে এখনও স্ত্রী-ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয় । স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাটে ও হাট বাজারে এখনও নারীর নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা নেই । সংবাদপত্রের পাতায় এখন প্রায় প্রতিদিনই নারীধর্ষণ ও নারীর শ্লিলতাহানির খবর পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর অশিক্ষিত পুরুষের পাশবিক প্রবৃত্তি এই ঘটনার জন্য দায়ী। এরজন্য যথাসময়ে অপরাধীর শাস্তি হয় না। কোন আইন নেই এর হাত থেকে রক্ষা পাবার । ক্রমাগত অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবার জন্য মধ্যযুগীয় বর্বরতা দিন দিন বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। কোন কোন নারীকে ডাইনি খেতাব দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে । এর প্রতিকার কিভাবে করা যায় নারী প্রগতি আন্দোলনের নেত্রীদের তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পুরুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং সম-অধিকারের দাবীতে উঁচুতলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করে নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও

স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে অনেক দাবী আদায় করলেও সমাজে এখনও মহিলারা উপেক্ষিতই আছেন। কিছু সংখ্যক নারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও অধিকাংশই যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।

এখনও সমাজে পণপ্রথা, শ্বশুর বাড়ীতে বধূর লাঞ্ছনা ও নির্যাতিন সমানে চলছে। শাশুড়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেই বধূই আবার নিজের পুত্রবধূকে নির্যাতিন করছেন এও দেখা যায়। শিক্ষার ফলে যদি মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতই না হল তবে সেই শিক্ষা তো মূল্যহীন! পুথিগত শিক্ষার কোন মূল্যই থাকেনা।

উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের আধুনিক নারীসমাজের একাংশ উৎকট প্রসাধন ও পোষাক-আশাকে সজ্জিত হয়ে কর্মহীন অলস বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাতে একদিকে তাদের উন্নতিসাধন অপেক্ষা নিজেদের ক্ষতিসাধন করছেন অধিক পরিমাণে। তাছাড়া এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে অলসতা ও কর্মবিমুখতা দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রাচীন হলেই তা বর্জনীয় এরকম ধারণার বশবর্তী না হয়ে আধুনিক শিক্ষিত মহিলাগণ যদি স্বামী স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলেন তবে সমাজের যেমন মঙ্গল তেমনি নিজেদেরও মঙ্গল। নিজেদের ব্যক্তিগত ত্রুটি সম্পর্কে মহিলারা নিজেরা যদি অবহিত না হন তবে অদূর ভবিষ্যতে তারা দেশের ও সমাজের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলের সূচনা করবেন। এ বিষয়ে মহিলাদের সচেতন হওয়া এখনই দরকার বলে মনে হয়।

সমাজের মূল স্রোত থেকে যে সব মহিলারা অভাবের জন্যই হোক বা স্বভাব বশতঃই হোক বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের নিষিদ্ধ এলাকায় পতিতালয়ে বাস করছেন, তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। সমাজের ভাবী নাগরিক কিশোর-কিশোরী ও শিশুর নৈতিক চরিত্র যাতে কু-পথে পরিচালিত না হয় তার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদি এবং খোলামেলা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের খারাপ দিকগুলির হাত থেকে ভাবী নাগরিকদের বাঁচানোর চেষ্টা করা সর্বাগ্রে দরকার। আধুনিকা মায়েরা এখনই যদি সতর্ক না হন তবে অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক পরিবেশ কেমন হবে কে বলতে পারে।

শুধু মুষ্টিমেয় নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন হলেই নারী প্রগতি ও নারীমুক্তি হল এধারণা একান্তই অলীক। দেশের বিরাট সংখক নারী এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে সংসারে বেঁচে আছে। তাদে‍ে কথা ভাববার

কেউ নেই । তাই নারী প্রগতি আন্দোলনের নেত্রীদের এই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক ।

শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে নারী প্রগতি সম্ভব নয় । পুরুষজাতি নারীজাতির শত্রু নয় । বাবা, কাকা, মামা, দাদা ও পুত্র সন্তান এরা আমাদের প্রিয় ও আদরের ধন। সংসারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও মধুর । নারীজাতির কল্যাণের জন্য পুরুষের আত্মত্যাগ ও ভালবাসার কথা শিক্ষিত নারীদের স্মরণ রাখা উচিত। আর একথা চিরন্তন সত্য যে নারী চিরদিনই পুরুষের সাহচর্য ও ভালবাসার কাঙ্গাল।

ভারত তথা বঙ্গদেশের রমণীগণ জাগ্রত হোন, উচ্চ হতে নীচ সব নারীই শিক্ষা লাভে সমর্থ হোন, নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠুন, সমাজ, সংসার ও পুত্র-কন্যাদের মধ্যে নৈতিক জ্ঞান দান করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বংশধরদের আদর্শ সু-নাগরিক করে গড়ে তুলুন। বিধাতা পুরুষ একাজে নারীর সহায় হোন মঙ্গলময়ের কাছে নারী হয়ে এই প্রার্থনা।

আনন্দ হতে বিশ্বের উৎপত্তি । বিশ্বকে সুন্দর করে বিধাতা তাঁর আনন্দরূপ প্রকাশ করেছেন । আমরাও সৌন্দর্য দেখব, সম্ভোগ করব, সৌন্দর্যের সৃষ্টি করব, আনন্দ পাব, আনন্দ বিতরণ করব। আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে জরাজীর্ণের মত, নিষ্প্রভ-নির্জ্জীবের মত কেন থাকব? পরিবার, সমাজ ও দেশকে কেন নিরানন্দ শ্মশানে পরিণত করব ? সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পবিত্রতার বিরোধ কই , আনন্দ পূণ্যের শত্রু নয়, সহচর—নারী তাঁর ত্যাগের মহিমা দ্বারা এই আনন্দকে জগৎসংসারে ধরে রেখছেন বলে বিধাতার সৃষ্ট সংসার আজও মহিমময়। দেবী স্বরূপা নারীর অবহেলা করার অর্থ বিধাতার অভিশাপ বহন করে আনা ।

নারী থেকেই এ বিশ্বসংসার সৃষ্টি হয়েছে । বিধাতার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নারী। নারীর মহিমা অপার। এই নারী সাধারণ কোন মানবী নন । জগজ্জননী আদ্যাশক্তির অংশোদ্ভুত্র। তাঁকে অবহেলায়, লাঞ্ছনায় রাখা মানে আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মীর অবমাননা করা। জয় মা, তুমি জাগ্রত হও । বিশ্ব সৃষ্টিকে রসাতলে যাবার হাত থেকে রক্ষা করো । তোমার অংশসম্ভূতা নারীর মধ্যে বিবেক জাগ্রত করে সৃষ্টিকে রক্ষা করো — এই প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করছি—

সে কি মনে পড়ে?
একদিন আদিযুগে তপোবন শিরে
প্রথম জেগেছে আলো ; রবিরশ্মি পাতে

রাঙ্গিয়া উঠেছে ধরা ; সেই শুভ প্রাতে
শুনাল নারীর কণ্ঠ বিশ্বের মানবে
জীবনের সত্যবাণী ; শিখাইল সবে
ভোগ হতে ত্যাগ বড়, ধন হতে জ্ঞান
মানবের লক্ষ্য হবে অমৃত সন্ধান ।

তাঁহাদের স্মৃতিপ্রাণে দেয় নাকি সাড়া,
একদিন আপনারে দগ্ধ করি-যারা,
রেখেছিল স্বদেশের মান, মাল্যের মতন
বরিয়া লইল যারা কঠিন মরণ,
তবু নিমেষের তরে সতীত্ব গরব
ক্ষুন্ন করি, মানিল না হীন পরাভব ।

আহতের শয্যাপার্শ্বে করুণ নয়না
কারা ঐ জাগে ? শোকাশ্রু বেদনা
উচ্ছ্বসি উঠিছে কার দুনয়ন পরে
জগতের যত দীন হতভাগ্য তরে ?
তিলে তিলে বিসর্জ্জিয়া আপনার প্রাণ
রোগক্লান্তে কে করেছে সান্ত্বনা বিধান
ভুলেছো তাদের ?

সেই স্বর্গ হতে নারী
কোথায় নেমেছো আজ ? স্বার্থ লয়ে কাড়াকাড়ি
তোমারে পায় না শোভা ; বাহিরের সাজ
অন্তর মহিমা তব ঢাকিল যে আজ,
তার লজ্জা লুকাবে কোথায় ? সত্যের আহ্বান
পারে না স্পর্শিতে আজ তোমার পরাণ
প্রতিদিন ফেরো শুধু অতি তুচ্ছ কাজে ;
হৃদয়ের দৈন্য ঢাকি মিথ্যা ছদ্ম সাজে,

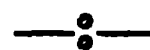
আপনার সত্য সাজ করি অবহেলা
সুন্দরে তাড়াতে দূরে কাটে তোর বেলা ।

আশা কয় কানে কানে কেটে যাবে মেঘ,
আপনারে প্রকাশের যে রুদ্ধ আবেগ
বহিছে সঙ্কীর্ণ পথে, একদিন তার
শান্ত হবে গতি — যেদিন আবার,
পূর্ণরূপে, সত্যরূপে হেরিব নারীরে,
দাঁড়াইয়া জগতের হৃৎপদ্ম পরে
চারিদিকে বিকশিয়া সুরভি তাহার
নারীত্বের শতদল ফুটিবে আবার ।

যেসব নারী তাঁদের শিক্ষার মহিমায়, সতীত্বের মহিমায়, ত্যাগের মহিমায়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গল কামনায় নিজেকে উৎসর্গ করে' আলোর দীপিকা জ্বালিয়েছিলেন তাদের অনুসরণ করা প্রয়োজন বলেই তা বর্তমানে একান্ত কাম্য।

তথ্যসূত্র :

১) 'সঞ্চয়িতা', 'সবলা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৬৩১।
২) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ: ৭৬৫।
৩) 'রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, ১৭৯৫ শক, পৃ: ২০৫-২০৬।
৪) 'জয়শ্রী', ১ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ: ৭৬৭।৫) বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য় খণ্ড) সমাজ, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতিয় সমিতি (২০ শে আগষ্ট ১৯৭২), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (আগষ্ট ১৮৭১) পৃ: ২০১ - ২০২ ।
৬) 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' (প্রথম খণ্ড) — সুধীর কুমার মিত্র, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মিত্রাণী সংস্করণ, মার্চ, ১৯৬২, পৃ: ২৪০ ।
৭) Bethune college and school centenary Volume 1849 - 1949 'সাহিত্যে বঙ্গমহিলা' প্রবন্ধ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৯৬ ।
৮) 'বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষা', হেমশ্রী জানা, ১ম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪০০, পৃ: ১৭।



গ্রন্থসূচীঃ

অন্দরে অন্তরে — সুবুদ্ধ চক্রবর্তী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৮, সেপ্টেম্বর।

অন্তঃপুরের আত্মকথা — চিত্রা দেব, ১ম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বইমেলা, ১৯৮৪।

আধ্যাত্মিকা — প্যারীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১২৮৬।

আমার জীবন — রাসসুন্দরী দেবী, নূতন সংস্করণ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩।

আমার বাল্যকথা — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনন্য প্রকাশন, কলিকাতা - ৭৩।

আমার জীবন, সাহিত্য সাধনার স্মৃতি — নিরূপমা দেবী।

আত্মচরিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী।

আমার সংসার — শরৎকুমারী দেব, এক্ষণ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৮।

আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ — বিপান চন্দ, পাল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮৭।

আমার বিবাহ — হেমেন্দ্র কুমার ঠাকুর।

ইতিহাসচর্চা — ড. নীহাররঞ্জন রায়, বার্ণিক রায় সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, মাঘ, ১৩৯৩, 'উনিশশতকী বাঙ্গালীর পুনরজ্জীবন প্রবন্ধ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য — শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল — (যোগেশচন্দ্র বাগল স্মারক গ্রন্থ), সম্পাদনা - মোগনলাল মিত্র ও কানাইলাল দত্ত, পরিবেশক আলফা পাবলিশিং কন্‌সার্ণ, কলিকাতা-৯, শ্রীকান্ত প্রেস।

ঋগ্বেদ সংহিতা — ১ম ও২য় খন্ড, হরফ প্রকাশনী।

এক্ষণ — সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ৩৪শ বর্ষ, ২০ খন্ড, শারদীয়া- ১৪০১।

কাদম্বিনী বসু — সুব্রত রুদ্র।

কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রী-বৃদ্ধি হইতে পারে? — বামাসুন্দরী দেবী, ১৮৬১।

কেশব সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) জীবনী — দীপ্তিময় সেন।

কেশবচন্দ্র সেন ও সেকালের সমাজ — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

চিত্তবিলাসিনী (কাব্য) — কৃষ্ণকামিনী দাসী, কলিকাতা, ১৮৫৬।

চিঠিপত্র — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছিন্নপত্রাবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছেলেবেলা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনস্মৃতি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনের ঝরাপাতা — সরলাদেবী চৌধুরাণী।

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী — এক্ষণ পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৮।

ঠাকুর বাড়ীর অন্দর মহল — চিত্রা দেব, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর বাড়ীর কথা — শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৬।
ঠাকুর পরিবার ও বাংলার নারী জাগরণ — চিত্রা দেব।
নারী প্রগতির একশ বছর — গোলাম মুরশেদ।
নারীর উক্তি — ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য — ড. জ্ঞানেশ মিত্র, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল-১৯৮৭।
পশ্চিমবঙ্গ — রামমোহন সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৩।
পিতৃস্মৃতি — সৌদামিনী দেবী।
পুরাতনী — ইন্দিরাদেবী সঙ্কলিত।
প্রাচীন ভারতে নারী — ক্ষিতিমোহন সেন, কলিকাতা, ১৩৫৭।
প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য — সুকুমারী ভট্টাচার্য্য, ১৩৯৬।
বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২য় সংস্করণ।
বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ — ড. বসন্তকুমার সামন্ত, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৪।
বণপ্রসূন — মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গসাহিত্যে নারী — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিঃ ১৩৫৭।
বঙ্কিম পরিচয় — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮।
বামাতোষিণী — প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮৮১।
বাংলার সাময়িক সাহিত্য-১৮১৮-১৮৬৭ — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, চৈত্র, ১৩৫৯।
বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষা — হেমশ্রী জানা, ১ম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪০০।
বাঙ্গালী নারী—সাহিত্যে ও সমাজে — আনিসুজ্জামান।
বাঙালীর মনন : নানা নিবন্ধ (১ম সংস্করণ, ১৯৯৯), কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।
বাংলার নবজাগৃতি — বিনয় ঘোষ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০২।
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাঙ্গালার স্ত্রী শিক্ষা — শেফালিকা শেঠ।
বাংলা সংবাদপত্র — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার স্ত্রীশিক্ষা — যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিঃ-১৩৫৭।
বাংলা সাময়িক পত্র, ২য় খন্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার নারীজাগরণ - সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৩৫২) — প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
বাসন্তী দেবী — হেনা চৌধুরী।
বাংলা সংবাদপত্র — পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী — গীতা চট্টোপাধ্যায়।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন, ২য় খন্ড।
বাবার কথা — উমা দেবী।
বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খন্ড), সমাজ, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি (২০শে আগস্ট, ১৯৭২)।

বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য — শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, করুণা প্রকাশনী।
বিদ্যা দারিদ্র্যদলনী কাব্য — হরকুমারী দেবী, কলিকাতা - ১৭৮৩।
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ — বিনয় ঘোষ, ৩য় খন্ড একত্রে, পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৩।
বিংশ শতকের তিরিশ বছরের বাংলা সাহিত্য — দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়।
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ — শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
বিদ্যাসাগর জীবন চরিত — শম্ভু চন্দ্র।
বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার — দ্বিতীয় পুস্তক।
বৈধব্য কাহিনী — কল্যাণী দত্ত, এক্ষণ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৮।
ব্রাহ্মধর্মের বিশেষত্ব — আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা —তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ২য় সং, কলিঃ-১৮৫১।
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি — এ. আর. দেশাই।
ভারতবর্ষের ইতিহাস — ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীসম্বুদ্ধ চক্রবর্তী।
ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত — আব্দুল করিম।
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ — শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন।
মহিলা সমাজ : সেকালের প্রগতি চেতনা — বিনয়ভূষণ রায়।
রবীন্দ্র রচনাবলী — জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১০ম খন্ড, ১৩৬৮, বৈশাখ।
রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (১ম সংস্করণ-১৯৮০) — কল্যাণী শঙ্কর ঘটক।
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রামমোহন রায়, নবযুগ নেতা — সোমেন্দ্রনাথ বসু।
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিঃ - ১৯৮৩।
সঞ্চয়িতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সমাজ ও সাহিত্য — সুশোভন সরকার।
সাহিত্য সাধক চরিতমালা — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম -৮ম খন্ড পর্যন্ত।
সাহিত্যের বিশ্লেষণ : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ (১ম সংস্করণ-২০০০)— কল্যাণী শঙ্কর ঘটক।
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র — বিনয় ঘোষ, ১ম - ৭ম খন্ড পর্যন্ত।
সাহিত্যে নারী-স্রষ্টা ও সৃষ্টি — শ্রীমতি অনুরূপা দেবী প্রণীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।
সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিঃ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।
সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত — মুস্তাফা নূরউল ইসলাম।
সাহিত্য পত্রিকা — সম্পাদক মহম্মদ অবদুল হাই।
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজজীবন — বিনয় সরকার, ৫ম খন্ড।
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা — ১ম থেকে ৮ম খন্ড।
সুলভ সমাচার ও কেশব সেনের রাষ্ট্রনীতি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
স্মৃতির পাতা — সৈয়দ মনোরমা খাতুন, আনিসুজ্জামান।
সেকালের নারীশিক্ষা—(বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ) — সম্পাদনা ভারতী রায়,

১৯৯৪, কলিঃ বিশ্ববদ্যালয়।
সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান — সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত, ১ম ও ২য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম ও ২য় খন্ড।
হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ — সুধীর কুমার মিত্র, ১ম খন্ড, পরিবর্তিত দ্বিতীয় মিত্রণী সংস্করণ, মার্চ ১৩৬২।
ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত — কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, কলিঃ ১৯৩২।
স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ও বিদ্যাশিক্ষার আধিক্য — রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
স্ত্রী স্বাধীনতা নামক পুস্তিকা — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরাজী বই ঃ

A Social History of Modern India - Kali Kinkar Dutta, 1975.
Awakening in Bengal in early Ninetenth Century, vol. I, Edited by Gautam Chattapadhyay, Calcutta progassive publuishing, 1965.
Bethune College Centenary volume 1879-1979, (Calcutta). "The christian Mis sionaries and Female Education in Bengal (first Half of the Nineteenth century) by Dr. K.P.Sen Gupta.
Bengal past and present. Diamond Jublee Number, vol-lxxxvi, July- December. 1962, "The confliet within The Bengal Renaissance" by Susobhan Chandra Sarkar.
Bethune College Centenary volume 1879-1979, "Literary Education of The Bengali Female in the past" by Sukumar Sen.
Bethune College and School Centenary volume 1849-1949. "সাহিত্যে বঙ্গমহিলা প্রবন্ধ" — ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
Centenary Reviewe in Asiatic Society of Bengal, 1784-1883, part, "History of The Society" by Rajendralal Mitra.
History of the Bruhmo Samaj vol-II.
Missionaries and Education in Bengal 1793-1837 by M.A. Liard (Oxford).
Part played by women of Eastern India in the fight for Freedom - Thesis by Shyamasri Som, 1986.
Studies in the Bengali Renaissance (Dec.1958) –Ed. by Atulchandra Gupta.
The complete works of Raja Rammohan Roy, vol-I, Snaskrit and Bengali- "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ"।
W.R.Papers, Records N.A.I.-- letter, Dated Fort St. George, the 31st July, 1837.
W.R.Papers, Records N.A.I.-- Letter, dated Allehabad, the 11th August 1837.
W.R.Papers, M.S.Records, National Archives of India. (পরে W.R.Papers N.A.I.বলে উল্লিখিত). Letter, dated Fort William the 24th July- 1837.

ঃ ইংরাজী পত্র-পত্রিকা ঃ

"The Musalman", Dec-14.1906 সংখ্যা.
Calcutta Journal, vol-3, May 18,1891.
Bengal Spectator, vol-I, No-I April 1842.
Bengal Spectator, vol-I, No-5, July-1842.
The Calcutta Review, vol- July to December 1846.

ঃ বাংলা পত্র-পত্রিকা ঃ

'সংবাদ প্রভাকর', ১০ই চৈত্র, ১২৫৮।
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক, চতুর্থভাগ, ১৪০ সংখ্যা।
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পৌষ, ১৭৭৮ শক, ১৬ সংখ্যা।
'হিতবাদী পত্রিকা', ২০ ভাদ্র, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১৭৭৯ শক।
'বিদ্যাদর্শন', ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৭৬৪ শক।
'সোমপ্রকাশ পত্রিকা', ৩০শে শ্রাবণ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
'বামাবোধিনী পত্রিকা', পৌষ, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
'বামাবোধিনী', ফাল্গুন, ১২৭৪।
'তত্ত্ববোধিনী', চৈত্র, ১৮০২ শক।
'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১৪শ বর্ষ পর্যন্ত।
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শক।
'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৫০।
'এডুকেশন গেজেট', ১২৮২।
'বান্ধব', ভাদ্র,১২৮২।
'এডুকেশন গেজেট',১২৮৪, ১৮ই ফাল্গুন।
'সুলভ সমাচার ও কুশদহ', ২৯শে জুলাই, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।
'এডুকেশন গেজেট', ২৯শে এপ্রিল, ১৮৮১।
'এডুকেশন গেজেট',২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।
'এডুকেশন গেজেট', ৩০শে নভেম্বর, ১৮৮৩।
'সংবাদ প্রভাকর', ৭ই মে ১৮৪৯।
সোমপ্রকাশ' ১৫ই ফাল্গুন, ১২৬৭ বঙ্গাব্দ।
'বামাবোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১২৭১।
'বামাবোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ, ১২৭২।
'বিদ্যাদর্শন', অগ্রহায়ণ, ১৭৬৪।
'তত্ত্ববোধিনী' ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৬৭ শক।
'তত্ত্ববোধিনী' ১লা পৌষ, ১৭৬৭ শক।

'বামাবোধিনী' ফাল্গুন, ১২৭১।
'সর্বশুভকরী পত্রিকা', আশ্বিন, ১৭৭২ শক।
'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩০।
'বঙ্গমহিলা', ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮২ থেকে ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত।
'অনাথিনী', ১ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১২৮২, ১ম সংখ্যা।
'হিন্দুললনা', - ১২৮৪ মাঘ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৩য় সংখ্যা।
'ভারতী', ১২৮৪, শ্রাবণ, ১ম খন্ড, ৮ম খন্ড, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ২৩শ, ৩১শ, ৩২শ, ৩৬শ থেকে ৪০শ, ৪৪শ খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত।
'পরিচারিকা', — ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা, ১১শ বর্ষ থেকে ১৫শ বর্ষ, ১২ সংখ্যা পর্যন্ত।
'খ্রীষ্টীয় মহিলা', —১২৮৭ মাঘ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'বঙ্গবাসিনী', —১৮৮৩, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'সোহাগিনী',— ১২৯১বৈশাখ,১ম বর্ষ,১ম সংখ্যা।
'বালক', —১২৯২ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১২ সংখ্যা।
'বিরহিণী',— ১২৯৫ কার্ত্তিক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'পুণ্য',— ১৩০৪ আশ্বিন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা।
'অন্তঃপুর',– ১৩০৪ মাঘ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ২য় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭, ১৮ সংখ্যা, ১৮৯৯, মে, জুন পর্যন্ত।
'মুকুল',— ১৩০২ আষাঢ়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ১ম,সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।
'ভারত মহিলা', –১৩১২ ভাদ্র, ১ম ভাগ,১ম সংখ্যা থেকে ৩য় ভাগ, ১৩১৪, ১২ সংখ্যা পর্যন্ত।
'জাহ্নবী' – ১৩১৪ বৈশাখ, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা থেকে ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।
'সুপ্রভাত', ১৩১৪ শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা,১৩১৭ আষাঢ় পর্যন্ত।
'গৃহলক্ষ্মী', — ১৩১৪আশ্বিন,১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'ভারতলক্ষ্মী', — ১৩১৭ চৈত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'মাহিষ্যমহিলা', ১৩১৮ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা.থেকে ১৩২০, ৩য় ভাগ, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড, ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।
'প্রেম ও জীবন', ১৩১৯ শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা', ১৩২০ শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।
'পরিচারিকা'(নব পর্য্যায়), ১৩২৩ অগ্রহায়ণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।
'অন্বেষা', ১৩২৮ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত।
'বাঙ্গলার কথা', – ১৩২৮ আশ্বিন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১৩২৯, ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।
'নব্যভারত', – ১৩৩২ ভাদ্র, আশ্বিন, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
'শ্রেয়সী', ১৩২৯ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৪র্থ সংখ্যা
'সেবা ও সাধনা', – জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত।

'মাতৃমন্দির', ১৩৩০ আষাঢ়. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।
'বঙ্গনারী', ১৩৩০ আশ্বিন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'শ্রমিক', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'ত্রিপুরাহিতৈষী', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'বঙ্গলক্ষ্মী', ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৩য় বর্ষ,১৩৩৪,১২শ সংখ্যা। ১৩৩৫ থেকে ১৩৪৬ ১০ম সংখ্যা। ১৩৪৬ আশ্বিন —— ১৩৪৭ ৫ম সংখ্যা।
'পাপিয়া', — ১৩৩৪ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ত্রৈমাসিক।
'অর্ঘ্য', — ১৩৩৪ ফাল্গুন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা,ত্রৈমাসিক।
'তরুণশক্তি',— ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
'আলোক', ১৩৩৬, কার্তিক.১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৬ বৈশাখ, ১ম খন্ড,১ম সংখ্যা।
'মুক্ত', ১৩৩৭ ফাল্গুন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'জয়শ্রী', ১৩৩৮ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১ম বর্ষ,১২শ সংখ্যা, ১৩৪০ বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩৪০ আশ্বিন সংখ্যা. ১৩৪১ বর্ষ থেকে ৪৮শ বর্ষ পর্যন্ত।
'অঙ্কুর', — ১৩৩৮ শ্রাবণ. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'মহিলাবান্ধব', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'এডুকেশন গেজেট', ১৩৪১বৈশাখ সংখ্যা।
'রূপশ্রী', – ১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা।
'অনুভব ও সাহিত্য',১৩৪৩ শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'গৃহলক্ষ্মী', ১৩৪৪ আশ্বিন.১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা।
'মন্দিরা', ১৩৪৫ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১৩৫২, ১২শ সংখ্যা, ১৩৫৪,১ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা।
'বিজয়িনী', ১৩৪৭ আশ্বিন.১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা।
'শিক্ষা', – ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ.১৩৪৭ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'আশ্রমী', ১৯৪১ জানুয়ারী. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'মেয়েদের কথা',১৩৪৮ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৪র্থ সংখ্যা।
'জাগরণ', ১৩৪৯ বৈশাখ. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত।
'প্রভাতী', ১৩৪৯ বৈশাখ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।১৩৬৮ বৈশাখ, দশম প্রকাশন শারদীয়া সংখ্যা।
'অর্চ্চনা', ১৩১০ ফাল্গুন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'মাতৃভূমি', ১৩৫২ মাঘ, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১৩৫৪, ৯ম সংখ্যা পর্যন্ত।
'পরিক্রমা', ১৩৫৩ বৈশাখ. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'মহিলা', ১৩৫৪ আষাঢ়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা।
'মহিলা মহল', ১৩৫৪ আষাঢ়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা।
'সংগঠন', ১৩৫৪ শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ট সংখ্যা।
'বেগম', ১৩৫৪ শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ও ৩য় সংখ্যা।
'শতাব্দী', ১৩৫৪ আশ্বিন.১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
'ললিতা', ১৯৪৭, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

—:·